কবির বউঠান

মল্লিকা সেনগুপ্ত

পরিবেশক



২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ ✆ ২২৪১-৬৯৮৯

প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০

প্রকাশক : সরস্বতী ভট্টাচার্য ও রাজর্ষি ভট্টাচার্য
১৪/২, পি. সি. ব্যানার্জী লেন
দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৭০০ ০৭৬

প্রচ্ছদ : দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬, দূরভাষ : ২৩৫০-০৮১৬

মুদ্রক : শ্যামল সাউ, দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬, দূরভাষ : ২৩৫০-০৮১৬

রোগশয্যার বন্ধুদের

১

জ্ঞানদানন্দিনী

সন ১৮৬৬। ঠাকুরবাড়ির দেউড়ির সামনে একটি ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল। গাড়ির দরজা খুলে মাটিতে নেমে এল বিলিতি জুতো মোজা পরা সুললিত একটি পা, পরে আর-একটি। পায়ের ওপর লুটিয়ে আছে নকশি-পাড় মরচেরঙা শাড়ির কুঁচি। তারপর মাটিতে নেমে দাঁড়ালেন শাড়ি পরা এক ষোড়শী বিদ্যুৎলতা। গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে তিনি পা বাড়ালেন বাড়ির অন্দরের দিকে। প্রকাশ্য আঙিনায় চাকর-বেহারাদের চোখের সামনে মেজোবউ জ্ঞানদানন্দিনীর এই অকুণ্ঠ অলজ্জ আবির্ভাবে জোড়াসাঁকোর অন্দরমহলে সেদিন যেন ভূমিকম্প ঘটে গেল। পুরনো চাকরবাকরেরা এই অনাসৃষ্টি কাণ্ড দেখে ডুকরে কেঁদে উঠল। মানদা দাসী অন্দর থেকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে এমন দৃশ্য দেখে কর্তামাকে খবর দেবার জন্য পড়িমরি ছুট লাগাল। বেজার মুখে নায়েব গোমস্তা পুরুষেরা দাঁড়িয়ে রইলেন। এতদিন পর বোম্বাই থেকে ফিরে মেজোবাবু স্বয়ং যখন বউমাকে পাশে নিয়ে এইভাবে অন্দরে ঢুকলেন, তখন কারও কিছু বলার থাকতে পারে না, বিশেষত কর্তা দেবেন্দ্রনাথ যখন বাড়ি নেই। কিন্তু এহেন সৃষ্টিছাড়া কাহিনির জল যে অনেকদূর গড়াবে তাতে কোনও সন্দেহ রইল না কারওরই।

ঠাকুরবাড়ির মেজোছেলে সত্যেন্দ্রনাথ বেশ কৃতি ও মেধাবী। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আই সি এস। নারীপ্রগতির বিষয়েও তিনি অতি সক্রিয় চিন্তাভাবনা করতেন। বিয়ের সময় তখনকার নিয়ম অনুসারে সত্যেন্দ্রর নববধূ জ্ঞানদার বয়স ছিল সাত। তাঁর গৌরীদান হয়েছিল। বাপের বাড়িতে সবে তাঁর অক্ষর পরিচয় হয়েছে। নোলক পরা, ঘোমটা টানা সদ্য সাক্ষর সেই বালিকাবধূকে নিয়েই শুরু হল

স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য সত্যেন্দ্রর লড়াই। উনিশ শতকের বউ-মেয়েদের বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে যেভাবে বন্দি করে রাখা হত, সত্যেন্দ্র তরুণ বয়স থেকেই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করেন। মা সারদাদেবীকেও তিনি প্রায়ই বলতেন ঘরে বন্দি হয়ে না থেকে বাইরে বেরোতে। রক্ষণশীল সারদা অবশ্য মেজোছেলের এ-সব কথায় গুরুত্ব দেননি, বরং ধমক দিয়ে বলতেন, তুই মেয়েদের নিয়ে মেমেদের মতো গড়ের মাঠে বেড়াতে যাবি নাকি?

কী বা এমন দোষ হয় মেয়েরা গড়ের মাঠে গেলে? সত্যেন্দ্র জানতে চান।

ঘরের শুচিতা নষ্ট হয়। জানিস না, বাড়ির পুরুষেরাও রাতে শোবার সময়ে ছাড়া যখন-তখন অন্দরে ঢুকতে পারেন না! আর সেই বাড়ির মেয়েরা বেটাছেলের সঙ্গে বাইরে গিয়ে হাওয়া খাবে, এমন কাণ্ড কেউ কখনও শুনেছে? লোকে ছি ছি করবে যে!

মা ছেলের এই কথোপকথনের পর অনেকদিন পেরিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে মা আরও কট্টর হয়েছেন, ছেলে আরও প্রগতিশীল। সেদিনের সেই লজ্জাবতী মেজোবউ বহু বাধাবিপত্তি পেরিয়ে বেপরোয়া আই সি এস স্বামীর সঙ্গে দু'বছর বোম্বাইতে কাটিয়ে এখন রীতিমতো আলোকিত নারী। কিন্তু সারদাদেবীর গম্ভীর মুখ জ্ঞানদার এই আধা-মেম মূর্তিতে আবির্ভাব দেখে আরও অন্ধকার হল। মেজোছেলে ও মেজোবউ অন্দরে পৌঁছলে কর্তামা অখুশি মুখে তাদের বরণ করতে এলেন। তাকে ঘিরে ঠাকুরবাড়ির চোদ্দো-পনেরো জন নানা বয়সের মেয়ে-বউ কিশোরী বালিকা। তারা গভীর বিস্ময়ে বোম্বাইয়ের জাহাজে-চড়া বউ দেখতে থাকে। জ্ঞানদার মনেও হিল্লোল ওঠে তাদের জবুথবু ভাবভঙ্গি সাজপোশাকের দিকে তাকিয়ে। এই রূপসি মেয়ে-বউদের ব্যক্তিত্ব যেন শাড়ি-গয়নার স্তূপে চাপা পড়ে আছে। কোনও কিশোরীর পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে যেমন তেমন করে পরা ভারী বেনারসি, কোনও বধূর সোনার অঙ্গ ঢেকে গেছে সোনার গয়নার নির্লজ্জ ঝমঝমানিতে। কিন্তু শাড়ি-গয়নার সম্ভারে তাদের উপচে পড়া যৌবন বাধ মানছে না। এই পোশাকে পুরুষের চোখের সামনে সত্যিই বেরনো যায় না।

জ্ঞানদার মনে হল, এজন্যই বোধহয় বাড়ির পুরুষদেরও যখন-তখন অন্দরে আসা বারণ। সারদাসুন্দরীদেবী আগের মতোই বিরাট চৌকির ওপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসেছেন, চন্দনরঙের মিহি মসলিন শাড়ি যেন তাঁর গায়ের রঙে মিশে গেছে। শাশুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক কষামিঠে

স্মৃতি জ্ঞানদার মনে পড়ে যায়। মনের মতো পোষমানা বউ হতে পারেননি বলে তাঁকে শাশুড়ির কাছে নাজেহাল হতে হয়েছে বহুবার। বালিকাবয়সে বউ হয়ে আসার পর শাশুড়ি নিজে সামনে বসে তাঁর পরিচর্যা করাতেন। সারদা বসে থাকতেন চৌকিতে আর তাঁর সামনে দাসীরা বউদের কষে সর-ময়দার রূপটান মাখাত। শ্যামরঙা জ্ঞানদার রোগা চেহারা সারদার পছন্দ হয়নি, তাই তাঁকে রংরূপে ঠাকুরবাড়ির উপযুক্ত করে তোলায় মন দিয়েছিলেন। একবার অন্যবাড়ির ক'জন মেয়ে-বউ দেখা করতে এল। তাদের রসেবশে চেহারা দেখে সারদা আক্ষেপ করে বললেন, এরা কেমন হৃষ্টপুষ্ট দেখ দেখি, আর তোরা সব যেন বৃষকাষ্ঠ। তারপর কিছুদিন ধরে শুরু হল জ্ঞানদাকে মোটা করার চেষ্টা। নিজ হাতে ভাত মেখে খাইয়ে দিতে লাগলেন। একমাথা ঘোমটা পরা বালিকাবধূ না পারতেন গিলতে, না ফেলতে। ভাতের দলা নিয়ে সুন্দর চাঁপার কলির মতো কর্তামার আঙুলগুলি এগিয়ে আসত জ্ঞানদার মুখের দিকে আর বালিকার কেবল মনে হত কখন মা উঠে যাবেন আর তিনি দালানে গিয়ে বমি করবেন।

এ তো গেল তাঁর আদরযত্নের পালা। কিন্তু সত্যেন্দ্রর আই সি এস পরীক্ষা দিতে বিলেত যাওয়াটা বোধহয় মায়ের পছন্দ হয়নি। মেজোছেলে চলে গেলে কর্তামা কী এক অজানা রাগে মেজোবউ জ্ঞানদার গয়না নিয়ে দুই মেয়েকে বিয়ের উপহার দেন। নিয়ে নেওয়া সেইসব গয়নার জন্য অবশ্য জ্ঞানদা শোক করেন না। কিন্তু বাবামশায় যখন শুনলেন, তিনি মায়ের ওপর খুব রাগ করেন আর জ্ঞানদার জন্য একটি হিরের কণ্ঠি পাঠিয়ে দেন। আসলে চিরদিন অন্তঃপুরবাসিনী সারদা সেখানকার কোনও পরিবর্তন মানতে পারতেন না। জ্ঞানদা যেভাবে অন্দরমহলের রীতিনীতি না মেনে আধুনিকতার আমদানি করছিলেন তা সারদাকে রাগিয়ে তুলত। আর ঘরের বউয়ের জাহাজে পাড়ি দিয়ে বোম্বাইযাত্রা এবং সেই বিদেশবিভুঁইতে দু'বছর কাটিয়ে আসা যে তিনি কোনওমতেই হজম করতে পারবেন না সে তো জ্ঞানদা বুঝতেই পারছেন, এবার মায়ের সঙ্গে বসবাস আরও কঠিন হবে।

কিন্তু বোম্বাই যাওয়ার অনুমতি পেতেও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল তাঁকে। সত্যেন বিলেত যাওয়ার পর থেকেই স্ত্রীকে ঘরের বাইরে বিশ্বের আলোকিত নারীদের মাঝখানে নিয়ে যেতে চাইতেন। সে যুগে পুরুষেরা কার্যসূত্রে বা ভ্রমণে বাইরে গেলেও স্ত্রীদের সঙ্গে নেওয়ার চল ছিল না।

কিন্তু সত্যেন কোনওদিনই জ্ঞানদাকে ঘরে বন্দি রেখে নিজে প্রবাসে থাকতে চাননি। চিঠির পর চিঠিতে তিনি জ্ঞানদাকে ডাক পাঠাতেন। একবার লিখলেন, 'এখানে জনসমাজে যাহা কিছু সৌভাগ্য, যাহা কিছু উন্নতি, যাহা কিছু সাধু সুন্দর, প্রশংসনীয়— স্ত্রীলোকদের সৌভাগ্যই তাহার মূল।... আমার ইচ্ছা তুমি আমাদের স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে কিন্তু তোমার আপনার উপরই তাহার অনেক নির্ভর।'

এ সব চিঠি পড়ে মনে মনে নিজেকে সেই আলোকযাত্রার জন্য প্রস্তুত করছিলেন কিশোরী জ্ঞানদা। কিন্তু শেষপর্যন্ত বাবামশায়ের অনুমতি পাওয়া গেল না। স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে বোম্বাইয়ের কর্মস্থলে প্রবাসী হলেন সত্যেন আর জ্ঞানদা নিজেকে তৈরি করতে লাগলেন আরেকভাবে। সেজোদেওর হেমেন্দ্রনাথের কাছে বাড়ির মেয়ে-বউরা তখন বাংলা শিখতে শুরু করেছে। সেজোজা নীপময়ী আর ননদ সুকুমারী, স্বর্ণকুমারী, বর্ণকুমারীদের সঙ্গে জ্ঞানদাও যোগ দিলেন সেই পাঠশালায়। শাশুড়ি অবশ্য মাঝেমাঝেই রাগ করে কথা বন্ধ করে দিতেন 'অবাধ্য' মেজোবউয়ের সঙ্গে, কখনও শাস্তি দিতেন অন্য মেয়েদের তাঁর সঙ্গে মিশতে না দিয়ে। তাই নিয়ে দূর থেকে উদ্বিগ্ন হতেন সত্যেন্দ্র। জানতে পারলে রাগ করতেন দেবেন্দ্রনাথ। হয়তো এ-কারণেই দ্বিতীয়বার সত্যেন্দ্রর আবেদনে সম্মতি দিতে দেরি করেননি মহর্ষি। সেই সম্মতি বাঙালি মেয়ের জন্য বিশ্বের দরজা খুলে দিয়েছিল।

এর জেরে শাশুড়ির মনে জমা যত তিক্ততা অবশ্য সামলাতে হল জ্ঞানদাকেই। তবু সংস্কারের সীমায় বাধা সারদাকে বুঝতে পারেন বলেই শাশুড়ির ওপর রাগ করেন না, ধমক খেতে হবে জেনেও একটু ঝুঁকে তাঁকে প্রণাম করেন জ্ঞানদা।

তক্তপোশে বসে বিরক্তি নিয়ে জ্ঞানদার বেশবাস দেখতে থাকেন সারদা, জানতে চান, এ আবার কী ছিরির শাড়ি পরা হয়েছে?

জ্ঞানদা উত্তর করেন, মা এ হল বোম্বাই দস্তুর শাড়ি-পরা। এভাবে পরলে বাইরের লোকের সামনে বেরনো যায়।

আর গায়ে ওটা কী পরেছ? মেমেদের মতো জ্যাকেট?

জ্ঞানদার মুখ একটু অপ্রতিভ হয়ে যায়। সত্যেন্দ্র উত্তর দেন, কেন মা তোমার ভাল লাগছে না দেখতে? এখন অভিজাত ভদ্র স্ত্রীলোকেরা এভাবেই শাড়ি পরে পশ্চিমে। এবার আমাদের মেয়ে-বউরাও পরবে।

সারদা মুখঝামটা দেন, থাক নিজের বউকে সঙ সাজাচ্ছ, আবার আমার ভালমানুষ বউ-মেয়েদের নিয়ে টানাটানি করতে হবে না। চিরকাল যেভাবে চলে এসেছে তাই চলবে। অন্দরের শুচিতা নষ্ট করতে আমি দেব না। মা ছেলের তরজা শুনতে শুনতে মেয়েরা মন দিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে মেজোবউয়ের সাজ। মেমেদের মতো ভারী না হলেও জ্যাকেটটি বেশ লেস বসানো কায়দাকানুন করা। কোমরে জ্যাকেট যেখানে শেষ আর শাড়ির বাঁধন শুরু সেখানে উঁকি মারলে পাতলা কাপড়ের সেমিজ দেখা যাচ্ছে। মরচেরং রেশমের শাড়ির ওপর কালো-সোনালিতে পারশি কাজ করা পাড় বসানো। শাড়ি পরার ধরনটি বেশ আলাদা, কোমরে কুঁচি দিয়ে পেছন দিয়ে ঘুরিয়ে সামনে এনে আঁচলটি বাঁ কাঁধের ওপর ব্রোচ দিয়ে আটকানো, পায়ে মোজা ও বিলিতি জুতো। কারও কারও বেশ ভালই লাগল। সনাতনপন্থী কেউ কেউ মনে মনে সারদার পক্ষ নিলেন।

সারদা আবার ছেলের দিকে তাকিয়ে বলেন, জানি না কী অলুক্ষুনে কাণ্ড হবে, বউকে গাড়ি চড়ালি, জাহাজে চড়ালি, ভিটেছাড়া করে বিদেশে নিয়ে রাখলি। নিন্দায় কান পাতা যাবে না। যত জ্বালা তো আমাকেই সইতে হবে।

হঠাৎ উঠোন থেকে দালানে ছুটে এসে জ্ঞানদাকে জড়িয়ে ধরে হইচই করে ওঠে এক পসারিণী। ওঃ মেজোবউঠান তুমি আজ যে কাণ্ড করে দেখালে, ইতিহাস হয়ে গেল গো। বাঙালি মেয়েরা একশো বছর পরেও তোমায় ধন্য ধন্য করবে।

জ্ঞানদা চমকে উঠে বলেন, ওমা, বই-মালিনী। তুই কখন এলি?

সারদা রাগে লাল হয়ে হাতপাখা ছুড়ে মারেন বইওলিকে। যাঃ ভাগ, তোর আর নাটক করতে হবে না। ও সব আদিখ্যেতা করলে দুর দুর করে তাড়িয়ে দেব। ইতিহাস! ওফ্ কী আমার ইতিহাসের ব্যাখ্যাতা এলেন রে! যা ভাগ।

সত্যেন মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলেন, মাগো অত রাগ করছ কেন? সত্যিই তো এটা ইতিহাস। বাইরে বেরলে দেখতে মরাঠি মেয়েরা হাবভাব চালচলনে বাঙালিনীদের চেয়ে কত এগিয়ে গেছে, তাদের দেখলে তুমিও বুঝতে কোমলেকঠিনে গড়া সেই ব্যক্তিত্বই বাঙালি নারীর আদর্শ হওয়া উচিত। মায়ের পাশটিতে চুপ করে বসে থাকা শাড়ি জড়ানো এক বালিকার ঝুঁটি নেড়ে দিয়ে সত্যেন বলেন, হ্যাঁরে বর্ণ, তুই সত্যি করে বল তো মেজোবউঠানের মতো করে সাজতে চাস কি চাস না?

ছোটবোন বর্ণকুমারী চুপ করে থাকে, তার আশেপাশের বালিকা কিশোরীরা উসখুস করেও সারদার ভয়ে কিছু বলতে পারে না। তবে প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠে তারা একজন দু'জন করে জ্ঞানদার কাছে গিয়ে কথাবার্তা শুরু করল। এই মেজোবউঠান অন্যরকম বলে চিরদিনই তাদের আকর্ষণের কেন্দ্র, তা ছাড়া তিনি সবাইকে নিয়ে চলতে জানেন। নতুনের প্রতি গোপন টান উসকে দিতে জানেন। বই-মালিনী জ্ঞানদার হাত ধরে গোমড়া মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

দু'বছর আগে মেজোবউয়ের বোম্বাইযাত্রা উপলক্ষে সাড়া পড়ে গিয়েছিল ঠাকুরবাড়িতে। নানা প্রশ্ন, উদ্বেগ, উৎসাহ। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল কী পোশাক পরে যাবেন তিনি! অনেক ভেবেচিন্তে ফরাসি দরজির দোকানে অর্ডার দিয়ে তাঁর জন্য করানো হল অত্যাশ্চর্য এক 'ওরিয়েন্টাল ড্রেস'। সে-ড্রেস অনভ্যস্ত বাঙালিনীর পক্ষে এমনই জটিল যে তিনি নিজে পরতে পারেননি, বাড়ির মেয়েরাও যখন সেই অদ্ভুত পোশাকে সাহায্য করতে পারল না, স্বয়ং সত্যেন হাত লাগালেন।

তখনই জ্ঞানদার মনে হয়েছিল যে, নারীমুক্তির জন্য সবার আগে দরকার বাঙালি নারীর পোশাকের সংস্কারমুক্তি। পশ্চিমি ড্রেসের দ্বারস্থ না হয়ে শাড়ি-পরার কেতাদুরস্ত ভঙ্গি খুঁজে বার করার কথা তখন থেকেই তাঁর মাথায় ঢোকে। বোম্বাইয়ের পারশি মহিলাদের সহজ স্বচ্ছন্দ শাড়ি-পরার কেতা থেকেই তিনি পেয়ে গেলেন বাঙালিনির শাড়ির ধারণা।

ঠাকুরবাড়ির চার দেওয়ালে বন্দি মেয়েদের কাছে এখন তো তিনিই দুনিয়া দেখার জানালা। কত কী শেখার আছে, শোনার আছে তাঁর কাছে। একদিকে কর্তামার রক্তচক্ষুর ভয় আর অন্যদিকে জ্ঞানদার দুর্নিবার আকর্ষণ। গল্প করতে করতে তারা জ্ঞানদাকে তাঁর জন্য প্রস্তুত শোওয়ার ঘরের দিকে নিয়ে যায়। বই-মালিনীও তাদের সঙ্গ নিল। জ্ঞানদা নতুন বই দেখবেন।

সেদিকে তাকিয়ে সারদা বলেন, দেখ সত্যেন, তোর বাবামশায় ধর্ম পরিবর্তন করে আমার জীবনের অর্ধেক অশান্তিতে ভরে দিয়েছেন, এখন তুই আর স্ত্রীস্বাধীনতার ধুয়ো তুলে আমার মাথা খাস না।

ঠাকুরবাড়ি আদতে ছিল ঘোর বৈষ্ণব। লক্ষ্মীজনার্দন তাঁদের গৃহদেবতা। বাড়ির বউ-ছেলেরা বংশানুক্রমে পূজাপার্বণ পালন করে এসেছেন। দিদিশাশুড়ি অলকাসুন্দরী ও শাশুড়ি দিগম্বরীর কাছে নিষ্ঠাভরে পূজাপাঠের

নিয়মকানুন শিখছিলেন সারদা। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ যখন হিঁদুয়ানির সব পৌত্তলিকতা বর্জন করে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিলেন তখন শুরু হল সারদার আত্মিক সংকট। না পারলেন স্বামীর ধর্মকে অস্বীকার করতে, না পারলেন হিঁদুয়ানির সংস্কার বর্জন করতে। অথচ এই টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত হলেন সারাজীবন। সত্যেন বুঝতে পারেন, মা সেই কথাই বলছেন। কিন্তু তিনি যেন পণ করেছেন জননীকে সংস্কারমুক্ত করার।

মা তুমি কেন বুঝতে চাও না, না পালটালে, সভ্যতা এগোয় না। তা সে ধর্মেই হোক আর সমাজজীবনে। যে দেশের মেয়েরা ঘরের চার দেওয়ালে বন্দি, সে দেশ অন্ধকারে ডুবে থাকে। আর যদি শুধু পোশাক সংস্কারের কথা বলো, সে তো বাবামশায় নিজেই বোনেদের পোশাক নিয়ে কত পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, আজ পেশোয়াজ তো কাল দিশি গাউন। মুসলমান দরজির তৈরি সে-সব পোশাক তুমিও তো তোমার মেয়েদের পরিয়েছ।

সারদা বলেন, সে তো বাধ্য হয়ে, ঢাকা পোশাক না হলে আদুল গায়ে শাড়ি জড়িয়ে তো বাড়ির মেয়েরা বাইরের পণ্ডিতমশায়ের কাছে পড়াশোনায় বসতে পারবে না।

ঠিক সেরকম মা, ঢাকা পোশাক না পরলে তোমার মেজোবউ কী করে সমাজে মিশবে? আমাদের স্ত্রীলোকেরা যেরকম কাপড় পরে তা না পরার মতোই। ওই পোশাকে ভদ্রসমাজে যাওয়া চলে না। আমার চাকরিসূত্রে কত বড় বড় লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে ওকে। সত্যেন উৎসাহে বলেন।

সারদা মুখ গোমড়া করে বলেন, মেয়েমানুষের এত মেশামেশির দরকার কী বাপু বুঝি না। আমরা তো কোনওদিন বাড়ির বাইরে পা ফেলিনি, অনেক বলেকয়ে গঙ্গাচানে যাবার অনুমতি পেলে যেতে হয়েছে ঘেরাটোপে ঢাকা পালকি চেপে। ছোটবেলায় দু'-চারবার তুই তো আমার সঙ্গে গিয়েছিস। দেখেছিস তো, বেহারারা পালকি সুদ্ধু গঙ্গায় চুবিয়ে দিত দু'-চারবার, সেই আমার গঙ্গাস্নান। আর সেই বাড়ির বউকে তুই কিনা নিয়ে এলি গাড়ি চাপিয়ে, তারপর চাকরবাকরের চোখের সামনে দিয়ে বেহায়া বেপরদা বউমানুষ হেঁটে হেঁটে বাড়িতে ঢুকল! এই অনাছিষ্টি দেখার জন্য আমি বেঁচে রইলাম কেন?

ওহ মা, আমাদের বাড়িতে মুসলমানি পরদাপ্রথা থাকারই বা কী দরকার বলো তো? আমাদের মেয়েরা আর কতকাল নবাবি কয়েদখানায় বন্দি থাকবে?

সারদা বিরক্ত হন। যা তো এখন, আমাকে আর জ্বালাস না। ঘরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে একটু কিছু মুখে দে। এত পথ পেরিয়ে যাত্রা করে এসে কোথায় মায়ের সঙ্গে দুটো ভালমন্দ কথা কইবি তা না, তর্ক জুড়েছিস। যা ঘরে যা। ও মানদা, ওদের ঘরে খাবার পাঠানো হয়েছে কি না দেখ তো।

মানদা দাসী জানায় খাবার যাচ্ছে কর্তামা। সত্যেন ঘরের দিকে পা বাড়ালে তাঁর চোগা-চাপকান পরা দীর্ঘ অবয়বের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মানদার কাছে সারদা জানতে চান, কী রে, যেভাবে বলেছি তাই পাঠানো হল?

হ্যাঁ মা, মানদা জানায়, রুপোর রেকাবিতে নারকেলের মিষ্টি, আনন্দনাড়ু, লুচি, বেগুনভাজা সাজিয়ে লেসের ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে পাঠানো হয়েছে রুপোর গেলাসে বরফ দেওয়া তরমুজের শরবত।

ঈষৎ চিন্তিত মুখে রুপোর মকরমুখী পানবাটা থেকে পান মুখে দিয়ে তাকিয়ায় হেলান দেন সারদা। মানদা দাসী তাঁর পা টিপতে থাকে।

ওদিকে সত্যেন ঘরে পৌঁছে দেখেন পালঙ্কের পাশে কাঠের ছোট জলচৌকির ওপর রুপোর রেকাবি ভরা খাবার ও শরবতের বিপুল আয়োজন। ওদিকে সামনের বারান্দায় মাদুর পেতে জ্ঞানদাকে ঘিরে জমিয়ে বসেছে মেয়ে-বউয়ের দল। থাক ওরা, একটু প্রাণ খুলে গল্পগাছা করুক। সত্যেন হাতমুখ ধুয়ে খাবারে হাত ঠেকান। তাঁর মনে পড়ে যায় জ্ঞানদাকে এই দালান থেকে বার করতে কী বেগ পেতে হয়েছিল তাঁকে। প্রথম যেবার আই সি এস পরীক্ষা দিতে লন্ডন গেলেন, সেখানকার স্বাধীন বিদেশিনিদের দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। তাঁর মনে হয় এই তো আদর্শ সমাজ। মেয়েরা যে এত সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরে বাইরে তাতে তো কই সংসারের ছন্দে বিন্দুমাত্র ঘা লাগছে না, বরং শিক্ষিত রুচিশীল সব কাজে পটু এই বিলিতি মেয়েরা যেন পুরুষের যোগ্য সঙ্গিনী হয়ে উঠেছে। আমাদের বাঙালি মেয়েরাই বা কেন এমন হবে না! তখন থেকেই তাঁর মাথায় চিন্তা শুরু হল কী করে জ্ঞানদাকে বিলেতে আনা যায়। সে যখন এখানে এসে এইসব বিলিতি মেয়েদের স্বাধীনতার আনন্দ নিজের চোখে দেখবে তখন সেও নিজেকে পালটাতে চাইবে।

ইংরেজ মেয়েদের দেখে মুগ্ধ হলেও সত্যেন এক মুহূর্তের জন্যও নিজের তেরো বছর বয়সি স্ত্রীকে ভোলেননি। দাদামশায় দ্বারকানাথও লন্ডনে গিয়ে বিলিতি মেয়েদের দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। রানি ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে মিষ্টিমধুর

মেলামেশায় বা টেমসের বুকে বিলাসনৌকো ভাসিয়ে মেমদের সঙ্গে নৌকোবিহারে তিনি জীবনের স্বাদ উপভোগ করেছেন। সে ছিল তাঁর নিজের মুক্তি। ম্লেচ্ছ সংসর্গে ধর্মনাশের আশঙ্কায় স্ত্রী দিগম্বরী তাঁকে প্রায় ত্যাগ করেছিলেন। বহু ধনসম্পদ কীর্তি ও মানমর্যাদা সত্ত্বেও স্ত্রীকে তিনি নিজের মতে আনতে পারেননি। রাজকীয় মেজাজের দ্বারকানাথের বেলগাছিয়া ভিলার পার্টিতে সুরা ও মাংসের ফোয়ারা আর মেমসাহেবদের কোমর জড়িয়ে বল ডান্স নিয়ে সেকালে কেচ্ছা কেলেঙ্কারি ছড়া প্রশস্তির বন্যা বয়ে যেত। রূপচাঁদ পক্ষী মশাই ব্যঙ্গ করে ছড়া বেঁধেছিলেন,

'কি মজা আছে রে লাল জলে জানেন ঠাকুর কোম্পানি
মদের গুণাগুণ আমরা কি জানি, জানেন ঠাকুর কোম্পানি।'

তবু দ্বারকানাথের থেকেও সত্যেনকে মুগ্ধ করেন দিগম্বরী। জগদ্ধাত্রীর মতো রূপ ছিল তাঁর কিন্তু সত্যেন জানেন দিদিঠাকুরানির তেজও কম ছিল না। তিনি লোকের কথায় আস্থা না রেখে একদিন রাতে পার্টি চলাকালীন ঘেরাটোপের পালকি চেপে সদলবলে হানা দেন বেলগাছিয়া ভিলায়। সেদিনের এক অভিজাত পরদানশিন মহিলার পক্ষে কাজটা ছিল যথেষ্ট বেপরোয়া। অথচ শুরুতে তাঁদের সম্পর্কটা যথেষ্ট মধুর ছিল। তখন বৈষ্ণব দ্বারকানাথ নিজ হাতে বাড়ির লক্ষ্মী জনার্দনের পূজা করতেন আর তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী ছিলেন রাইকিশোরী দিগম্বরী। ধূপধুনোর আঁচে তাঁর দুধেআলতা মুখে যে অপরূপ ভক্তি ও লাবণ্য ফুটে উঠত সেদিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হতেন রূপের পূজারি দ্বারকানাথ। সেসময় তাঁরা এত গোঁড়া ছিলেন যে বাড়িতে পেঁয়াজ রসুন মাছ মাংস কিছুই ঢুকত না। ব্যাবসায় অভাবনীয় সাফল্য আসা শুরু হতে সাহেবমেমদের সঙ্গে মেলামেশার প্রয়োজন বাড়ল দ্বারকানাথের, নবযুগের চিন্তার ছোঁয়ায় আর বাবুয়ানির আকর্ষণে সেই গোঁড়া হিন্দুয়ানির প্রতি আস্থা ক্রমশ টলে গেল। বামুন পণ্ডিতেরা জানিয়ে দিলেন দ্বারকার নিজে হাতে পুজো করা আর চলবে না, সাহেবদের সংস্পর্শে তিনি অশুচি হয়েছেন। তারপর দিগম্বরী যা যা করেছেন, সবই ইতিহাস।

বিলেত যাবার আগে সত্যেন একদিন কিশোরী জ্ঞানদাকে উসকানি দেওয়ার জন্য দিগম্বরীর সেই আশ্চর্য কাণ্ডের কথা বলছিলেন, আমার দিদিঠাকরুন কী দস্যি মেয়ে ছিলেন সে তোমরা ভাবতেও পারবে না জ্ঞেনু।

কিছুদিন ধরেই তাঁর কানে আসছিল দাদামশায় নাকি ইদানীং বেলগাছিয়া ভিলায় সাহেবমেমদের সঙ্গে পানাহার করেন, মুসলমান বাবুর্চির রান্না মাংস খান। ঠানদিদি প্রথমে বিশ্বাস করেননি। শুনতে শুনতে উত্ত্যক্ত হয়ে একদিন ঠিক করলেন স্বচক্ষে দেখবেন কী হয় সেখানে। তখনকার পরদানশিন গৃহবধূর পক্ষে কী দুঃসাহসিক কাণ্ড ভাবো!

ওরে বাবা, আমার তো শুনেই বুক ঢিবঢিব করছে। জ্ঞানদা জানতে চান, ঠানদিদি একা একাই গেলেন সেখানে?

না, সঙ্গে নিলেন আমার মা আর অন্তঃপুরের দু'-একজন মহিলাকে। হলুদ পাড় লাল সাটিনের ঘেরাটোপ দেওয়া ঠাকুরবাড়ির তিনটি পালকি গিয়ে থামল বেলগাছিয়া ভিলায়। মা তো তখন খুব ছোট। পরে মায়ের কাছে শুনেছি সেদিন নাকি ভয়ে তাঁর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল।

তারপর কী হল? কী দেখলেন সেখানে?

পালকির ঘেরাটোপ ভেঙে বেরিয়ে যা দেখলেন তা জীবনে দেখেননি বেচারি ঠানদিদি। আলোয় আলোয় রাতকে দিন করে ফেলা হয়েছে বেলগাছিয়া ভিলায়। ফোয়ারা আর নগ্নিকা নারীমূর্তি দিয়ে সাজানো বাগান, বিশাল স্তম্ভ ও বিরাট দালানের অসাধারণ কারুকার্য ভেদ করে দিদিঠাকরুন যখন সদলবলে ঢুকে পড়লেন হলঘরে, সে এক দৃশ্য। কাচের গেলাসের ঠুংঠাং শব্দ, বেলোয়ারি ঝাড়ের ঝলকানি ও মহার্ঘ বিদেশি আসবাবের মাঝখানে নৃত্যরত নারীপুরুষেরা হঠাৎ থেমে গেল। ঠানদিদি দেখলেন, সত্যিই মুসলমান বাবুর্চিরা টেবিলে টেবিলে মাছ মাংসের নানা পদ পরিবেশন করছে আর সাদা সাহেবগুলো বেহায়া মেমসাহেবদের কোমর জড়িয়ে নাচছে। আর স্বয়ং দ্বারকানাথকে দেখে তাঁর চক্ষুস্থির হয়ে গেল। একহাতে মদের গেলাস আর অন্য হাত এক গোরি মেমের কোমরে রেখে ইংরেজি গানের সঙ্গে সঙ্গে পা মিলিয়ে তিনি নাচছেন। এই অভাবনীয় দৃশ্যের সামনে স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দিদিঠাকরুনের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। বালুচরী ঘোমটার আড়াল থেকেও ঠানদিদির রণচণ্ডী মেজাজ বোধহয় টের পেলেন দাদামশায়, একমুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠলেন। তারপর এগিয়ে এসে ক্রুদ্ধ পত্নীকে সামলানোর চেষ্টা করতেই তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে তাঁকে বিদ্ধ করে সদম্ভে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন দিদিঠাকরুন।

তা হলে ঠানদিদিই এই বাড়ির সবচেয়ে সাহসী স্ত্রীলোক, জ্ঞানদা বলেন,

আমি তাঁর মতো হতে চাই। তুমি একচুল বেচাল কিছু করলেই সংসর্গ ত্যাগ করব, সাবধান থেকো।

সত্যেন হেসে বলেন, আমি ভুল করলে সত্যিই কি তুমি তাঁর মতো কঠোরহৃদয়া হতে পারবে? তিনি এরপরেও কী করেছিলেন জানো? দাদামশায় যখন নিত্যপূজার অধিকার হারালেন তখন দিদিঠাকুরানির মনে প্রশ্ন এল, স্বামী সংসর্গ করলে তিনিও কি ধর্মচ্যুত হবেন না? তখন তিনি ব্রাহ্মণদের পরামর্শ নিয়ে ঠিক করলেন স্বামীর যত্নআত্তি করবেন, তারপর স্নান করে শুদ্ধ হবেন, কিন্তু রাতে স্বামীসংসর্গ করবেন না।

ওমা সে কী গো? তোমাদের গোঁড়া সংসারে দিদিঠাকুরানি এমন কাজ করলেন কী সাহসে? জ্ঞানদা অবাক হন।

সত্যেন জ্ঞানদার মাথা নিজের বুকে টেনে নিয়ে বলেন, তাঁর যা সাহস ছিল সে তোমাদের নেই জ্ঞেনু। তিনি ক্রমশ দাদামশায়ের অন্দরে প্রবেশ বন্ধ করে দিলেন, তাঁর জন্য নির্দিষ্ট হল বৈঠকখানাঘরের একটি শয্যা। আলাদা রান্নার ব্যবস্থা হল তাঁর জন্য। ঠানদিদি আর দাদামশায়ের সংসারের হাঁড়ি ভিন্ন হয়ে গেল।

বারো বছরের জ্ঞানদা অবাক হয়ে বলেছিলেন, এমা, স্বামীকে আলাদা করে দেওয়া কি ভাল? মেয়েমানুষের এমন অধর্মের কাজ করতে বাধল না?

দেখো জ্ঞেনু, ধর্ম অধর্মের বিচার করা বড় কঠিন, সত্যেন সেদিন বলেছিলেন, আমার দিদিঠাকুরানি ভোর চারটে থেকে পুজো শুরু করতেন। স্বপাক নিরামিষ আহার করতেন। এক বামুন ঠাকুর তাঁর পুজোর ও রান্নার উপকরণ গুছিয়ে দিত। একাদশীতে ফলমূল খেয়ে কাটাতেন, উপোসও করতেন কোনও কোনও একাদশীতে। তাঁর সাত্ত্বিক জীবনের সঙ্গে দাদামশায়ের ভূমিকা মেলাতে পারেননি বলেই স্বামীসহবাসের সুখ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। স্বামীর চেয়েও তাঁর কাছে বড় ছিল ধর্ম।

সধবার আবার একাদশী কী? জ্ঞানদা আরও অবাক হয়ে সেদিন বলেছিলেন।

শুনেছি দিদিঠাকরুন বিশ্বাস করতেন তাঁর উপোসে স্বামীর অমঙ্গলের চেয়ে মঙ্গলই বেশি হবে, কারণ স্বামীর কল্যাণের জন্যই তো তাঁর ব্রতপালন। সেই অনুরক্ত পত্নী কেন এত কঠোর হয়ে উঠলেন সেটাও তো ভেবে দেখতে হবে জ্ঞানদা।

এ-সব পুরনো কথা ভাবতে ভাবতেই ক্লান্তিতে একটু চোখ বুজে এসেছিল

সত্যেনের। ঘুমের চটকা ভাঙল জ্ঞানদার কোমল করস্পর্শে। অন্য মেয়েরা কখন চলে গেছে। স্নান সেরে মিহি তাঁতের নীলাম্বরী শাড়ি পরেছেন জ্ঞানদা। খোঁপার বকুলফুলের মালা থেকে আসা গন্ধ সদ্য প্রবাসফেরত সত্যেনকে যেন বাংলামাটির পক্ষ নিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে। ঘরের নিভৃতে আর জ্যাকেট গায়ে দেননি জ্ঞানদা, কিন্তু আদুল গায়েও তিনি আর থাকতে পারেন না। তাতে নিজেকে কেমন গ্রামীণ মনে হয়। পাতলা মলমলের সেমিজের ওপর তিনি সুন্দর পরিপাটি করে শাড়ি জড়িয়েছেন। সামান্য আতর তাঁর সাজকে আরও মোহময় করেছে। যাকে তিনি এই প্রাসাদের চৌহদ্দি থেকে বার করে বোম্বাই নিয়ে গিয়েছিলেন এ মেয়ে সে মেয়ে নয়। জ্ঞানদার কোমর জড়িয়ে ধরে সত্যেন বলেন, মনে পড়ে জ্ঞেনু, বোম্বাইতে আমাদের সেই প্রথম ডিনার পার্টিতে তুমি কী করেছিলে?

আহা, তখন আমি সবে চৌকাঠ পেরোনো চোদ্দো বছরের এক বাঙালি বউ, আমি কী করে গোরা সাহেবদের কায়দাকানুন বুঝব? আমি প্রথম থেকেই ঠিক করেছিলুম টেবিলে খাবার দাবার সব সাজিয়ে দেব অতিথিদের জন্য, কিন্তু আমি টেবিলে বসব না। ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে একসঙ্গে খানাপিনার কথা ভাবতেই পারিনি। আর সেই গোরা সাহেবটা যেই আমার হাত তার হাতের মধ্যে নিয়ে টেবিলের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইল, আমি ভাবলাম এ কী অসভ্য লোক রে বাবা! হাত ছাড়িয়ে দিলেম ছুট।

তারপর সেই বন্ধ দরোজা খোলানোর জন্য আমাকে কম সাধ্যসাধনা করতে হয়নি! সত্যেন হা হা করে হেসে ওঠেন, সেদিনের জন্য আমি তোমাকে দোষ দিই না, কিন্তু পরে তুমি যে ক্রমশ আদবকায়দা শিখে নিয়ে প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ানের যোগ্য স্ত্রী হয়ে উঠেছ সেজন্য আমার গর্ব হয়।

সেদিনের সেই লজ্জাবতী ভীরু বালিকার মধ্যে এখন সত্যেন উদিত সূর্যের মতো এক নতুন নারীকে আবিষ্কার করেন। প্রবল আশ্লেষে ষোড়শী পত্নী জ্ঞানদাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করেন তিনি।

আঃ, ছাড়ো না, তুমি কি ছেলেমানুষ হয়ে গেলে? জানলা দরোজা সব খোলা, এখনই যে কেউ এসে পড়বে, জ্ঞানদা লজ্জা পান।

সত্যেন বলেন, কী বলেছিলাম মনে নেই বউ?

কত কী বলেছ, কোন কথাটা বলছ কী করে বুঝব এখন? জ্ঞানদা কটাক্ষ করেন।

সেই যে বিলেত থেকে চিঠিতে লিখেছিলাম, 'তুমি যে পর্যন্ত বয়স্ক, শিক্ষিত ও সকল বিষয়ে উন্নত না হইবে, সে পর্যন্ত আমরা স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধে প্রবেশ করিব না।'

জ্ঞানদার মনে পড়ে, সেই রাতের পর রাত জোড়াসাঁকো বাড়ির ছাতে নিরালা জ্যোৎস্নায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তিনি স্বামীর এইসব কথার মানে খুঁজেছেন। বালিকার মনে অজানা ভয়, স্বামী কেন তাকে পুরোপুরি গ্রহণ করছেন না! কেন শুধু ওপর ওপর আদর করে দূরে সরে যান? কেন লেখেন, 'আমরা স্বাধীনতাপূর্বক বিবাহ করিতে পারি নাই। আমাদের পিতামাতারা বিবাহ দিয়াছিলেন।' তবে কি এখন সেই পরমলগ্ন এসেছে?

জ্ঞানদা নববধূর মতো রাঙা হয়ে ওঠেন। বলেন, সে-কথা এখন কেন?

বউ, এখনই তো সময় সে-কথা বলার। সত্যেনের গলা আবেগে কেঁপে ওঠে, এই সেই দাম্পত্যের নির্জন ঘর, এই সেই পুরাতন প্রণয়প্রার্থী, এই সেই স্থগিত ফুলশয্যার পালঙ্ক। আজ আর তুমি নিছক গৃহবধূ নও। হে স্বাধীনা, আজ আমি মিলনপ্রার্থী, আমার আবেদন কি মঞ্জুর করবেন দেবী?

এই অভাবিত মুহূর্তে কী করবেন ভেবে না পেয়ে জ্ঞানদা সত্যেনের বুকে ঢলে পড়ে বলেন, যাও আর নাটক করতে হবে না।

সত্যেন তীব্র কামনায় তার কোমর জড়িয়ে ধরেন। লজ্জানত মুখ তুলে ঠোঁটে প্রগাঢ় চুম্বন করেন: বহু প্রতীক্ষিত সেই মুহূর্তে দুজনের থরোথরো শরীর তীব্র আবেগে দলিত মথিত ঘর্ষিত হতে থাকে। গরম বোধ করায় সত্যেন গায়ের ফতুয়া খুলে মেঝেতে ছুড়ে দেন। জ্ঞানদার শাড়ি ধুলোয় লুটোয়। সত্যেনের অধীর আঙুলগুলি যেন নীড় খুঁজে পায় সেমিজ ঢাকা জ্ঞানদার উদ্ভিন্ন স্তনে। তখন দু'জনের শরীরের মাঝখানে একটি সুতোর ব্যবধানও যেন বাহুল্য মনে হয়।

সত্যেন বলে ওঠেন, বউ তোমার এই সেমিজ বস্তুটি বিবাহিতাদের পক্ষে খুব সুবিধের হবে না। এ নিয়ে তোমাকে একটু ভাবনাচিন্তা করতে হবে মনে হচ্ছে।

সত্যেনের দুষ্টবুদ্ধিতে ছদ্মরোষে ঘুষি দেখান জ্ঞানদা। সত্যেন তা দেখে বলেন, সেকী বউ, স্বাধীন হয়ে প্রথমেই স্বামীপ্রহার করবে নাকি? গোঁড়া হিন্দুরা তো সে ভয়েই স্ত্রীলোকদের চারদেয়ালে বন্দি করে রাখে!

এবার দেখো না কী করি তোমায়, বলে অনেকটা ধাতস্থ জ্ঞানদা হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে সত্যেনের দিকে এগিয়ে এসে তাঁর পুরুষালি ঠোঁটের ওপর নিজের কোমল ঠোঁটজোড়া স্থাপন করেন।

বুঝলেন স্বামী, এই শুরু হল স্বাধীনা নারীর স্বাধীন অভিসার। দীর্ঘ চুম্বনের পর ঠোঁট তুলে ঘোষণা করেন জ্ঞানদা।

২

সারদাসুন্দরীর সংসার

ঠাকুরবাড়িতে সদর ও অন্দর সম্পূর্ণ আলাদা। সামনের দিকে লোহার ফটক পেরিয়ে পাশাপাশি দুটি বাড়ি। আদতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলির এই একটি বাড়ির দুটি ভাগ ছিল, বসতবাড়ি আর বৈঠকখানা বাড়ি। কিন্তু কিছুদিন আগে দেবেন আর গিরীন দুই ভাইয়ে বাড়ি ভাগাভাগি হয়ে গেছে। এখন দেবেন-সারদার সংসার দোতলা বসতবাড়িতে। তার মধ্যেও সদর অন্দরে কড়া বিভাজন। বারবাড়িতে কর্তাদের মহল, ছেলেদের মহল, চাকরদের মহল।

ভেতরমহল গিন্নিদের। সেই উঠোনের একধারে গোলাবাড়ি, সেখানে সারাবছরের ধান, ডাল মজুত থাকে। কিন্তু ঘি নুন তেল মশলার ভাণ্ডার বারবাড়িতে, সরকারদের হাতে। তারাই প্রতিদিনের মাপ অনুযায়ী বামুনদের হাতে বার করে দেয়। বিশাল রান্নাঘরে দশ-বারোজন বামুনঠাকুর ভোর থেকে রান্না চাপায়। রসুইঘরের দু'দিকে পরিষ্কার সাদা কাপড় পেতে পাহাড়প্রমাণ ভাত রাখা হয়। সেই পরিমাণ ডাল, তরকারি, মাছের ঝোল রান্না করে পাথরের থালাবাটিতে সাজিয়ে লোক গুনে মহলে মহলে দিয়ে আসে বামুনরা। রাত্রে অবশ্য লুচি তরকারি খাওয়া হয়। এই ঢালাও রান্নার স্বাদ সবসময় পছন্দ হত না দেবেন্দ্রনাথের, তিনি বহুদিন প্রবাসে প্রবাসে কাটিয়ে ঘরে ফেরেন প্রিয় মানুষ আর প্রিয় রান্নার টানে। শুধু বামুনের হাতের রান্না খেলে তিনিও খাবারের স্বাদ ভুলে যাবেন আর ঘরের বউ-ঝিরাও রান্না ভুলে যাবে। তিনি সারদাসুন্দরীকে হুকুম দিলেন বউদের রান্না শেখাও। কত্তামশায় বাড়ি থাকলে সারদা তাঁর গোলগাল চেহারা নিয়েও কষ্ট করে রান্নাঘরে গিয়ে বসতেন তদারকির জন্য। এবার কত্তার নির্দেশে অন্দরে বউমহলে মহা উৎসাহে শুরু

হল রান্না নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা। সরকারি রসুইঘরের ঢালাও ডালঝোলের সঙ্গে বউদের সযত্নে রাঁধা ব্যঞ্জনের স্বাদে আকাশপাতাল তফাত। ঠাকুরবাড়ির রান্নার বিশিষ্ট ঘরানা গড়ে উঠছিল এইসব বিশেষ যত্নের রান্নাতেই।

সকালে উঠে সব মেয়ে-বউদের নিয়ম হল চান সেরে পট্টবস্ত্র পরে উপাসনাগৃহে জড়ো হওয়া। সমবেত উপাসনার শেষে যে যার ঘরে গিয়ে চেলি খুলে রেখে ধোয়া তাঁতের শাড়ি পরে এসে বসবেন ভাঁড়ারঘরের দাওয়ায়। সেই ভাঁড়ারঘরের বৈঠকটাই মেয়েমহলের প্রাণের আড্ডা। কত্তামা তক্তপোশে বসে নির্দেশ দেবেন আর গিন্নিরা বউরা মেয়েরা সব রান্নার জন্য তরকারি গুছিয়ে দেবেন। বৈষ্ণব আমল থেকেই 'তরকারি কাটা' কথাটা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, কাটা বললে পাছে হিংস্রতা প্রকাশ হয়! তাই বলা হত 'তরকারি বানানো'। গিন্নিদের হাতে আছে সবজি ফলমূল আমসত্ত্ব নাড়ু বড়ি তিলকুটা সন্দেশের ভাঁড়ার। বউরা তো বটেই, বিবাহিতা ও অবিবাহিতা কন্যারাও এই আসরের তৎপর সদস্যা। সৌদামিনী, শরৎকুমারী, বর্ণকুমারীরা মায়ের তত্ত্বাবধানে কাজ শেখেন।

শরৎকুমারীর সবে বিয়ে হয়েছে, স্বামীসহ এখানেই থাকছেন। ইতিমধ্যেই রাঁধুনি হিসেবে তাঁর খুব নাম হয়েছে। তিনি আহ্লাদ করে বলেন, মা একটা নতুন সুপ রান্না শিখেছি, ডিম দিয়ে মুলিগাতানি সুপ। আজ বাবামশায়ের জন্য সেই সুপ করে দেব ভাবছি।

দেখ বাছা, সারদা বলেন, কত্তাকে এই দু'-চারদিনে কিছু ভালমন্দ খাইয়ে খুশি করতে পার কিনা। ও সুপ কোত্থেকে শিখলি?

সেই যে সেদিন ও বাড়ির মেজোকাকিমা, রেসিপি লিখে পাঠিয়েছেন, উনিই কোথা থেকে শিখে এসেছেন। সত্যি মা, মেজোকাকিরা চলে গিয়ে বাড়িটা কেমন খালি খালি লাগে।

সারদাও বিমর্ষ গলায় বলেন, হ্যাঁ রে ওদের কথা ভাবলে কষ্ট হয়। এক বাড়িতে হেসে-খেলে একসঙ্গে কাটিয়েছি, ছোটবেলায় শ্বশুরবাড়ি এসে ওই তো সঙ্গী ছিল আমার। ধম্মো ধম্মো করে কী গোল শুরু করলেন কত্তা, লক্ষ্মীজনার্দনকে বিদেয় করতে চাইলেন বলেই তো এত গোল বাধল! আর এতদিনের অধিষ্ঠিত দেবতাকে উঠিয়ে নিয়ে ওরা ও-বাড়ি চলে গেল।

আগে যেটা ছিল দ্বারকানাথের সন্ততিদের একান্নবর্তী বসতবাড়ি, সেখানেই দেওয়াল উঠল। ৫ নং আর ৬ নং বাড়ি আলাদা হয়ে গেল। বাগান ভাগ

হল, পুকুরের ঘাট আলাদা হল। দ্বারকানাথের সময় থেকেই ঠাকুরপরিবারে ব্রাহ্মধর্মের আনাগোনা শুরু হয়েছিল। রামমোহন বিলেত গেলে দ্বারকানাথের অর্থসাহায্যেই ব্রাহ্মসমাজের কাজকর্ম চলছিল। ইতিমধ্যে লন্ডনে বিপুল সমাদর পেয়ে দ্বারকানাথ ক্রমশ কলকাতার জীবনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন এবং বিলেতে গিয়ে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। দেবেন তখন থেকে ব্রাহ্মসমাজের ভার নিলেন। ১২৫০ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ ভাই গিরীন ও আরও কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে দেবেন্দ্র ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিলেন। কিন্তু দেবেন যতটা ধর্ম ধর্ম করে মেতে উঠলেন গিরীন্দ্রনাথ কোনওদিনই ততটা জড়িয়ে পড়েননি। বাড়ির হিঁদুয়ানির ধারা তখনও পুরোমাত্রায় চালু ছিল। প্রথম ধর্মসংকট বাধল লন্ডন থেকে দ্বারকানাথের মৃত্যুসংবাদ এলে। দেবেন ব্রাহ্মমতে বাবামশায়ের শেষসংস্কার করলেন, শালগ্রাম শিলা এনে পৌত্তলিকতার চর্চা করতে তাঁর মন সায় দিল না। তাই নিয়ে সমাজে দারুণ শোরগোল শুরু হল, আত্মীয়স্বজন এবং হিন্দুসমাজের মাথারা অনেকেই দেবেনবাবুকে সামাজিকভাবে বর্জন করলেন। গিরীন্দ্রনাথ অবশ্য ব্রাহ্ম হয়েও হিন্দুশাস্ত্রমতে শ্রাদ্ধ না করে পারেননি। অন্দরে তাঁর স্ত্রী যোগমায়া কিছুতেই স্বামীকে অধর্ম করতে দেবেন না, তেজস্বিনী পত্নীকে অগ্রাহ্য করার সাহস গিরীন্দ্রর ছিল না।

কুটনো বানানো তদারকি করতে করতে সারদা একটু মুখ ঝামটা দিয়ে বলেন, তবে মেয়েমানুষের যোগমায়ার মতো অত তেজ বাপু ভাল না। গৃহদেবতাকে উঠিয়ে দেওয়ার কথা শুনে আমিও তো ভয়ে মরছিলাম, তা বলে কি ঘর ভেঙে আলাদা হয়ে যাবি?

বড়মেয়ে সৌদামিনী জানতে চান, মেজোকাকি তো চলে গেলেন, তুমিও মনে মনে বাবামশায়ের মতো বেম্ম হয়ে গেলে নাকি মা?

সারদা ঈষৎ বিব্রত হন। তোর বোন সুকুমারীর বিয়ে নিয়েই তো কী কাণ্ড! কত্তা জেদ ধরে বেম্মো-বিয়ে দিলেন। অগ্নিসংস্কার হল না, শালগ্রামসাক্ষী হল না। সেই তো শেষে অকালে মরে গেল মেয়েটা!

সে নিয়ে আমরা সকলেই দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু মা ব্রাহ্ম-বিয়ের দোষ দিচ্ছেন কেন? ব্রাহ্মমন্ত্রে বিয়ে হলেও অগ্নি-নারায়ণ সাক্ষী ছাড়া আর সব হিঁদুপার্বণ তো হয়েছিল মা, সেজোবউ নীপময়ী বলে ওঠেন। এদিক ওদিক দুই ছিল। সুকু মারা গেল বাচ্চা হতে গিয়ে, অমন তো কত হয়, আপনি মনে খুঁতখুঁত করবেন না মা।

আমার জ্বালা তোরা বুঝবি না সেজোবউ, সারদা বিরক্ত হন। দেখ, আমার তো উভয়সংকট। তোদের বাবামশায় কত পড়াশোনা করা মান্যিগন্যি লোক, তিনি যা বলছেন তা তো খারাপ হতে পারে না। আবার ছোটবেলায় বিয়ে হয়ে এসে ইস্তক পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত শাশুড়ি, দিদিশাশুড়ির কাছে যে পূজাপাঠ শিখেছি সে শিক্ষেও তো ফেলে দিতে পারি না। কী যে করি! আমার হয়েছে যত মরণ।

ঈষৎ বাঁকা চোখে নীপময়ীকে দেখেন সারদা, আর সেজোবউ, তুই এত কথা বলছিস, তোর বিয়েতে যে হাঙ্গামা হয়েছিল তা তো আমি জম্মে দেখিনি। বিয়ের রাতে আমার ছেলেকে মারতে গোঁড়া হিঁদুরা লেঠেল পাঠিয়েছিল। শেষে পুলিশ ডেকে এনে বে দিতে হল। কত্তা আর বেয়াইমশায় দুজনের জেদ ছিল বলেই অত বাধাবিপত্তির মধ্যেই তোদের বে হল। কিংবা আমার ঠাকুরপূজার জোরে, সে-কথা বললে কত্তা যতই রাগ করুন!

প্রিয় বন্ধু হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের দুই মেয়ে নীপময়ী আর প্রফুল্লময়ীর সঙ্গে হেমেন্দ্র আর বীরেন্দ্রর বিয়ে দিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণ হরদেব যখন ব্রাহ্মমতে পিরালি বামুনের ঘরে মেয়ের বিয়ে দেবেন ঠিক করলেন, জ্ঞাতিরা খেপে লাল। উঠেপড়ে তারা লাগল বিয়ে বন্ধ করতে, হলে যে তারাও জাতিচ্যুত হবে। এমনকী তাদের চাপে হরদেবের বড় ছেলে পরিবার নিয়ে আলাদা হয়ে গেল। তবু তাঁর সংকল্প ভাঙল না, দেবেনের মতো জ্ঞানী, সচ্চরিত্র, সমৃদ্ধ বন্ধুকে কথা দিয়ে আত্মীয়দের অন্যায় আবদারে তিনি পিছিয়ে আসতে পারেন না। বড়ছেলে তাঁর পাশে না দাঁড়ালেও তিনি আদর্শত্যাগ করবেন না। বিরোধীপক্ষ জোট বেধে বিয়ে আটকানোর ফন্দি করতে লাগল। নীপময়ীর জন্য এক বুড়ো কুলীন পাত্রও বেছে রাখল তারা। ঠিক হল যে বিয়ের রাতে একশো লেঠেল পাঠিয়ে বর হেমেন্দ্রের মাথায় লাঠির বাড়ি মেরে কনে নীপময়ীকে তুলে আনা হবে, বিয়ে দেওয়া হবে ওই বুড়ো বরের সঙ্গেই। জানতে পেরে দেবেন্দ্রনাথ পুলিশে খবর পাঠালেন, তাদের পাহারাদারিতে বিয়ে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল।

ব্রাহ্ম বিয়ে হলেও সপ্তপদীতে কোনও বাধা দেননি মহর্ষি। বরণডালা সাজিয়ে বরণ করার অনুষ্ঠান ও ব্রহ্মোপাসনা সেরে বাসরঘরে ঢুকলেন বরবউ। কিন্তু অব্রাহ্ম নারীপুরুষেরা কেউ বিয়েতে যোগ দেননি। হেমেন্দ্র গম্ভীর প্রকৃতির যুবক কিন্তু রূপ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বেনারসি জোড়ের

সঙ্গে নানা অলংকার পরে তাঁকে যেন দেবরাজ ইন্দ্রের মতো লাগছিল। ছোটবোন প্রফুল্লময়ী অবশ্য দিদির বরকে সাক্ষাৎ শিব ভেবে বসেছিলেন। পরে অন্য বালিকারা তাঁকে বোঝাল, শিব তো সর্বত্যাগী, তিনি কেন হিরের কণ্ঠি, মুক্তোর মালা, পান্নার আংটি পরবেন? ঠাকুরবাড়ি থেকে আসা এই জামাইবাবু আসলে ছদ্মবেশী ইন্দ্র। দিদির রূপে মুগ্ধ হয়ে বিয়ে করতে এসেছেন।

বাসরে পাছে মেয়েদের হালকা ঠাট্টার সামনে পড়তে হয় সেই ভয়ে হেমেন আগে থেকেই একটা উপায় ভেবে রেখেছিলেন। ঘরোয়া মেয়েদের চটুল ঠাট্টাইয়ার্কির ওষুধ হিসেবে তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে আলোচনা শুরু করলেন। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা শুধু বাংলাই পড়ে না, অনেকেই সংস্কৃত ও ইংরেজি পড়তে পারে শুনে উপস্থিত কমশিক্ষিত ব্রাহ্মিকারাও অবাক।

হেমেন লজ্জায় জড়সড় কনে নীপময়ীকে বললেন, তোমাকেও শিখতে হবে। বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত সাহিত্য।

নীপময়ী সেদিন লজ্জায় উত্তর দেননি। সকলের সামনে নববিবাহিত স্বামীর সঙ্গে কথা বলা যায় নাকি! তবে এ স্বামী তাঁর দেখা অন্যান্য বরেদের মতো নয়, প্রথম থেকেই আলাদা। বাসরের মেয়েদের অনুরোধে গান গাইতে গাইতে হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে নীপময়ীকে হেমেন বললেন, তোমার গলায় যদি সুর থাকে, বাবামশায়ের অনুমতি নিয়ে গানও শেখাব।

এবার সত্যি শিউরে ওঠেন মেয়েরা। পাগল নাকি এ ছেলে? বলে কী, ঘরের বউ গান গাইবে? তা হলে বউ আর বাইজিতে তফাত থাকবে কী করে?

ক্রমশ কিন্তু হেমেন তাঁর কথা কাজে পরিণত করছেন। নীপময়ী ও অন্তঃপুরের অন্য মেয়ে-বউদের নিয়ে জোড়াসাঁকোর অন্দরে তিনি নিজেই শুরু করেছেন ঘরোয়া পাঠশালা। সেখানে সৌদামিনী, শরৎকুমারী, জ্ঞানদানন্দিনী, স্বর্ণকুমারী, বর্ণকুমারী সবাই নিয়মিত ছাত্রী। হেমেনের কড়া শাসনে তাঁদের পড়া এগোচ্ছে তরতরিয়ে।

নীপময়ীকে গান শেখানোর অসম্ভবকেও তিনি সম্ভব করেছেন। বাবামশায় প্রথমে ইতস্তত করলেও পরে সম্মতি দিয়েছেন। বহু সমালোচনা উপেক্ষা করে বাড়ির গায়ক বিষ্ণু চক্রবর্তীকে নীপময়ীর গানের শিক্ষক নিয়োগ করলেন দুর্জয় সত্যেন্দ্রনাথের দুঃসাহসী ভাই হেমেন্দ্রনাথ। সেই কবে ঘরের মেয়েদের

গলা থেকে গান কেড়ে নিয়েছিলেন অওরংজেব, এতদিন পরে সেই গানকেই যেন নীপময়ীর কণ্ঠে ফিরিয়ে আনলেন হেমেন।

ঠাকুরবাড়িতে জন্ম এবং বিবাহ অবশ্য লেগেই থাকে। এই সেদিন ধুমধাম করে বিয়ে হয়েছে দেবেন্দ্রের প্রিয়কন্যা স্বর্ণকুমারীর। সুদর্শন, সমাজ-সংস্কারক জানকীনাথকে কৃষ্ণনগর থেকে খুঁজে এনেছেন দেবেন্দ্র। ঠাকুরদের সঙ্গে কেউ ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে চায় না, তাই ভাল ছেলে দেখলেই কন্যাদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাদের আপন করতে চান তিনি। এই বিয়ের জন্য জানকীনাথ পিতা জয়চন্দ্র ঘোষালের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ও ত্যাজ্যপুত্র হলেন। কিন্তু বাবামশায়ের ক্রোধ উপেক্ষা করেও ঠাকুরবাড়ির আলোর হাতছানিতে সুন্দরী, বিদুষী স্বর্ণকুমারীর আকর্ষণে বাঁধা পড়লেন জানকীনাথ।

স্বর্ণর বিয়ে হল তেরো বছর বয়সে। সে তুলনায় ঠাকুরবাড়ির বউরা সবাই অনেক কমবয়সে এসেছে। বিয়ের আগে মাকে জড়িয়ে ধরে স্বর্ণ জানতে চেয়েছিলেন সারদার বিয়ের গল্প।

নিজের বিয়ের প্রায় ভুলে যাওয়া বেত্তান্ত মনে করে সারদা বলেন, আমি ছিলাম যশোরের পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। আমার এক কাকা কলকেতা থেকে শুনে গেলেন কত্তার জন্য সুন্দরী মেয়ে খোঁজা হচ্ছে। ব্যস ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে।

সে কী গো? তার মানে আমাদের বাড়ির বউ-মেয়েরা কেউ তোমাকে দেখতে যায়নি? স্বর্ণ অবাক হন। ঠাকুরদের চিরদিনের রীতি ছিল প্রথমে দাসী পুতুল নিয়ে মেয়ে দেখতে যাবে, পছন্দ হলে সুযোগসুবিধে মতো যাবে বাড়ির মেয়েরা।

শোন, আমার কাকার বোধহয় ভয় ছিল পাত্র হাতছাড়া হয়ে যাবে। তিনি বাড়িতে ঢুকেই দেখলেন আমি দাওয়ায় বসে রান্নাবাটি খেলছি। টেনে তুলে কোনওরকমে একটা পরিষ্কার কাপড় পরিয়ে তৎক্ষণাৎ নিয়ে চললেন কলকেতায়। আমার মা তখন নদীতে নাইতে গেছিলেন। আমার মাত্র ছ'বছর বয়স। কেঁদেকেটে বললাম, মা আসুক তবে যাব। কাকা কোনও কিছু না শুনে আমাকে নিয়ে এলেন। মায়ের সঙ্গে শেষ দেখাটাও হল না। শুনেছি মা আমার ফিরে এসে মেয়ের শোকে উঠোনের গাছতলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই মরে গেলেন। এই তো আমাদের কালের মেয়েদের জীবন। তোরা অনেক ভাগ্য করে এই বাটিতে জন্মেছিস মা, অমন দেবতার মতো

বাবামশায় পেয়েছিস, তাই লেখাপড়া শিখলি, বাইরের হাওয়াবাতাস গায়ে মাখতে পারলি।

এখনও সারদা ভাবছিলেন, কত্তা অমন দেবতার মতো মানুষ বলেই ওঁর ধর্ম মানি আবার আমারটাও। মেয়ে-বউরা কি তা বোঝে না!

বর্ণকুমারী বালিকা, বেশি কিছু না বুঝেই সে বলে ওঠে, মা তুমি তো সেদিন মেজোকাকির কাছে লক্ষ্মীজনার্দনের জন্য পুজো দিয়ে পাঠালে। আমিই তো নিয়ে গেলাম মা, বাবামশায় কি তাতে রাগ করবেন?

ছোটকন্যার কথায় বিরক্ত হন সারদা, আঃ বন্নো, অত কথায় তোর কী কাজ, যা বলব, করবি ব্যস। যা তো এখেন থেকে।

সত্যিই লক্ষ্মীজনার্দনের চলে যাওয়ার দুঃখ ভুলতে পারেননি সারদাসুন্দরী। গোপনে ওবাড়িতে গৃহদেবতার জন্য পুজো পাঠান আবার স্বামীর বেম্মো উপাসনাতেও যোগ দেন। কেন, গিরীন তো বেম্মো হয়েছে আবার দেবপূজাও করে। তাতে দোষ হয় না? প্রথম প্রথম পূজা তুলে দেওয়ার কথা ভাবেননি কত্তা, কেবল দুগ্গাপুজোর সময়ে বাড়ি থাকতেন না, বাইরে ভ্রমণে চলে যেতেন। সেই দুঃখে সারদা পুজোর আনন্দে অংশ নিতে পারতেন না, সবাই যখন আনন্দে মাতোয়ারা, তিনি ঘরের কোণে বন্দি করে রাখতেন নিজেকে। যোগমায়া এসে টানাটানি করত পুজোর দালানে যাওয়ার জন্য। একবার কত্তামশায় পশ্চিমে বেড়াতে গেছেন আর তখন শুরু হয়ে গেল সেপাই বিদ্রোহ। কোনও চিঠি নেই, খবর নেই, চিন্তায় নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন সারদা। কত্তা হিমালয়ে বেম্মোচিন্তা করছেন আর আমি এদিকে হেদিয়ে মরি। তবু সে একরকম ছিল, পুজো হত, উনি পুজোয় থাকতেন না। তাই বলে পুজো উঠিয়ে দিতে হবে? এমন কথা বললেন বলেই তো গিরীন আর যোগমায়া লক্ষ্মীজনার্দনের মূর্তি নিয়ে আলাদা হলেন। তাই তো আমি বেম্মো উপাসনার বেদিতে বসেও নিজের ইষ্টমন্ত্র জপ করি আবার কত্তার ধম্মোকথাও শুনি। আকবরের হারেমে বসে যোধাবাই যেমন শিবপুজো করতেন।

এর জন্য স্বামীর প্রতি সারদার প্রেম অবশ্য কমেনি। এখনও কর্তা বাড়ি থাকলে সারদা উদগ্রীব হয়ে থাকেন তাঁর রাতের ডাকের জন্য। ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়লে সেই ডাক আসে। সারদা গা ধুয়ে উজ্জ্বল রঙের একটি নরম তাঁতের শাড়ি পরেন, কানে গলায় একটু আতর মাখেন। কখনও চুলে একটা

বেলকুঁড়ির মালা জড়ান, কখনও না হলেও চলে। এটুকুই তাঁর সাজ। বাড়ির বউদের মতো এক গা গয়না পরে, খোঁপায় গোরেমালা, আলতা সিঁদুরে পরিপাটি সাজ তাঁর দরকার নেই। কত্তাও সাদাসিধে সাজই পছন্দ করেন। সারা বছর পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ান আর ফিরে আসেন বাড়ির টানে, সারদার টানে। প্রথম যেবার দেবেন ঠাকুর বিষয়বৈরাগ্যে গঙ্গাবক্ষে দিন কাটাবেন স্থির করলেন, সারদা কেঁদেকেটে তাঁর সঙ্গে যাওয়ার বায়না জুড়লেন। দেবেন্দ্র তাঁর জন্য গঙ্গার বুকে পিনিস ভাড়া করলেন, তিন শিশুপুত্রকে নিয়ে কত্তার পিছু পিছু সেই পিনিসে গিয়ে উঠলেন অসূর্যম্পশ্যা সারদা। সেই তাঁর অবারিত গঙ্গাদর্শন। সান্ত্বনা এই যে বেম্মোজ্ঞান কত্তাকে বিবাগী করেনি। বরং বছর বছর সারদার কোলজুড়ে সন্তান এসেছে। সবাই বাঁচেনি, সবার দিকে সমান নজর দিতেও পারেন না সারদা। কর্তার সেবা করে আর সোহাগ পেয়েই খুশি থাকেন স্বামীসোহাগিনী।

১৮৪০ থেকে পরবর্তী তেইশ বছরে নয় ছেলে ও ছয় মেয়ের জন্ম দিয়েছেন সারদা, তাঁদের মধ্যে বেঁচে আছেন মাত্র দশজন। দ্বিজেন্দ্রর জন্মর দু'বছর পরে সত্যেন এল, তার দু'বছর পরে হেমেন, একবছর দশমাসের মাথায় বীরেন, আরও দু'বছর পরে কন্যা সৌদামিনী, তারপর জ্যোতিরিন্দ্র। দ্বিতীয় কন্যা সুকুমারী মাত্র চোদ্দো বছর বয়সেই মারা যায়। তার পরের ছেলে পুণ্যেন্দ্র জলে ডুবে মারা গেল মাত্র ছ' বছরে। এরপর তিনটি কন্যা শরৎকুমারী, স্বর্ণকুমারী ও বর্ণকুমারী। সোমেন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পরেও জন্মেছিল বুধেন্দ্র, কিন্তু সেও শৈশবে মারা যায়। এতগুলি ছেলেমেয়ের দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল দাসী ও চাকরদের হাতে। সেকালের ধনীঘরের নিয়ম ছিল জন্ম থেকেই শিশুরা ধাইয়ের স্তন্যদুগ্ধে লালিত হত। প্রত্যেক শিশুর জন্য একটি স্তন্যদাত্রী ধাই ও একটি পালিকা দাসী নিযুক্ত হত, জন্মদাত্রী মায়ের সঙ্গে শিশুদের বিশেষ সম্পর্ক থাকত না। সারদার ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেও তাই হয়ে আসছে। তবে যতদিন যোগমায়া একসঙ্গে ছিলেন, তাঁর সান্নিধ্যই ছিল ছোটদের আশ্রয়, তাঁর কাছেই ছিল তাদের যত আবদার আহ্লাদ। এখনও তাঁরা তাই মেজোকাকির অভাব বোধ করেন। যদিও পরে জন্মানোর জন্য বর্ণ, সোম ও রবি মেজোকাকির স্নেহের ভাগ থেকে একেবারেই বঞ্চিত। তাঁদের কোনও অভাব বোধ নেই কারণ তাঁরা জানেনই না মাতৃস্নেহের ঘনিষ্ঠ রূপ কীরকম।

ইতিমধ্যে সারদার কুটনোর আসরে এসে উপস্থিত হয়েছেন সদ্যবিবাহিতা স্বর্ণকুমারী। ঠাকুরবাড়ির অন্য বিবাহিতা মেয়েদের মতো তিনি পিতৃগৃহে থাকেন না। ঠাকুররা একে পিরালি তায় ব্রাহ্ম। এঘরে বিয়ে হলে বাপের ঘরে ত্যাজ্য হতে হয়। মেয়ে-জামাইরা তাই বিয়ের পর এখানেই থাকেন। ছেলের বউ এলে তার বাপের বাড়ির লোকদেরও ঠাঁই দিতে হয়। স্বর্ণর স্বাধীনচেতা বর জানকীনাথ ঘোষালকেও তাঁর বাবা ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু প্রথম থেকেই জানকীর শর্ত ছিল যে তিনি ব্রাহ্ম হবেন না, ঘরজামাইও থাকবেন না। দুটি শর্তই সসম্মানে মঞ্জুর করেন দেবেন্দ্রনাথ। কিন্তু স্বর্ণ নিজের আলাদা সংসার থেকে প্রায় রোজ জোড়াসাঁকোয় ঘুরে যান। আজ তিনি পরেছেন পেস্তা রঙের ক্রেপ শাড়ি, তাতে পারশি এমব্রয়ডারি করা পাড়। গায়ে লেস লাগানো জ্যাকেট। স্বর্ণ নিজেও বোম্বাই-ধাঁচের শাড়ি পরা আয়ত্ত করেছেন। এ-ব্যাপারে জ্ঞানদার সহযোদ্ধা তিনি। ব্রোচ লাগানো ছোট আঁচলে ঘোমটা টানতে অসুবিধে বলে মাথায় একটি কারুকাজ করা টুপি পরা চালু করেছেন, এটা তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবন। স্বর্ণ এসে একটি জলচৌকিতে বসে গল্প করেন। সবাই কৌতূহল নিয়ে তাঁকে দেখতে থাকে।

স্বর্ণ এসেছেন শুনে দোতলার ঘর থেকে জ্ঞানদাও নেমে আসেন। ওঁদের দুটিতে খুব ভাব। স্বর্ণ তাঁর দিকে প্রীতির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, কী গো মেজোবউঠান, শুনেছ আমাদের সাজপোশাক নিয়ে কত রগড় লেখা হচ্ছে?

হ্যাঁ স্বর্ণ, সেদিন নতুনঠাকুরপো বলছিল, কয়েকটি কলেজের ছোকরা নাকি বলাবলি করছে ঠাকুরবাড়ির 'বউবিবি' আরও কত কী!

তবু তোদের হাওয়া খেতে যেতে হবে? সারদা বিরক্তি চেপে রাখেন না। ঠাকুরবাড়ির এত বদনাম আমার প্রাণে সয় না বাপু।

কেন মা, পত্রিকায় মেজোবউঠানের দেওয়া বিজ্ঞাপন দেখে কত ব্রাহ্মিকা শাড়ি-পরা শিখতে আসছেন দেখছ তো! আগে এঁরা গাউন পরে বাইরে বেরনোর কথা ভাবছিলেন। কেউ কেউ তো গাউনের ওপর আঁচল জুড়ে কিম্ভুত পোশাক তৈরি করে ফেলেছেন। তার চেয়ে বোম্বাই কায়দায় শাড়ি পরার দিশি ঢং অনেক ভাল।

বছর আটেকের একটি বালিকা কোথা থেকে হঠাৎ দৌড়ে এসে সারদাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। মেয়ে-বউরা সব সচকিত হয়, কে এই মেয়েটা?

সারদা ওর হাত ছাড়িয়ে মুক্ত হতে চেষ্টা করেন, এই, কে রে তুই?

কোত্থেকে এসে আমার গায়ে উঠে পড়লি? আমার এ-সব একদম ভাল্লাগে না, তোরা জানিস না? সর, সরে যা বলছি।

মেয়েটি মুখ তুলে বলে, আমাকে ওরা ধরে নিয়ে যেতে আসচে, তুমি বাঁচাও কর্তামা। আমি তোমার কাছে থাকব।

এই মানদা, এটা কে রে? ওপাশের কুটুমদের কারও মেয়ে নিশ্চয়? দাসীদের কাছে জানতে চান সারদা। সরিয়ে নিয়ে যা ওকে।

মানদা টেনে মেয়েটিকে সারদার কাছ থেকে সরিয়ে আনে। ঠাস করে থাপ্পড় দিয়ে বকে ওঠে, এই বেহায়া মেয়ে, কে রে তুই?

বালিকা ফুঁপিয়ে উঠে বলে, আমি তো রূপা, আমি এখেনে এসে রোজ বসে থাকি তোমাদের পেছুনে, দেকনি আমাকে?

বালিকার মুখটি ভারী মিষ্টি, মায়াময়। সারদা জানতে চান, তুই কোথায় থাকিস, মা কে রে তোর?

তুমিই আমার মা। সরিয়ে দিচ্ছ কেন, আমি আর ওখেনে যাব না। ওরা আমায় ভালবাসে না কেউ।

ঘোমটায় জড়সড় একটি বউ ছুটে এসে মেয়েটাকে টানতে যায়। সারদা গম্ভীর গলায় বলেন, দাঁড়াও, কে তুমি? আর মেয়েটাই বা কে? তোমার মেয়ে?

হাত জোড় করে বউটি জানায়, অপরাধ নেবেন না কত্তামা, আমরা আপনার আশ্রিত, কুটুমদের মহলে থাকি। এটি আমার সোয়ামির আগের পক্ষের মা-মরা মেয়ে। এমন দজ্জাল, কোনও কথা শোনে নাকো। মারতে মারতে আমার শাখা ভেঙে যায়, ওর শিক্ষে হয় না।

সারদা হুকুম দেন, খবরদার ওকে মারবে না বলছি। সতীনের মেয়ে বলে মেরে হাতের সুখ করছ? আমার এখানে থাকতে হলে এ-সব চলবে না। মানদা তুই নজর রাখ তো কুটুম মহলে। গুষ্টির লোক আমাদের খাচ্ছেদাচ্ছে আর বাড়ির নিয়ম মানছে না, এ আমি সইব না। আমার ছাতের নীচে কোনও মেয়ের গায়ে কেউ হাত তুলবে না।

রূপা সৎমায়ের হাত ছাড়িয়ে সারদার দিকে ছুটে আসতে চায় আবার। দূর থেকে দেখে দেখে সে বুঝেছে এই মহিলার দয়া পেলে সে বেঁচে যাবে। এখানকার আলো-হাওয়া, হাসি-গল্প আনন্দের জগৎ ছেড়ে সে আর ওই কুটুম মহলে অন্ধকার, কলহ, ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে ফিরে যেতে চায় না।

তবু যেতে হয়। যাওয়ার আগে তার করুণ দৃষ্টি দেখে একটু মায়া হয় সারদার। তিনি বলেন, তুই রোজ সকালে এখানে এসে আমাকে প্রণাম করে যাস রূপা। এই একটি কথায় বালিকার জীবন যেন বদলে যায়। সে বোঝে, আর তাকে মার খেতে হবে না।

আসর সেদিন ক্রমশই জমে উঠছিল। ইতিমধ্যে বই-মালিনী এসে হাজির হতে সোনায় সোহাগা। ধনী ঘরের মেয়েদের বই বিক্রি করে বেড়ায় সে। অন্দরে বাইরে অবাধ গতি। সে এলেই ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা যেন নেচে ওঠে, তাদের ঘরবন্দি জীবনে রহস্যময়ী মালিনীর আসা যেন ঠিকরে আসা আলোর মতো। শুধু বই নয়, মেয়েরা মালিনীকে ঘিরে ধরে কারণ তার কাছে রাজ্যের গল্পের ঝাঁপি। বাবুবিবিদের কেচ্ছা থেকে বামাবোধিনীর নতুন কিস্যা।

তাকে দেখে জ্ঞানদা এগিয়ে এসে হাত ধরেন, এসো এসো, কতদিন পরে আমাদের কথা মনে পড়ল বই-মালিনী। গল্পগাছা করতেও তো আসতে পারো মাঝে মাঝে।

আমার কি আর গল্প করার ফুরসত আছে বউঠান, এ-বাড়ি থেকে সে-বাড়ি, বটতলা থেকে বইপাড়া, একাল থেকে ত্রিকাল ছুটে বেড়াই। আগামীদিনে যে বই লেখা হবে তাও আমি শুনিয়ে দিতে পারি, তবে সে গুহ্যকথা, সবাইকে জানানো যায় না। মালিনী কৌতুক করে।

জ্ঞানদা হেসে উঠে বলেন, তুমি বেশ কথা বলো বই-মালিনী, কেমন রহস্যের গন্ধ! যেন আমাদের জগৎ থেকে বহুদূরের কোন জাদুলোকে তোমার বাস। কথা বললে মনে হয় আমিও সেই জাদুর জগতে ঢুকে পড়েছি। তোমার বইয়ের চেয়েও তোমার কথা শোনার লোভে ডেকে পাঠাই।

যাবে নাকি একদিন আমার জাদুলোকে মেজোবউঠান? চাও তো তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারি। মালিনী হেসে হেসে বলে, তুমি তো যে-সে লোক নও, তোমার কথা এখন শহরের লোকের মুখে মুখে ফিরছে, যেখানে যাই লোকে তোমার কথা শুধোয়। তুমি সেই গবর্নর হাউসের পার্টিতে গিয়ে সক্কলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছ। অনেকে নাকি তোমাকে দেখে বিশ্বেস করতে পারেনি, ভেবেছিল ভোপালের বেগম। বড়ঘরের এদেশি মেয়েদের মধ্যে তিনি একাই তো এতদিন বাইরে বেরোতেন।

সারদা রাগ করে বলেন, তুই আর ধুনো দিস না মালিনী। সেখেনে একদল গোরা সাহেবমেমের মধ্যে মেজোবউমাকে দেখে লজ্জায় ছ্যা ছ্যা করে

আমাদের জ্ঞাতির লোকেরা পালিয়ে এসেছেন সেদিন। প্রসন্ন ঠাকুর কত্তার কাছে কত রাগ করেছেন।

সে যাই বল মা, স্বর্ণ বলেন, মেজোবউঠানকে দেখে সেদিন এমন গর্ব হচ্ছিল, আমি তো নিজে হাতে সাজিয়ে দিয়েছিলাম। মাথায় সিঁথি পরালাম, গয়না পরালাম। আশমানি বেনারসি শাড়িতে, অলংকারে, ঋজু ভঙ্গিতে তাকে ঠিক রাজরানি মনে হচ্ছিল। মেজদা যেতে পারলেন না বলে এক মেমসাহেবের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। সে কী মহাব্যাপার, শত শত ইংরেজ মহিলার মধ্যে একজন বঙ্গরমণী। মেজদাদা কত গর্ব করছিলেন সেজন্য।

বই-মালিনী একটি পত্রিকা খুলে ধরে, এই দেখো, সোমপ্রকাশের পৌষ সংখ্যায় কী লিখেছে পড়ে শোনাই, 'গত বৃহস্পতিবার গবর্ণর জেনেরলের বাটীতে রাত্রিকালে যে মজলিস হয়, তাহাতে বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী আমাদিগের জাতীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া উপস্থিত ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে কোন হিন্দু রমণী রাজ প্রতিনিধির বাটীতে গমন করেন নাই।'

সে যদি গেলেই বাছা, স্বামীর সঙ্গে গেলেই কি ভাল হত না! সারদা বলে ওঠেন। জ্ঞানদা মনে মনে ভাবেন সংস্কার তা হলে ভাঙছে; এই সেদিন গাড়ি চেপে বাড়ি আসার জন্য যে কত্তামায়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল সেই তিনিই এখন মৃদু আপত্তি জানাচ্ছেন স্বামী সঙ্গে না থাকায়, যেন যাওয়াটা তিনি বাধ্য হয়ে মেনে নিলেন। জ্ঞানদা জানেন বাঙালি মেয়েদের মন থেকে এইভাবে এক এক করে অনেক অন্ধকার কাটাতে হবে। এই তো সবে শুরু!

ইতিমধ্যে মালিনীর ঝাঁপি থেকে অনেক বই বেরিয়ে পড়েছে। জ্ঞানদা একটা একটা করে উলটে পালটে দেখতে থাকেন। বটতলার একগাদা নতুন বই, উপন্যাস, কাব্য, আষাঢ়ে গল্প এনেছে। মানভঞ্জন, রতিবিলাপ, কোকিলদূত, বস্ত্রহরণের সঙ্গেই আছে গীতগোবিন্দ, আরব্য রজনী, পারস্যোপন্যাস, লায়লা মজনু, বাসবদত্তা।

একটি বই হাতে নিয়ে স্বর্ণ অবাক হন, ওমা এ যে রবিনসন ক্রুশো। মালিনী তুমি বিলিতি বইয়ের বঙ্গানুবাদ এনেছ, কী মজা! আবার সচিত্র বই, ছবিগুলো কিন্তু ভালই এঁকেছে।

কই দেখি দেখি, বালিকা বর্ণ এসে টানাটানি করে ছবি দেখতে চান। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা মালিনীর বই জমিয়ে জমিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ ভাল লাইব্রেরি করে ফেলেছেন, সেখান থেকেই ছোট মেয়েদের গল্প উপন্যাস

পড়া শুরু হয়। বাড়ির বালকেরা এই রসভাণ্ডারের খোঁজ পায় দেরিতে কারণ শিশুবয়সে বাইরের চাকরদের মহলেই তাদের থাকার নিয়ম। বিশেষ কোনও মাসিমা মামিমা বউঠানদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে না পারলে অন্দরে ঢোকা যায় না। নিয়মমতো বিয়ের পর ছেলে-বউয়ের জন্য একটি ঘর নির্দিষ্ট হলে তবেই ভেতরমহলে ছেলেরা ঢুকতে পারে। বিয়ের পর থেকে সত্যেন এই লাইব্রেরির নিয়মিত পাঠক। সত্য আর রবি কোনও ছুতোয় ভেতরে ঢুকতে পারলেই মেয়েদের পাঠাগারের বই নাড়াচাড়া করেন। যে-সব বই তাঁদের পড়তে বারণ করা হয় সেগুলো লুকিয়ে পড়ার জন্য নানারকম উপায় খোঁজেন। সারদা নিজে পড়েন কম, প্রায়ই ছেলেদের ডেকে রামায়ণ বা চাণক্যশ্লোক পড়ে শোনাতে বলেন। সেই সূত্রেই সেজো আর ছোটর অন্দরের লাইব্রেরির সঙ্গে পরিচয়।

ছ'বছরের রবি ক'দিন আগেই বইয়ের লোভে এক দুঃসাহসিক কাণ্ড ঘটাল। দুর সম্পর্কের এক মাসিমা দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাইবারিক' পড়ছিলেন, রবি সে-বই পড়তে চাইলে বয়স হয়নি বলে তাঁকে নিষেধ করা হল, চাবি দেওয়া আলমারিতে বই তুলে রেখে চাবি আঁচলে বেঁধে পিঠে ফেললেন মাসিমা। বালক রবি সেই চাবি চুরি করতে গিয়ে ধরাও পড়লেন। মাসিমা কোলের ওপর চাবি রেখে মেয়েদের সঙ্গে গোল হয়ে বসে তাস খেলতে লাগলেন। এবার কী হবে, বইটা তো পড়তেই হবে রবিকে! কিন্তু কী উপায়ে? বাধ্য হয়েই বালককে কুটিল কৌশল নিতে হল।

মাসিমার হাতের কাছে পানদোক্তার পাত্র এনে রাখলেন রবি। পানের নেশায় অন্যমনস্ক মাসিমা ঝুঁকে পিক ফেলতেই কোল থেকে চাবিটি মাটিতে পড়ল, মাসিমা চাবি মেঝে থেকে কুড়িয়ে অভ্যাসমতো আবার আঁচলে বেঁধে পিঠে ফেললেন। এবার আর রবির চাবি চুরি করতে কোনও অসুবিধে হল না। চাবি নিয়ে আলমারি খুলে বই বার করে পড়া হল এবং চোর ধরা পড়ল না। পরে রবি নিজে ধরা দিতে সবাই চেঁচামেচি শুরু করল কিন্তু শাস্তি কিছু হল না।

এখন বই নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে থাকা মেয়েদের দিকে তাকিয়ে সারদা বলেন, ওরে শুধু তোরাই দেখবি, না আমাকে কিছু পড়ে শোনাবি? স্বন্নো এদিকে আয়, আমাকে চাণক্যশ্লোকের ক'পাতা পড়ে শোনা দেখি।

মালিনী বলে, চাণক্যশ্লোক তো রোজ শোন কত্তামা, আজ তোমাকে নতুন

একটা কাহিনি শোনাব। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত সীতার বনবাস। শুনলে তোমার চোখে জল আসবে গো মা। কিংবা যদি চাও বামাবোধিনীতে একটা মজার লেখা বেরিয়েছে, সেটা শোনাই...

স্বর্ণ বিরক্ত হয়ে বলেন, আবার তুই সেই বামাবোধিনীর গা জ্বালানো লেখাগুলো এনেছিস! বলেছি না ও-সব স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশমার্কা লেখা আনবি না, হাজার বছর ধরে ও-সব শুনে শুনে কান পচে গেছে। যেন মনে হয় মেয়েদের শিক্ষা দেবার একমাত্র উদ্দেশ্য সুমাতা, সুভার্যা, সুগৃহিণী তৈরি করা। ও-সব আর শুনতে চাই না।

স্বর্ণদিদি, তোমাদের নতুন মেয়েদের নতুন যুগের ধরন ধারণ দেখে যাঁদের মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে তাঁরাই ও-সব লেখাচ্ছেন। তাঁরা ভয় পাচ্ছেন লেখাপড়া শিখে একে মেয়েরা মাথায় উঠেছে, এখন বাইরে বেরতে শুরু করলে তাদের আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। মেয়েরা আর ঘরের কাজ করবে না, ছেলে মানুষ করবে না, পতিভক্তি উঠে যাবে, শাশুড়ি সেবা পাবেন না। দেখো না, বঙ্কিমবাবু কেমন দেবী চৌধুরানীকে প্রথমে শক্তিরূপা করে এঁকেও আবার স্বামীর পদতলে নামিয়ে দিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন, 'পশ্চিমের মেয়েরা প্রধানত পত্নী, এদেশের মেয়েরা মূলত মা।' লিখেছেন, 'মায়েদের কর্তব্য স্বাস্থ্যবান, শৌর্যপরায়ণ, দেশপ্রেমিক, আর্যজনোচিত সুসন্তান গঠন।'

বাবারে বাবা, সব দায় যেন মেয়েদের, স্বর্ণ বলেন, মেয়েরা যদি ঘরকন্নার কাজে সারা দিনরাত বাধা পড়ে থাকে তো তারা শিল্পসাহিত্য করবে কী করে? দেশের কাজে যোগ দেবে কীভাবে?

মালিনী বলে, অন্তঃপুর, ভারতমহিলা সব পত্রপত্রিকার দেখো মেয়েদের কর্তব্য নিয়ে যেন চিন্তায় ঘুম হচ্ছে না। প্রগতিশীল বাবুমশায়রা বিবিদের শিক্ষিত করতে চান, কিন্তু গেরস্থালির নিগড় থেকে মুক্তি দিতে নারাজ। আর রক্ষণশীলেরা স্ত্রীশিক্ষার নামেই কেঁপে উঠছেন। প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ অনেকে প্রচার করছেন প্রাচীন ভারতে নারীর স্থান ছিল সুউচ্চ। তাই যদি হবে স্বর্ণদিদি, তা হলে অন্দরমহলে এত অন্ধকার কেন?

আচ্ছা মালিনী, তুই তো এত জানিস, সারদা জানতে চান, বল তো বিলিতি মেমরা কি খুব সুখী আর স্বাধীন?

ওরা আমাদের মেয়েদের চেয়ে হাজার গুণ স্বাধীন কত্তামা, কিন্তু ওদেরও

অনেক দুঃখ আছে, পরাধীনতা আছে। মালিনী জানায়, মারি উলস্টোনক্রাফট নামে এক বিবির লেখা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে খুব হইচই হচ্ছে, তিনি লিখেছেন, স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসবে সহযোগীর মতো কিন্তু তার শাসনদণ্ডের কাছে মাথা নোয়াবে না। এ-সব লেখার জন্য তাঁর বর ছেড়ে গেছে। সমাজ টিটকিরি দিয়েছে, কিন্তু তিনি লড়াই চালিয়ে গেছেন। এখন তাঁর মতামতের কিছু শিষ্যা তৈরি হয়েছে। ভাবো কত্তামা, আমরা ওদেশের মেয়েদের স্বাধীন ভাবছি আর ওরা সেই স্বাধীনতা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে। তা হলে আমরা কোথায় আছি?

উফ, তুই কী যে বলিস অদ্ধেক আমার মাথায় ঢোকে না মালিনী। বিলেতে বসে কোন মেমসাহেব কী লিখছে, কী বলছে আর তুই জেনে ফেললি!

মালিনী হাসে, কত্তামা, আমি বলেছি না জাদু জানি। কী শুনতে চাও বলো না। সময় আমাকে বাঁধতে পারে না। আমার বয়স বাড়ে না। কালিদাসের কথা জানতে চাও, আমিই হয়তো ছিলাম তাঁর মালঞ্চের মালিনী। হয়তো ভবিষ্যতে তোমার ছোট ছেলে রবি কী লিখবে তাও আমার চোখের সামনে ফুটে উঠবে। বলো, শুনতে চাও? বিলিতি মেমদের গুহ্যকথা চাও না দু'শো বছর পরের কলিকাতা? বিক্রম বেতাল না বামাবোধিনী?

জ্ঞানদা এতক্ষণ শুনছিলেন, এবার বললেন, ঠাট্টা ছাড় মালিনী, ঠিক করে বল তো বামাবোধিনীর মতো পত্রিকাগুলি কি তা হলে বিবিসাহেবের কথামতো শুধু দাসত্বের পাঠক্রমই শেখাচ্ছে? আবার মেয়েরা সব গৃহকাজ তুলে দিলে কাজটা করবেই বা কে? ইংরেজ মেয়েরা কিন্তু খুব নিপুণ ভাবে সংসার করে। সেটাও কি শিক্ষণীয় নয়?

ঘরের কাজ নিয়মিত অভ্যেসে নিপুণ করে তোলাটাকেও একটা আর্ট বলে মানেন জ্ঞানদা। সংসারের সবদিকে তাঁর পরিপাটি নজর। রুচিশীল পোশাক যেমন পরতে হবে, ভারতীয় সংস্কৃতির ভাল দিকটাও রাখতে হবে। আবার তার সঙ্গে মেশাতে হবে ইংরেজ কেতার ভাল অংশটিকে। তিনি নিজেকে যেমন ফিটফাট রাখেন, নিজের ঘরকেও।

স্বর্ণকুমারী কিন্তু জ্ঞানদার মতো গুছিয়ে ঘরের কাজ করা পছন্দ করেন না, তাঁর মনে হয় গৃহকর্ম করলে সময় নষ্ট, তার চেয়ে অনেক জরুরি কাজ তাঁর করার আছে। তিনি প্রতিবাদ করেন, কেন মেজোবউঠান, মেয়ে হয়ে জন্মালেই কেন ও-সব করতে হবে? মিসেস স্মিথের কাছ থেকে মারি উলস্টোনক্রাফটের

ওই বইটা আনিয়ে নিয়ে পড়েছিলাম, 'এ ভিন্ডিকেশন অফ দি রাইটস অফ উইমেন'। ওঃ, সে কী তেজস্বিনী লেখিকা, কী আগুনঝরা কথাবার্তা! আমিও শুনেছি, এজন্য তাঁকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, বিলেতে কেউ তাঁর কথাবার্তা ভালভাবে নেয়নি, সভা বয়কট করেছে, স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেছে, তবু তিনি দমেননি।

জ্ঞানদা বললেন, বোম্বাই থাকতে আমিও মারির কথা শুনেছি। সাধারণ ইংরেজ মহিলারা তাঁর নাম শুনলে ভয় পান আর পুরুষরা রেগে ওঠেন। ঠাকুরঝি, আমরা বোধহয় তাঁর চেয়ে ভাগ্যবতী, আমাদের দু'জনের স্বামীরা আমাদের সঙ্গে আছেন, এবং তাঁরাই স্ত্রী স্বাধীনতার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। মারিকে কিন্তু বিলেতে বসেও ঘরে বাইরে যুদ্ধ করতে হয়েছে। ঘরের কাজে মন না দিয়ে লেখালেখির চর্চা করে তিনি সে দেশে কোণঠাসা হয়েছেন আর এ দেশে বামাবোধিনী শিক্ষিত মেয়েদের ঘরের কাজে অবহেলা করতে না বলে কী এমন অপরাধ করছে?

মালিনী বলে ওঠে, আমাদের এখানেও দুয়েকজন মুখ খুলছেন স্বর্ণদিদি, এই তো দু'-তিন বছর আগে 'সোমপ্রকাশে' বেরিয়েছিল স্ত্রীলোকের পরাধীনতা বিষয়ে বামাসুন্দরীর চিঠি। মেয়েরা কী করবে সেটা মেয়েরাই ঠিক করুক না!

ঠিকই তো, দাসী চাকরদের দিয়ে যে-কার্জ করানো যায় তার জন্য শিক্ষিত পত্নীর কেন দরকার? না করলেই কেন সাড়ে সর্বনাশ হবে? আমি কী করব সেটা বামাবোধিনীর জ্ঞান শুনে ঠিক করতে হবে? স্বর্ণকুমারী রাগত স্বরে বললেন।

একটু হেসে মালিনী বলে, এই বিতর্ক বেশ জমে উঠেছে। কিন্তু স্বর্ণদিদি, বামাবোধিনীর এ-লেখা সে-লেখা নয়। আধুনিকা আর পুরাতনীর বিরোধ নিয়েই একটা মজার কথোপকথন, শোনোই না—

'সরমা ও সুশীলার কথোপকথন

সরমা। ভাই, আজিকালি মেয়েমানুষে লজ্জা সরমের মাথা খেয়েছে। শ্বশুর, ভাসুর, শাশুড়ী ননদ দেখিয়া একটু ভয়সমীহ করে না। আর অধিক কি বলিব, স্বামীর সঙ্গে নির্লজ্জ হয়ে কথাবার্ত্তা কয়।

সুশীলা। সরমা মেয়েমানুষেরা কি গারোদে বাঁধা চোর? দেখ দেখি, ঈশ্বরের এতবড় জগতে সকল জীবজন্তু ইচ্ছায় ভ্রমণ করিয়া মনের সুখ লাভ করিতেছে। কিন্তু ইহাদিগকে চারি পাঁচিলে ঘেরা অন্তঃপুরের মধ্যে রুদ্ধ থাকিতে হয়। পাখীরা যে পিঁজরাতে বদ্ধ থাকে, তার মধ্যে তাহাদের একটু স্বাধীনতা আছে, চারি পাঁচিলের মধ্যেও নারীগণ একটু স্বাধীনতা না পাইলে তাদের বাঁচিয়া থাকা কেবল যন্ত্রণা মাত্র। আর আমি বলি কেবল ঘোমটা দিয়া জুজু হইয়া থাকিলেই যে মেয়েমানুষ খুব ভাল হইল তাহা নয়। যাহার রীত চরিত্র ভাল, তাকেই ভাল বলি।

স। তোমরা কালের মত মেয়ে। তোমাদের ভাব গতিক আলাদা। কোন্ কালে মেয়েরা বেহায়া হলে ভাল রীত চরিত্র আবার দেখাতে পেরেছে? কোন্‌কালে আবার মেয়েরা লজ্জা খেয়ে গুরুলোকের সঙ্গে স্পষ্টাস্পষ্টি কথা কয়ে বেড়ায়েছে?

সু। যথার্থ লজ্জা, নম্রতা, বিনয়, সুশীলতা তাহা স্ত্রীলোকের অলঙ্কার সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি মনে সেরূপ ভাল ভাব না থাকে, বাহিরের লজ্জা কি কোন কাজের হয়? কত মেয়ে খুব লজ্জা দেখাত, কিন্তু দুঃখের কথা কি বল্‌বো তারা অনায়াসে আবার বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, খুব তিলক ফোঁটা কাটিয়া যারা বাহিরে ধার্ম্মিক দেখায়, তাদের মধ্যেই ভণ্ড বেশী। যাহা হউক তুমি জেন, এখন স্ত্রীলোকদের মধ্যে যেরূপ ভণ্ড লজ্জা দেখা যায়, পূর্ব্বকালে এ রূপ ছিল না। সীতার ন্যায় সতী কে? কিন্তু তিনি রামচন্দ্র বনে গেলে কাহার কথা না শুনিয়া পতির অনুসরণ করিলেন এজন্য ত কেহ তাঁহাকে বেহায়া বলিল না। সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি যত বিখ্যাত রমণীর কথা শুনা যায়, কেহ ত পরিবারের মধ্যে ঘোমটা দিয়া বসিয়া ছিলেন না, অথচ তাঁহাদের ন্যায় পতিভক্তিপরায়ণা ও গুণবতী রমণী কোথায় দেখা যায়? বেদ পুরাণ ও আর আর প্রাচীন শাস্ত্র যত পাঠ করা যায়, ততই দেখা যায় শাশুড়ী ননদ স্বামী কি শ্বশুর ভাসুরের সঙ্গে কোন স্ত্রীলোক কথাবার্ত্তা কহা পাপ বিবেচনা করিতেন না। আজি কালি মেয়েদের ভাল গুণ থাকুক না থাকুক তাঁহারা বাহিরে লজ্জা দেখাইয়া বাহাদুরী করিতে চান!!

স। আমরা রামায়ণ মহাভারতের এ সব কথা শুনেছি বটে, কিন্তু তুমি বল দেখি সে কালের ব্যাভার কি একালে খাটে? আর এরকম না কল্লেই বা ক্ষতি কি?

সু। এই তুমি বলিতেছিলে কোন্ কালে মেয়েরা এরূপ ছিল, কথা উল্টাইয়া লইলে। ভাল, পূর্ব্বকালে এখনকার মত ভণ্ড লজ্জা দেখাইবার প্রথা ছিল না তাহা ত বুঝিয়াছ। সেকালের ভাল প্রথা একালে ঘটিবে না কেন তাহাত বুঝিতে পারি না। বর্ত্তমান প্রথায় কি ক্ষতি, বলিতেছি। জগদীশ্বর মুখ দেছেন কেননা মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য। মেয়ে মানুষেরা কথা কহিতে পায় না বলিয়া ত তাঁহাদের মন চুপ করিয়া থাকেনা। মনের কথা কাহার সঙ্গে প্রকাশ করিতে না পাইলে তার চেয়ে দুঃখ কি আছে? কত সময় তাহাদের পীড়া ও অনেকপ্রকার কষ্ট উপস্থিত হয়, প্রথমে প্রকাশ করিতে না পারিয়া শেষে বিপরীত ঘটিয়া উঠে। বাঘা শাশুড়ী ননদের ঘরে নববধূদিগের যে দুরবস্থা, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? এই কারণে অনেকের অপঘাত মৃত্যু ও অপথে পদার্পণও হইয়া থাকে। আর মনে কর হিন্দুর ঘরের ৮/১০ বৎসরের একটী শিশু বাপ মা ভাই ভগিনী সকল পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুরগৃহে আসিল। সেখানে সে যদি আপনার লোক না পায়, তাহাকে সর্ব্বদা কুণ্ঠিত হইয়া মুখবন্ধ করিয়া থাকিতে হয়, কাহার মুখপানে চাহিয়া স্নেহ পাইবার আশা না থাকে সে কিরূপে জীবনধারণ করিতে পারে? অনেক গৃহে নববধূদের যে কষ্ট তাহা তাহারাই জানে আর সেই অন্তর্যামী পুরুষই জানেন। শাস্ত্রমতে পতির গৃহই স্ত্রীলোকের গৃহ, পতির পিতা মাতা ভাই ভগিনী তাহারাও পিতামাতা ভাই ভগিনী। তবে তাহাদের নিকট এত লজ্জা কেন? লজ্জা পর বা পাপ বোধ করাইবার চিহ্ন। গৃহ, পিতা মাতা, ভাই ভগিনী আপনার সামগ্রী সকল যাহা দ্বারা পর বোধ হয়, এমন লজ্জার ন্যায় শত্রু আর কে আছে? আর পিতা মাতা ভাই ভগিনী আত্মীয়গণের নিকট সরল ভাবে মনের কথা প্রকাশ করিলে তাহাতে যে পাপ আরোপ করে তাহার ন্যায় কু আচার বা জগতে কি আছে?

লজ্জা থাকাতে যাহার প্রতি যে কর্ত্তব্য তাহা প্রতিপালন করিবার অনেক ব্যাঘাত হয়। স্ত্রীলোকেরা যদিও হীনবল, কিন্তু তথাপি তাঁহারা অশেষ প্রকারে পরিবারের সাহায্য করেন ও করিতে পারেন। কিন্তু অনেক সময় কুৎসিত লজ্জা আসিয়া আপনার মত অতি আত্মীয় জনের বিপদ পীড়া ও দুর্ঘটনার সময় সাহায্য করিতে দেয় না। কত সময় বধূ বা ভাদ্রবধূদের সম্মুখে শ্বশুর বা ভাসুর যদি প্রাণত্যাগ করেন, তথাপি তাহার হস্ত প্রসারণ করিবার ক্ষমতা নাই, একটী সান্ত্বনার কথা বলিবার উপায় নাই। একি সামান্য দুঃখের কথা! এসকল শাস্ত্র ছাড়া—যুক্তি ছাড়া।

স। লজ্জা দ্বারা অনেক ক্ষতি হয় তাহার সন্দেহ কি? কিন্তু তুমি যে বলিলে ইহা শাস্ত্র ছাড়া, যুক্তি ছাড়া তবে সকলে ইহা ধরিয়া চলেন কেন?

সু। এতদিন স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখত না কেন? হিন্দুরা জাহাজে চড়িয়া বিদেশ যাইত না কেন? বিধবা বিবাহ মন্দ ও সহমরণ ভাল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল কেন? দেশাচার ও কুসংস্কারে কিনা করে? তবে যে প্রথাটী হয় তাহার একটা না একটা কারণ থাকে। স্ত্রীলোকের নম্রতা থাকা উচিত ইহা বেশী করিতে গিয়া এবং পুরুষেরা একটু আপনাদের কর্ত্তৃত্ব বাড়াইতে গিয়া স্ত্রীলোকদিগকে জুজু করিয়া ফেলিয়াছেন। এ প্রথা কোন দেশে নাই এদেশেও থাকিবে না।

স। আচ্ছা, বাড়ীর আর আর লোকের সঙ্গে কথা কহুক, কিন্তু বল দেখি বৌ হইয়া স্বামীর সঙ্গে স্পষ্টাস্পষ্টি কথাবার্ত্তাটা কি ভাল দেখায়?

সু। পতিই স্ত্রীলোকের গতি, পতিই সুহৃদ্ বন্ধু সকলই। পতির ন্যায় আত্মীয় কে হইতে পারে? পূর্ব্বকালে সতীরা পতির জন্য কি না করিয়াছেন? কিন্তু কি আশ্চর্য্য একেলে সংস্কার! এমন পরম আত্মীয় পতির সহিত কথা কহাও দূষ্য। পতি ও পত্নীর মধ্যে যে ধর্ম্ম সম্বন্ধ আছে তাহা না দেখিয়া লোকে কুৎসিত ভাব গ্রহণ করে এবং তাহারাও পরস্পরকে দেখিয়া লজ্জিত হন ইহা অপেক্ষা আমাদের সমাজের জঘন্যতার পরিচয় আর কি আছে? আমি তোমাকে পূর্ব্বকালের যে সকল সতী রমণীর কথা বলিয়াছি, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া সকলেরই চলা উচিত। স্বামীর সঙ্গে এক হৃদয় হওয়াই সতীর লক্ষণ, স্বামীর সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ বোধ করা, ছায়ার ন্যায় সকল কার্যে, তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হওয়া এবং সখীর ন্যায় তাঁহার হিতকর্ম্ম করা, শাস্ত্রমতে এই ত সতীর প্রধান ধর্ম্ম। যদি স্বামী ও পত্নীর মধ্যে লজ্জা আসিয়া পরস্পরকে পর করিয়া দেয় এবং পাপের ভার সঞ্চার করে তাহা হইলে প্রকৃত দাম্পত্য ধর্ম্ম কোন রূপেই রক্ষা পাইতে পারে না। আজি তোমাকে এই অবধি বলিলাম, পরে আর আর কথা বলিব, আমার ইচ্ছা স্ত্রীলোকেরা এরূপ জঘন্য লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া গৃহে স্বাধীনভাবে আত্মীয়গণের প্রতি যথা কর্ত্তব্য সাধন করুন্। ইহা কি তোমার ইচ্ছা নয়?

স। তুমি যে কথাগুলি বলিলে তাহা অকাট্য এবং তাহার মত যতদিন আমরা চলিতে না পারি ততদিন আমাদের ভণ্ডামী এবং সকল বিষয়েই কষ্ট তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। নম্রতা, বিনয়, সুশীলতা এই সকলই প্রকৃত লজ্জা যে তুমি বলিলে তাহা সত্য এবং তাহা কেবল সাত হাত ঘোমটা দিলেও

হয় না, মুখে গো দিয়া থাকিলেও হয় না। ভাল কার্য্য দ্বারাই ভাল গুণ প্রকাশ পায়।'

বামাবোধিনী পর্ব মিটতে বেলা দুপুর গড়িয়ে গেল। ইতিমধ্যে মেয়েরা অনেকেই উঠে গেছেন। এই কচকচি সবার ভাল লাগে না। দাওয়ার নীচে দাসীরা রাশিকৃত মাছ নিয়ে কুটতে বসেছিল, তাদের কাজও প্রায় শেষ। এবার রসুইঘরে বামুনঠাকুরেরা রান্না চাপাবে। তার আগে সবাই নারকেলের নাড়ু, দইচিড়ে কলা বাতাসার ফলার দিয়ে জলখাবার খাওয়া শুরু করলেন।

কর্ত্তাদের ও ছেলেদের মহলে মহলে পাথরের থালা-বাটিতে জলখাবার পাঠানো হয়ে গেছে। কোনও বাচ্চা খাওয়া নিয়ে গোল করলে দাসীরা চড়থাপ্পড় দিয়ে খাওয়ায়, ও নিয়ে বাড়ির গিন্নিদের খুব একটা মাথাব্যথা নেই। প্রতিটি ছেলেমেয়ে অন্নপ্রাশনে উপহার পায় একসেট জয়পুরি সাদা পাথরের থালা, বাটি, গেলাস। আর দুধের জন্য একটা রুপোর বাটি। দাসীরা সেই বাসনে রান্নাঘর থেকে খাবার এনে বালক বালিকাদের খাওয়ায়। দুধের ঘর আলাদা। সাদা থালা-বাটি ভাঙলে ক্রমে ক্রমে আসে মুঙ্গেরের কালো পাথরের বাসন। কাঁসা-পেতলের বাসনে খায় সরকার, বামুন, ঝি, চাকর। তখনও কাচের বাসন চালু হয়নি।

মালিনী সবার সঙ্গে পাথরের বাটিতে ফলার খেয়ে প্রচুর বই বিক্রি করে বিদায় নেওয়ার আগে ঠিক হল সে পরের হপ্তায় স্বর্ণকুমারীর বাড়িতে যাবে। বলাই বাহুল্য জোড়াসাঁকোর মেয়েরাও সেদিন স্বর্ণর পালঙ্কে আসর জমাবেন। তাঁর সিমলের বাড়ির শোবার ঘরের বিরাট পালঙ্কে প্রায় দুপুরেই জোড়াসাঁকোর বোন, বোনঝি, বউঠানদের নিয়ে আসর বসে। বিকেল হতেই তাসখেলা, গল্পগুজব, আবৃত্তি, কবিতাপাঠের সঙ্গে চলে মুড়ি-ফুলুরি-বেগুনির ঢালাও সরবরাহ। তার সঙ্গে বই-মালিনীর সঙ্গ যোগ হলে তো ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা। একটি আসর শেষ হতে হতেই পরবর্তী আড্ডার সম্ভাবনায় চনমনে হয়ে ওঠে মেয়েরা।

মেয়েমহলের প্রাণসঞ্জীবনী এই আড্ডার ছোট ছোট সুখ-দুঃখের কোনও খবরকেই মহাজ্ঞানী কর্তামশাইরা অবশ্য গুরুত্ব দেন না। তাঁদের অজান্তে ও অবহেলায় ঘরের কোণে কোণে মেয়েমহলে বিতর্কের আলো জ্বালিয়ে আসে বই-মালিনী।

৩

কাদম্বরীর প্রবেশ

'মনে পড়ে সেইদিন, নাটকের 'হিরোইন'
সম্মুখে আয়না ধরি
গবেশ করিতে বন্দী, পাতিছেন নানা ফন্দী
পান খেয়ে ঠোঁট লাল করি।
মরি মরি মরি ॥'

জ্যোতির উৎসাহে জোড়াসাঁকোয় দু'বাড়ির ছেলেরা মেতে উঠেছে স্টেজ বেঁধে 'নবনাটক' অভিনয় করতে। মেয়েদের রোলে পুরুষেরাই অভিনেতা। চন্দ্রলেখার নারীভূমিকায় পুরুষ অমৃতলালের অভিনয় দেখে মজা করে ছড়া বেঁধেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। বলাই বাহুল্য তা নিয়ে নাটকের কলাকুশলীরাই হেসে অস্থির। বহুবিবাহপ্রথার দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে লোকশিক্ষায় এই নাটকটি লিখেছেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। ও-বাড়ির গণেন্দ্র ও এ-বাড়ির জ্যোতিরিন্দ্রর উদ্যোগে বাড়ির ছেলেরা অভিনয় করতে নেমেছে, মেয়েরা চাইলেও তাদের নাটকে অংশ নিতে দেওয়ার সাহস পাননি জ্যোতিরা। অভিজাত বাড়ির আঙিনায় পরিবারের ছেলেরা নাটক করছে— এটাই যথেষ্ট দুঃসাহসের কাজ। এখনও ইতরশ্রেণির যাত্রার সঙ্গে থিয়েটারকে গুলিয়ে ফেলা হয় বাঙালি সমাজে। বাবামশাই ব্যাপারটা কীভাবে নেবেন, কে জানে।

দেবেন্দ্রনাথ অবশ্য খবর পেয়ে খুশি হয়ে ভাইপো গণেনকে চিঠিতে লিখেছেন, 'তোমাদের নাট্যশালার দ্বার উদঘাটিত হইয়াছে— সমবেত বাদ্য দ্বারা অনেকের হৃদয় নৃত্য করিয়াছে— কবিত্ব রসের আস্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। নির্দোষ আমোদ আমাদের দেশের যে

একটি অভাব, তাহা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে।... কিন্তু আমি স্নেহপূর্ব্বক তোমাকে সাবধান করিতেছি যে, এ প্রকার আমোদ যেন দোষে পরিণত না হয়।'

জ্যোতিরিন্দ্র শিল্পসাহিত্যে খুব উৎসাহী, কিছুদিন আর্ট স্কুলে আঁকা শিখেছেন। কবিতা ও নাটক লেখেন। সুপুরুষ জ্যোতি এই নাটকে সুন্দরী নটীর রোল করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন। তাঁর মেয়েলি হাবভাব দেখে লোকে হেসে লুটিয়ে পড়ে।

বাড়ির এক জামাই নীলকমল নট সেজেছেন, আর এক জামাই শরৎকুমারীর বর যদুনাথ সেজেছেন চিত্ততোষ। এই যদুনাথকে নিয়ে দেবেন ঠাকুর খুব ভুগছেন। প্রায়ই তিনি ইয়ারবন্ধুদের বাড়িতে জুটিয়ে এনে মাতলামি করেন। যা কাজের ভার দেওয়া হয় তা কিছুই করেন না, কিন্তু তিনি রসিক এবং নাটুকে ব্যক্তি। তাঁর হালকা স্বভাবের জন্য স্ত্রী শরৎকুমারী প্রথম দিকে স্বামী নামক ব্যক্তিটির গুরুত্ব বুঝতে পারেননি। নাম ধরে 'যদু' 'যদু' বলে ডেকে ফেলে মাঝেমাঝেই সারদাদেবীর কাছে ধমক খেতে হয়েছে তাঁকে।

গবেশ নামক চরিত্রের দুই স্ত্রী, বড় গিন্নির রোলে সৌদামিনীর বর সারদাপ্রসাদ আর ছোটগিন্নি সাজলেন সরকারমশায়ের ছেলে অমৃতলাল। নারীচরিত্রে এঁদের দেখে দর্শকেরা যে কতদূর আমোদিত হচ্ছিলেন দ্বিজেনের কৌতুক ছড়াটি তারই প্রমাণ।

কিছুদিন পরেই যে এই অমৃতলালের বোন কাদম্বরী কর্মচারী পরিবার থেকে জ্যোতির গৃহলক্ষ্মী হয়ে আসবেন সে-কথা তখনও ভাবা হয়নি। জ্যোতির বিয়ের কথা তখন ওঠেওনি। তিনি ব্যস্ত ছিলেন গান, কবিতা, নাটকচর্চা নিয়েই। সত্যেন ও জ্ঞানদাও তাঁকে উৎসাহ দেন এ ব্যাপারে।

একদিন জোড়াসাঁকোর দালানে হইহই করে মুড়ি তেলেভাজা সহযোগে নাটকের মহড়া চলছে, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে একটি কাগজ হাতে জ্যোতি এসে উপস্থিত হলেন, দেখো দেখো, 'সোমপ্রকাশ' আমাদের নাটকের রিভিউতে লিখেছে, 'শনিবার আমরা জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় নবনাটকের অভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। এখানে নাটক অভিনয়ের যে প্রণালী দর্শন করিলাম, তাহা যদি সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়, আমাদিগের বিশুদ্ধ আমোদ ভোগের একটি উৎকৃষ্ট উপায় হইয়া উঠে। নাট্য শালা প্রকৃত রীতিতে নির্ম্মিত ও দ্রষ্টব্যগুলি সুন্দর বিশেষতঃ সূর্য্যাস্ত ও সন্ধ্যার সময় অতিমনোহর

হইয়াছিল। অধিকতর আহ্লাদের বিষয় এ সমুদায়গুলি এতদ্দেশীয় শিল্পজাত। দর্শকদের উপবেশন প্রণালী অদ্যাপিও উৎকৃষ্ট হয় নাই... এককালে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হওয়াতে যাবতীয় দর্শক প্রবেশ করিয়া সকলেই সমুখের আসন গ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন, তাহাতে গোলযোগ, গাত্রঘর্ষণ ও আসনভঙ্গ ইহার ফল হইয়া উঠে।... সকলেরই বেশ প্রায় উত্তম হইয়াছিল, কিন্তু সাবিত্রী না স্ত্রীলোক না হিজড়ে রূপ ধারণ করে।... কোন কোন অংশে কিছু কিছু ত্রুটি থাকুক সাকল্যে বিবেচনা করিলে গ্রন্থ ও অভিনয় উভয়ই উত্তম হইয়াছে।'

সোমপ্রকাশ অতি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা। অনুকূল রিভিউ পেয়ে সকলেই আনন্দে মেতে ওঠেন। ন্যাশনাল পেপারেও ভাল রিভিউ বেরিয়েছে। সমর্থন পেয়ে উৎসাহিত কলাকুশলীরা জোড়াসাঁকো রঙ্গমঞ্চে ঘন ঘন প্রায় ন'বার নবনাটক মঞ্চস্থ করলেন।

ফাল্গুনমাস নাগাদ সত্যেন তাঁর কর্মস্থল আমেদাবাদে ফিরে যাওয়ার সময় জ্যোতিকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন। জ্যোতি না থাকায় কলাকুশলীদের উৎসাহ কমে গেল, নবনাটকও বন্ধ হয়ে গেল।

জ্যোতি এই প্রথম ঠাকুরবাড়ির অভিজাত বনেদিয়ানার বাইরে বেরিয়ে জ্ঞানদার গৃহস্থালির মাঝখানে বিশ্বপৃথিবীর আর একটি সংসার খুঁজে পেলেন। সত্যেন কাজে বেরিয়ে গেলে দু'জনের অখণ্ড অবসর, দু'জনেই অসীম আগ্রহে নতুন নতুন বই পড়েন, গান শোনেন। শেকসপিয়রের নাটক পড়ে উত্তেজিত আলোচনা করেন। সিমবেলাইন নাটকটি জ্যোতিকে এত নাড়া দিল যে তিনি শুরু করে দিলেন বাংলা তর্জমা। কিছুটা এগিয়ে জ্যোতির মনে হল মাছি মারা কেরানির মতো অনুবাদ না করে তিনি এর বঙ্গীকরণ করবেন। জ্ঞানদাকে পড়ে শোনাতে শোনাতে জ্যোতি বললেন, নাটকটির নাম কী দেওয়া যায় মেজোবউঠান?

জ্ঞানদা বললেন, আচ্ছা তোমার নাটকে নায়িকার নাম তো সুশীলা, তার নামেই নাম দাও না। নায়িকার বাবার নামে এখানে নাটক জমবে না।

জ্যোতি ভাবতে থাকেন, সুশীলা নামটি মন্দ নয়, কিন্তু আরও ভাল কী নাম হতে পারে? শেকসপিয়রের নাটকে রাজা সিমবেলাইনের মেয়ে ইমোজেন বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে পসথুমাস নামে এক নিচুশ্রেণির ছেলেকে বিয়ে করে। বাবার পছন্দের পাত্র ক্লোটন নানাভাবে ওদের জুটি ভেঙে ইমোজেনের মন জয় করার চেষ্টা করে। অনেক ষড়যন্ত্র, বিচ্ছেদ, সংকটের মধ্য দিয়ে শেষে

ইমোজেন ও পসথুমাসের মিলন হয়, সিমবেলাইন তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। কিন্তু শেকসপিয়র তাঁর নাটকের নাম ইমোজেন না রেখে সিমবেলাইন কেন রাখলেন?

তাই বলে তুমিও কি নায়িকার বাবার নামে নাম দেবে। বরং নায়কের নামে হোক, জ্ঞানদা বলে ওঠেন। তোমার তো সহজে কোনও কিছু পছন্দ হয় না নতুন ঠাকুরপো।

আচ্ছা মেজোবউঠান, 'সুশীলা-বীরসিংহ নাটক' নামটা কীরকম হবে? জ্যোতি জিজ্ঞেস করেন।

হ্যাঁ, এবার বেশ বীরত্ব আর লালিত্যের মিলমিশ হয়েছে, এটাই ভাল নাম। নাটকের জন্য লোকের আগ্রহ বাড়বে।

আমেদাবাদে থাকতে থাকতেই তরতর করে নাটক এগিয়ে চলে। মার্চ মাস নাগাদ বই হয়েও বেরিয়ে যায়। 'সুশীলা-বীরসিংহ' নাটকের পরতে পরতে মেজোবউঠানের ছোঁয়া অনুভব করেন জ্যোতি, তাঁর উৎসাহ তরুণ নাট্যকারটিকে শস্যশ্যামলা করে তোলে। অবশ্য সত্যেন এই দুই স্বপ্নাতুর নাট্যমোদীকে প্রশ্রয় না দিলে কিছুই এগোত না। আমেদাবাদে সরকারি কাজকর্মের ফাঁকে সত্যেন নিয়মিত চিঠি লিখছিলেন জোড়াসাঁকোর গণেন্দ্রকে, অনেক কিছুর সঙ্গে জ্যোতির নাটকের বই প্রকাশ করার সমস্ত ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় নিয়েছিলেন। এক অর্থে ঠাকুরবাড়ির সবচেয়ে প্রগতিশীল পুরুষ সত্যেন্দ্রনাথ। স্ত্রীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার বিষয়ে যেমন, ভাইদের প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রেও তিনিই ছিলেন অগ্রণী।

আমেদাবাদে এসে জ্যোতির বিকাশে যাতে বাধা না পড়ে সে-ব্যাপারেও সত্যেন সতর্ক। তাঁর মনে হল জ্যোতির মনে আনন্দ আনার জন্য সেতার শেখানো যেতে পারে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। আবার কিছুদিন জ্যোতি ও জ্ঞানদার জন্য মাস্টার রেখে ফরাসি শেখানোর বন্দোবস্ত হল। আমেদাবাদে থাকতে দু'-একটি পারসি ও মরাঠি পরিবারের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেছেন ওঁরা। বোম্বাইতে সত্যেনের পুরনো বন্ধু আত্মারাম পাণ্ডুরঙের বাড়িতে দল বেঁধে যাওয়া হল একবার।

পাণ্ডুরঙের মেয়ে আন্না তড়খড়ের জন্মদিন উপলক্ষে সেদিন তাঁদের বাড়িতে বিরাট পার্টি। জ্যোতিকে সেই পার্টিতে ছেড়ে দিয়ে মজা দেখছিলেন জ্ঞানদা। সাহেবমেমরা তো আছেনই, তার সঙ্গে আছেন কিছু অভিজাত

ভারতীয় পরিবার। পারসি ও মরাঠি সে-সব মেয়েরা কী ঝকঝকে, সপ্রতিভ! বাঙালি নারীসুলভ লজ্জায় জড়সড় নয় একেবারেই। যার জন্মদিন সেই আন্নার রূপে ও স্মার্টনেসে সবাই মুগ্ধ। চটপটে চৌখস মেধাবিনী মেয়েটি বয়সে বালিকা কিন্তু হাবভাবে সাজসজ্জায় যেন রাইকিশোরী। আশেপাশে অনেক প্রীতিপ্রার্থী কিশোর ঘুরঘুর করলেও নবাগত জ্যোতিকেই তাঁর পছন্দ হল।

আন্না এগিয়ে এসে জ্যোতির দিকে হ্যান্ডশেকের ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তুমি মি. ঠাকুর জুনিয়র? আমার নাম আন্না।

জ্যোতি হাত মেলালেও আন্নার সহজ হাবভাবে একটু অবাক হন। তার সপ্রতিভ আচরণে মুগ্ধ হলেও মনে মনে বাঙালি মেয়েদের সঙ্গে তুলনা করতে থাকেন। জ্যোতির তরুণ হৃদয় যেন লাজুক বাঙালি কন্যাদের দিকেই ঝুঁকে আছে।

জ্যোতি আন্নার হাতের লাল পানীয়র গ্লাসের দিকে তাকিয়ে জানতে চান, তুমি কী পানীয় নিয়েছ?

আন্না কটাক্ষ করে বলেন, কেন, রেড ওয়াইন। তুমি চেনো না? তোমার হাত খালি কেন, চলো একটা ড্রিঙ্ক নাও।

ঠাকুরবংশে সবরকম নেশাই চলে কিন্তু দেবেন ঠাকুরের ছেলেরা শুদ্ধ জীবনযাপনে বিশ্বাসী, মদে নয় তারা কাব্যপাঠের নেশায় মাতাল। জ্যোতির দ্বিধা দূর থেকে লক্ষ করে এগিয়ে আসেন জ্ঞানদা, জ্যোতির হাত ধরে বলেন, সত্যি তো পার্টিতে এসে ড্রিঙ্ক নিচ্ছ না কেন নতুন, আন্না তো ঠিকই বলছে, চলো। তাঁকে টেনে সেলারের দিকে নিয়ে যান জ্ঞানদা।

আন্নাও সঙ্গে সঙ্গে আসেন। স্কচ নেবে, না ওয়াইন? জিজ্ঞেস করেন জ্যোতিকে। জ্ঞানদার দিকে প্রশ্নাকুল চোখে তাকান জ্যোতিরিন্দ্র, তুমি বলো মেজোবউঠান কী নেব?

স্কচ, জ্ঞানদা বলেন।

আন্না তাঁকে বাধা দিয়ে বলেন, মি. ঠাকুর জুনিয়র, তুমি প্রথমবার খাচ্ছ তো রেড ওয়াইন টেস্ট করো। আমার মতো।

এই সময় ড্রিঙ্ক নিতে এলেন মি. জন ম্যাকগ্রেগর, সত্যেনের বন্ধু। জ্ঞানদার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বলেন, ওঃ লুক! হাউ বিউটিফুল ইউ আর লুকিং টুনাইট!

লজ্জায় লাল হয়ে জ্ঞানদা বলেন, মি. ম্যাকগ্রেগর, প্লিজ ডোন্ট মেক মি এমব্যারাসড। দেয়ার আর সো মেনি বিউটিজ অ্যারাউন্ড।

মিসেস টেগোর, টুমি সবার থেকে সুন্দর। টোমার ড্রেস সুন্দর, টোমার বডি সুন্দর, টোমার কথা সুন্দর। ইউ আর দি এপিটোম অফ ইন্ডিয়ান বিউটি! চলো ডান্স করি। টুমি আমার পার্টনার হবে প্লিইইইইজ। ম্যাক কাতর অনুনয় করেন জ্ঞানদার হাত ধরে।

জ্যোতি প্রথমে অবাক হচ্ছিলেন পরে তাঁর রাগ হতে থাকে। ঠাকুরবাড়ির বউয়ের হাত ধরে একজন উটকো সাহেব কেন টানাটানি করবে? মেজদাদা দূর থেকে দেখলেও যেন দেখছেন না। হাসছেন, যেন খুব মজার কিছু ঘটছে। তিনি জোর করে জ্ঞানদার হাতে ধরা ম্যাকের হাত ছাড়িয়ে দেন। রাগতস্বরে বলেন, ডোন্ট ডিসটার্ব হার, লিভ হার অ্যালোন।

হাউ ডেয়ার ইউ? ম্যাক জ্যোতিকে চেনেন না, তেড়ে যান তার দিকে। জ্ঞানদার দিকে তাকিয়ে বলেন, লুক লেডি, ইফ ইউ ডোন্ট লাইক মি প্লিজ টেল মি ডিরেক্টলি, বাট কনট্রোল ইয়োর বডিগার্ড।

পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে সত্যেন এগিয়ে আসেন, জ্যোতিকে জড়িয়ে ধরে বলেন, ম্যাক, হোয়াই আর ইউ সো টেনস? মাই ইয়াং ব্রাদার ইজ আ বিট পজেসিভ আবাউট হিজ বৌঠান। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।

উত্তেজিত জ্যোতিকে টেনে সরিয়ে এনে সত্যেন বললেন, ম্যাক যদি জ্ঞানদার সঙ্গে ডান্স করতে চায় তাতে কী মহাভারত অশুদ্ধ হল? নারীপুরুষ একসঙ্গে নাচা তো বিলিতি কালচারের পার্ট, জ্ঞানদা এখনও সহজ হতে পারছে না কিন্তু হয়ে যাবে। তোকেও শিখতে হবে। এজন্যই তো এ-সব পার্টিতে আসা। তুই কেন কুয়োর ব্যাঙের মতো আচরণ করছিস?

জ্যোতি ক্ষুব্ধ মনে অন্যদিকে সরে যান। বিলিতি কালচারের সবকিছুই আমাদের নকল করতে হবে কেন? মেজোবউঠানের ইচ্ছে না হলেও ওই সাহেবটার সঙ্গে নাচতে বাধ্য করবেন মেজদাদা?

গৃহস্বামী পাণ্ডুরং ম্যাকগ্রেগরের সঙ্গে রঙ্গতামাশা করে হালকা করে দিতে চান ব্যাপারটা। হলঘরের কোনায় রাখা সোফায় আন্না, জ্ঞানদা ও ম্যাকগ্রেগরকে নিয়ে আড্ডা দিতে বসেন। শ্রীমতী পাণ্ডুরং অচিরেই তাঁদের দলে যোগ দিলেন। আজ তিনি কী সুন্দর পাথর বসানো কাশ্মীরি সিল্ক পরেছেন, গলায় সাতনরি মুক্তোর হার। প্রতিবারের মতো এদিনও তাঁকে দেখে চমৎকৃত হন জ্ঞানদা। রুচি ও সম্পদের কী আশ্চর্য মিলন।

প্রথমবার বোম্বাই এসে এঁদের আতিথ্যেই ছিলেন জ্ঞানদা। এই মরাঠি পরিবারের

মেয়েদের সাজগোজ, শাড়ি পরার ধরন জ্ঞানদাকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল। এখানেই তাঁর আধুনিকতার পাঠশালা। পাণ্ডুরঙের স্ত্রী শিক্ষিত কেতাদুরস্ত মহিলা, সাহেবমেম নারীপুরুষ সবার সঙ্গেই মেলামেশায় স্বচ্ছন্দ। ওঁদের তিন মেয়ে আন্না দুর্গা ও মানিক, ইংরেজি কেতায় বড় হচ্ছে। বোম্বাই অঞ্চলে সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে এই পরিবার খুবই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। শ্রীমতী পাণ্ডুরঙের বাড়িতে দুঃসাহসী সমাজ সংস্কারক পণ্ডিতা রমাবাইয়েরও নিয়মিত যাতায়াত।

এঁদের সান্নিধ্যে জ্ঞানদা সবসময়েই উজ্জীবিত হন। কিন্তু এখন ওঁদের সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যেও তাঁর দুর্ভাবনা হচ্ছে। জ্যোতিটা বোকা, কেন যে এত মাথা গরম করে ফেলল! সত্যেন পরে নিশ্চয় জ্ঞানদাকেই বকবেন।

এভাবেই ঠাকুরবাড়ির বৃহৎ সংসারের বাইরে শিল্প সংস্কৃতি আত্মীয়তার একটি অন্তরঙ্গ ত্রিকোণ রচিত হচ্ছে সতেরো বছরের জ্ঞানদা, আঠারোর জ্যোতিরিন্দ্র আর তাঁদের অভিভাবক সত্যেনের মধ্যে। আমেদাবাদে আরও কিছুদিন ইংরেজি সাহিত্য চর্চার পর জ্ঞানদার আগ্রহ জাগল সংস্কৃত কাব্যের প্রতি। ঠাকুরবাড়ির পাঠশালায় বাংলা ইংরেজি অনেক পড়া হলেও জ্যোতির সংস্কৃত পড়া হয়নি। জ্ঞানদার উৎসাহেই সংস্কৃত কাব্য ও নাটকপাঠ শুরু করলেন জ্যোতি। প্রতিদিন সন্ধেবেলা সত্যেন ঘরে ফিরলে শুরু হয় তিনজনের আসর। কখনও জ্যোতি কখনও সত্যেন অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ পাঠ করেন। পড়তে পড়তে শকুন্তলার অনুবাদ করতে ইচ্ছে হয় জ্যোতির।

এ-সবের মধ্যেই বাতের ব্যথায় একটু অসুস্থ হয়ে পড়লেন সত্যেন। একদিন বললেন, ব্যথাটা বাড়ছে, ভাবছি চিকিৎসার জন্য ছুটি নিয়ে কলকাতায় যাই একবার।

জ্ঞানদা উদ্বিগ্ন হন, পায়ের ব্যথা নিয়ে পনেরোদিন স্টিমারে থাকতে পারবে, কষ্ট হবে না?

সত্যেন হাসতে থাকেন, শোনো এবার আর অনেকদিন ধরে স্টিমারে যেতে হবে না। ১১ই অক্টোবর ১৮৬৭ বোম্বাই-কলকাতা রেলপথ খুলে গেছে। মাত্র পাঁচদিনেই পৌঁছে যাওয়া যাবে বোম্বাই থেকে কলকাতা।

রেল চালু হওয়ায় চারিদিকে মহা উৎসাহ হইচই। জ্ঞানদা আর জ্যোতিও উত্তেজিত নতুন অভিজ্ঞতার সম্ভাবনায়। তাঁদের উৎসাহের জোয়ারে ভেসে দু'-এক দিনের মধ্যেই তিনটে রেলের টিকিট বুক করে ফেললেন সত্যেন। জ্ঞানদা ও জ্যোতিরিন্দ্রকে নিয়ে ফিরে এলেন জোড়াসাঁকোয়।

জোড়াসাঁকো কি পালটে গেল? নাকি ইতিমধ্যে স্বাধীনভাবে থাকতে অভ্যস্ত জ্ঞানদারই এ-বাড়িতে মানিয়ে নিতে অসুবিধে হচ্ছে! তাঁর স্বাধীন চলাফেরায় যেন প্রতিমুহূর্তে বেড়ি পরিয়ে দিতে চাইছে নানা অনুশাসন। সারদার সঙ্গেও খটাখটি লাগছে বারবার। তার ফলে সত্যেনের চিকিৎসাও ব্যাহত হচ্ছে, ঠিকমতো বিশ্রাম হচ্ছে না।

দেবেন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে এক মাসের জন্য আলাদা বাগান-বাড়ি ভাড়া করে স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেলেন সত্যেন। নিজের চিকিৎসার জন্যও এই নিরিবিলি পছন্দ হল তাঁর। জ্যোতিও তাঁদের সঙ্গে এসে জড়ো হলেন। আমেদাবাদ ছাড়ার পর তিনজনের সাহিত্যবাসর যেখানে থেমে গেছিল আবার সেখান থেকেই যেন শুরু হয়ে গেল।

ঠাকুরবাড়িতেও সংস্কৃতি চর্চা থেমে নেই। নীপময়ী গান ও পড়াশোনার পাশাপাশি বাঁয়া তবলা, খোলকরতাল বাজানো শেখা শুরু করেছেন বেণীমাধববাবুর কাছে। হেমেন তাঁকে নিয়ম করে মিলটনের মহাকাব্য 'প্যারাডাইস লস্ট' পড়াচ্ছেন। এর আগে পড়িয়েছেন কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' কাব্য। এমনকী দেশি ও বিদেশি শিক্ষকের কাছে ছবি আঁকাতেও হাত পাকাতে চেষ্টা করছেন হেমেনের আদরের পত্নী।

ওদিকে মেয়ে-বউদের পড়ানোর জন্য মেমশিক্ষিকারা আসছেন অন্তঃপুরে। কন্যা সৌদামিনীকে বেথুন স্কুলে পাঠিয়েছিলেন মহর্ষি, কিন্তু তারপরে আর কোনও মেয়ে-বউ স্কুলে যাননি। বাড়িতেই তাঁদের পড়াশোনার ওপর খুবই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। জ্ঞানদা নিজেও সবুরান বিবির কাছে দীর্ঘদিন ইংরেজি শিখেছেন। শরৎকুমারীর অবশ্য রূপচর্চা ও রান্নার দিকে আগ্রহ বেশি। প্রতিদিন যত্ন করে ঘষে ঘষে সর-ময়দার রূপটান মেখে স্নান করেন তিনি। মাঝে মাঝে গায়ে মালিশ করেন স্বামীর বিলিতি মদের সঙ্গে ইতালিয়ান অলিভ অয়েলের মিশ্রণ। তাঁর স্বামী যদুনাথের কাছে একবার ইয়ারবন্ধুরা ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের গায়ের রং জানতে চাইলে যদু রহস্য করে বলেছিলেন, সে রং 'দুধে আর মদে'। পড়াশোনার পাশাপাশি চলত অন্যান্য শিক্ষা। রান্না, সেলাই, সেবা, শিশুপালন সবই নিয়মিত অনুশীলনের বিষয় বলে মানতেন অন্তঃপুরিকারা।

এই সুগৃহিণীপনার পাঠশালায় একেবারেই অনুপস্থিত থাকেন একমাত্র স্বর্ণকুমারী। তাঁর এ-সব ভাল লাগে না। বিয়ের আগেও যেমন, পরেও তিনি

ঘর বন্ধ করে সাহিত্যচর্চায় ব্যস্ত রেখেছেন নিজেকে। মগ্ন হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়েন আর স্বপ্ন দেখেন তিনিই হবেন বাংলার প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক। মাঝে মাঝে মালিনী এসে তাঁর স্বপ্নকে উসকে দিয়ে যায় ইদানীং।

ইতিমধ্যে ঠাকুরবাড়িতে আরেকটি বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। নীপময়ীর বোন প্রফুল্লময়ী এসেছিল দিদির সঙ্গে দেখা করতে। তাকে দেখে খুব পছন্দ হয়ে গেল শরৎকুমারী ও স্বর্ণকুমারীর। তাঁরা ভাই বীরেনের সঙ্গে বিয়ের উদ্যোগ নিলেন। বালিকাকে সাজিয়ে গুজিয়ে বীরেনের সামনে টেনে আনতে গেলে সে লজ্জায় পালিয়ে গেল। বন্ধু হরদেবের আর একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর আর একটি ছেলের বিবাহ প্রস্তাব, দেবেন ঠাকুর খুশি হয়েই সম্মতি দিলেন। গা ভরতি গয়না ঝমঝমিয়ে বালিকাবধূ ঢুকলেন ঠাকুরদের প্রাসাদে। কিন্তু তাঁর বর বীরেন্দ্রর হাবভাবে একটু পাগলামির ছাপ। মহর্ষি ভেবেছিলেন বিয়ে দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

এরপরেই ঠাকুরবাড়িতে শুরু হল জ্যোতির বিয়ের তোড়জোড়। কিন্তু সত্যেন ও জ্ঞানদার তাতে মত নেই। সত্যেন দেবেন্দ্রনাথকে বললেন, বাবামশায়, এত তাড়াতাড়ি জ্যোতির বিয়ের কথা কেন ভাবছেন? ওর বয়স এখনও উনিশ হয়নি। আমার ভাইদের মধ্যে ও সবচেয়ে প্রতিভাধর। ওকে যে আমি বিলেত পাঠিয়ে উচ্চশিক্ষা দিয়ে মেজেঘষে আনব ভাবছিলাম।

দেবেন ঠাকুর কিন্তু এখনই জ্যোতির বিবাহ দিতে চান। কতদিন আর মেজদা মেজোবউঠানের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াবে সে! বিবাহ না দিলে ছেলেরা দায়িত্বশীল হয় না। পরিবারে আশ্রিত কর্মচারী শ্যাম গাঙ্গুলির সেজোমেয়ের সঙ্গে জ্যোতির বিয়ের কথা উঠেছে। আট বছরের বালিকা মেয়েটি নিরক্ষর হলেও সুন্দরী। চেনাশোনার মধ্যেই এমন মেয়ে যখন পাওয়া গেছে, বিয়ে লাগিয়ে দিলেই হয়।

জ্ঞানদার একেবারেই পছন্দ নয় এই বয়সে দেবরের বিয়ের প্রস্তাব। এখন তার তৈরি হওয়ার সময়। জ্যোতি লিখবেন একের পর এক নাটক কবিতা প্রবন্ধ, জ্ঞানদা হবেন তার প্রেরণাদাত্রী আর পৃষ্ঠপোষক সত্যেন। এমন একটা জীবনের পরিকল্পনাই তো তাঁরা আমেদাবাদে বসে করেছিলেন। আর বিয়ে যদি করতেই হয়, জ্যোতির বউ হবে ইংরেজি শিক্ষিত, বিলেত ফেরত, কেতাদুরস্ত। জ্ঞানদা এমনই এক পাত্রী দেখে রেখেছেন জ্যোতির

জন্য। সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তীর বিলেত ফেরত মেয়ে, ইংরেজি শিক্ষিত, শ্যামলা রং কিন্তু মুখশ্রী সুন্দর। মেয়েটি সেসময় কলকাতায় এসেছিল। তাকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একদিন নেমন্তন্ন করে আনালেন জ্ঞানদা। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ এই সম্বন্ধে সম্মতি দিলেন না। সত্যেনের বউ শিক্ষিত কেতাদুরস্ত হয়ে ইস্তক বড্ড স্বাধীনচেতা হয়ে উঠেছে, বাড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে চায় না। এজন্য দেবেন্দ্র কিছুটা বিরক্ত। তিনি জ্ঞানদার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে শ্যাম গাঙ্গুলির মেয়ের সঙ্গেই কথা পাকা করতে নির্দেশ দিলেন।

সত্যেন আহমেদনগর থেকে জ্ঞানদাকে লিখলেন, 'আমি যদি নতুন হইতাম, তবে কখনই এ বিবাহে সম্মত হইত... [হইতাম] না। কোন্ হিসাবে যে এ কন্যা নতুনের উপযুক্ত হইয়াছে জানি না।'

'...আমি বলি নতুন যদি ইংলণ্ডে যাইবার সঙ্কল্প করেন তবে বিবাহ না করিয়া যাওয়াই ভাল।... আমার ভাগ্যে এমন স্ত্রী হইয়াছে, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে এমন 'স্ত্রীরত্ন' দুর্লভ।... জ্যোতি না দেখিয়া শুনিয়া একজনকে বিবাহ করিয়া ইংলণ্ডে ৪।৫ বৎসরের জন্য চলিয়া যাক্— সেখানকার সমাজে সঞ্চরণ করিয়া ও সুশিক্ষিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া এক অপরিচিত, হয়ত অশিক্ষিত স্ত্রী কি তাঁহার মনোনীত হইবে? দেখ যতজন বিলাতে গিয়াছে প্রায় সকলেরই ওই প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে... আমাদের কথা স্বতন্ত্র।'

মহর্ষি অবশ্য সত্যেনের আশঙ্কাকে গুরুত্ব দিলেন না। সত্যেনের স্ত্রীকে যশোরের কোন অজগ্রাম থেকে আনা হয়েছিল? ঠাকুর পরিবারের বেশিরভাগ বউকেই প্রত্যন্ত পাড়াগাঁ থেকে বেছে আনা হয়েছে, তারপর মেজে ঘষে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে তাঁরাই হয়ে উঠেছেন বাংলার আদর্শ নারী। শ্যাম গাঙ্গুলির মেয়েটিকে তিনি কয়েকবার দেখেছেন, বেশ সুলক্ষণা। সত্যেনকে তিনি চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন, 'জ্যোতির বিবাহের জন্য একটি কন্যা পাওয়া গিয়াছে এইই ভাগ্য। একেত পিরালী বলিয়া ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা আমাদের সঙ্গে বিবাহেতে যোগ দিতে চাহে না, তাহাতে আবার ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান জন্য পিরালীরা আমাদিগকে ভয় করে। ভবিষ্যৎ তোমাদের হস্তে— তোমাদের সময় এ সঙ্কীর্ণতা থাকিবে না।'

হতাশ সত্যেন্দ্র স্ত্রীকে লিখে পাঠালেন, 'তবে নতুনের বিবাহের ধূম লাগিয়া গিয়াছে। হিতেন্দ্র ও নীতিন্দ্রের ভাত, তোমরা বেশ আমোদে আছ। নতুনের বিবাহ দেখিবার তোমার যে এত সাধ ছিল, তাহা পূর্ণ হইল। শ্যামবাবুর

মেয়ে মনে করিয়া আমার কখনই মনে হয় না যে ভাল মেয়ে হইবে—কোন অংশেই জ্যোতির উপযুক্ত তাহাকে মনে হয় না। জ্যোতি এই বিবাহে কেমন করিয়া সম্মত হইল, এই আমার আশ্চর্য্য মনে হইতেছে।' কিন্তু সত্যেন জ্ঞানদার অপছন্দে বিয়ে আটকে থাকল না।

২৩ আষাঢ়ের শুভলগ্নে সিঁদুরে রঙের চেলি ও গা-ভরতি জড়োয়া গয়না পরে কাদম্বরী ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশ করলেন। সাজের কী বাহার! গলায় চিক ও ঝিলদানা হার, হাতে চুড়ি, জড়োয়া কঙ্কণ ও বাজুবন্দ, কানে বীরবৌলি ও কানবালা, পায়ে নূপুর ও চুটকি, কোমরে চাবি ও গোট, মাথায় জড়োয়া সিঁথি ও টিকলি। এ-বাড়ির রীতি অনুযায়ী অধিকাংশ গয়নাই দেবেন্দ্র যৌতুক হিসেবে দিয়েছেন। জ্যোতির বয়স উনিশ, কাদম্বরীর নয় বছর। জ্ঞানদার আশঙ্কা ছিল অশিক্ষিত বালিকাকে পছন্দ হবে না জ্যোতির। সে ভয় মিথ্যে করে নববধূকে দেখে জ্যোতিরিন্দ্রের রোমান্টিক মন দুলে উঠল। এই শ্যামল বালিকাকে তিনি নিজের মতো করে গড়েপিটে নেবেন। মেজোবউঠান যশোর থেকে এসে যদি আভিজাত্যের শিরোমণি হতে পারেন, নতুনবউও নিশ্চয় পারবে। আর নববধূকে দেখে তার চেয়ে দু'বছরের ছোট দেওর রবির মনে হল রূপকথার রাজকন্যে এসেছেন বাড়িতে। কী যেন অজানা পুলকে শিউরে ওঠে বালকের মন।

বিয়ের সময় দেবেন্দ্র হিমালয়ে ছিলেন বলে সব দায়দায়িত্ব দিয়েছেন ভাইপো গণেন্দ্রকে। সত্যেন বা হেমেনকে এই দায়িত্ব না দেওয়ার একটা কারণ নিশ্চয় এ-বিয়ে সম্বন্ধে তাদের বিরূপ মনোভাব। বালক বালিকাদের জন্য নতুন জামাকাপড়, ঘটক বিদায়, কুলীন বিদায়, অধ্যাপক বিদায় সবকিছু সামলাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন গণেন্দ্র। বিলিতি দোকানের জুতো কেনা হল। বিয়েতে গরিবদের জন্য ঢালাও ভোজের ব্যবস্থা নির্দেশ করলেন মহর্ষি। এবার অবশ্য ব্রাহ্মবিয়েতে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের উপস্থিতি দেখা গেল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সে-খবরটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার নির্দেশ দিলেন দেবেন্দ্রনাথ।

আনন্দর পাশাপাশি একটি বেদনার সূত্রপাত হচ্ছিল ঠাকুরবাড়িতে। বীরেনের মাথার দোষ বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছল। তাঁকে পারিবারিক আয়ব্যয়ের হিসেব রাখার ভার দিয়েছিলেন বাবামশায়, কিন্তু সে-কাজে গাফিলতি হতে থাকল। ক্রমে তিনি খাওয়া ছেড়ে দিলেন। তাঁর নিরাময়ের আশায় বোলপুরে নিয়ে

গেলেন স্ত্রী প্রফুল্লময়ী। নীপময়ী, ব্রজসুন্দরী, কাদম্বরীরাও তাঁদের সঙ্গী হলেন। কিন্তু সেখানে গিয়েও তাঁর খাওয়াদাওয়ার কোনও উন্নতি হল না। এক চামচ ভাত আর একটি পটলপোড়া খেয়েই থালা সরিয়ে দিতেন এক-একদিন। কলকাতা ফিরে এসে সাহেব ডাক্তার দেখিয়েও অসুখ সারল না।

এইসময় থেকেই রবির কবিতা নিয়ে আঁকিবুকি শুরু। সুযোগ পেলে পাঠ্যবইয়ের কবিতা মুখস্থ শুনিয়ে মাকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করতে লাগলেন বালক। ভেতরমহলে ছলছুতোয় মায়ের কাছে গেলে কিশোরী নতুনবউঠানের সঙ্গেও মাঝে মাঝেই দেখা হয়ে যায় সমবয়সি দেওরটির। চোখে চোখে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে যেন। বুক কেঁপে ওঠে অজানা রোমাঞ্চে আর রবির গোপন খাতা ভরে ওঠে কবিতায় কবিতায়। নতুনবউঠানের ঘরের কাচের আলমারিতে বিচিত্র চিনেমাটির খেলনার ঝলক চোখে পড়ে। ওই রহস্যময়ীর সঙ্গে গল্প করতে বড় ইচ্ছে করে রবির। কিন্তু কথা বলতে গেলেই বর্ণদিদি কেন যে তেড়ে আসে! মেয়েদের সৌভাগ্যকে একটু ঈর্ষাও হয়, আজকাল একসঙ্গে গুরুমশায়ের কাছে পাঠ নিতে বসেন তাঁরা। কিন্তু পড়া শেষ হলে রবি, সোম ও সত্যকে যখন ইস্কুলের কয়েদখানায় পাঠানো হয়, বর্ণ বেণী দুলিয়ে এবং নতুনবউঠান ঘোমটা টেনে অন্দরের স্বর্গরাজ্যে চলে যান। এই মনের দুঃখ কাকেই বা জানাবেন রবি!

নতুনবউকে মেজেঘষে তোলার দায়িত্ব পেলেন নীপময়ী। তাঁর বাপের বাড়ির নাম মাতঙ্গিনী পালটে দিয়ে বিয়ের পরে ডাকা হচ্ছে কাদম্বরী বলে। নীপময়ী এবার তার জন্য বর্ণপরিচয় ও ধারাপাত কিনে আনালেন। পড়াশোনায় বেশ মেধার পরিচয় দিচ্ছেন নতুনবউ। আবার ঘরের কাজের শিক্ষাও চলছে পুরোদমে।

রবি, সোম ও সত্যের উপনয়নে কাদম্বরী ওদের অনেকটা কাছাকাছি এসে পড়লেন। এই তিন বালকের বড় হওয়ার সময় হল। ব্রাহ্ম হলেও পইতে ধারণের সময় মাথা ন্যাড়া করে, কানে সোনার বীরবৌলি পরে, হাতে বিল্বদণ্ড নিয়ে গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন তাঁরা। ভিক্ষাপাত্র নিয়ে মা, বাবামশায় ও গুরুজনদের কাছে ভিক্ষা নিয়ে আচার্য আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশকে দান করা হল। সারাদিন উপোস করে সন্ধ্যায় গায়ত্রীমন্ত্র জপের পর যখন নতুনবউঠানের রেঁধে দেওয়া হবিষ্যান্ন মুখে দিলেন, রবির মনে হল অমৃত খাচ্ছেন। প্রথমবার বাড়ির অন্তঃপুরিকার হাতের রান্না খেয়ে স্বাদেগন্ধে মুগ্ধ বালকদের মন

কাদম্বরীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। সমবয়সি কাদম্বরীকে যেন বালকদের চেয়ে অনেক পরিণত মনে হয়। অন্তঃপুরের শিক্ষায় এবং সপ্রতিভতায় তিনি শুধু বালকদেরই নয়, ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরিকাদেরও মন জয় করে নিচ্ছেন। নবীন ব্রহ্মচারীদের তিনদিনের হবিষ্যি রান্নার ভার কাঁধে তুলে নিলেন তিনি।

রূপা এখন সারদার খুব নেওটা হয়েছে। রোজ দুপুরে এসে হাত-পা টিপে দেয়, পাকা চুল তুলে দেয় আর পুটুর পুটুর করে আবোল-তাবোল বকে যায়। ওর নরম আঙুলের ছোঁয়ায় বেশ ঘুম জড়িয়ে আসে সারদার চোখে।

একদিন বললেন, রূপা, তুই কি এমন মুখ্যু হয়ে থাকবি? দাঁড়া তোকে লেখাপড়া শিখতে পাঠাব বৈঠকখানায়। বর্ণদিদি, রবিদাদা, নতুন বউঠানের সঙ্গে বসে বসে পড়া শিখবি মাস্টারমশায়ের কাছে।

রূপা আনন্দে নেচে ওঠে কত্তামায়ের কথা শুনে। তাঁর পায়ে হাত দিয়ে বলে, তোমাকে কত্তামা ডাকতে আমার ভাল লাগে না। বন্নোদিদির মতো মা বলে ডাকলে তুমি কি রাগ করবে?

এই অনাথা বালিকার সঙ্গে কী এক অদ্ভুত মায়ায় জড়িয়ে পড়েছেন সারদা, ভাবলে নিজেরই আশ্চর্য লাগে। রূপা তাঁর যত কাছে এসে গেছে, নিজের গর্ভের সন্তানদের কোনওদিন তত কাছে ঘেঁষতে দেননি। ছোট থেকে বুকের দুধ না-দেওয়ায় বাচ্চাদের সঙ্গে কোনও শরীরী বন্ধন গড়ে ওঠেনি। এই মেয়েটি যখন গায়ে হাত দিয়ে সেবা করে, তা ঠিক যেন দাসীর মতো নয়, বরং কন্যার মতো। আবার মুশকিল হচ্ছে এর হাবভাবে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের ঘষামাজা নেই, গ্রাম্যটানের বুলিতে বারবার মনে করিয়ে দেয় ও আলাদা। সারদা ঠিক করলেন ওর গায়ে ঠাকুরবাড়ির আলোর ছোঁয়া লাগিয়ে দেখবেন কী হয়।

শোন, আজ থেকে তোর নাম দিলাম রূপকুমারী। আমার সুকুমারী, শরৎকুমারী, স্বর্ণকুমারী, বর্ণকুমারীদের পাশে বেশ মানাবে। কেউ জিজ্ঞেস করলে এই নাম বলবি, মাস্টারমশায়কেও।

কিন্তু সবাই যে রূপা বলেই ডাকবে? বালিকা খুশিতে অধীর হয়ে জানতে চায়।

সে ডাকুক না, রূপকুমারীর ডাকনাম তো রূপা হতেই পারে। সারদা আশ্বস্ত করলেন পুস্যিকন্যাকে। স্বর্ণ বর্ণ তো ওকে এখনই মজা করে 'মায়ের পুষ্যি' বলে।

কিন্তু তোর দস্যিপনা আর চলবে না। আমার পুষ্যি হয়ে থাকতে হলে আমার মেয়েদের মতো ভদ্রসভ্য শিক্ষিত হতে হবে। ঘরের কাজ, রান্নাবান্না শিখতে হবে, উড়ে উড়ে বেড়ানো বন্ধ।

রূপাকে স্নেহ করলেও সারদা জানেন ওর মধ্যে একটা অবাধ্য ঘোড়ার মতো বুনো স্বভাব আছে, আদর নেবে কিন্তু সহজে পোষ মানবে না। ছোট থেকে কুটুম মহলে থেকে থেকে সংসারের কল্যাণকর নিয়মগুলো কিছুই শেখেনি।

রূপার ঝুঁটি ধরে নেড়ে আবার বলেন সারদা, বুঝেছিস, তোকে ভাল মেয়ে হতে হবে!

ভাল মেয়েরা কী করে মা? রূপার প্রশ্নটি সারল্য না দুষ্টুমি ঠিক বুঝতে পারেন না সারদাসুন্দরী। এ মেয়েটা একটু অন্যরকম, মনে মনে তাঁরও জেদ চাপে, বেতো ঘোড়াকে সোজা করবেনই, তবে তাঁর নাম সারদাসুন্দরী।

ভাল মেয়েরা স্বর্ণ বর্ণর মতো, নতুন বউয়ের মতো মায়ের কথা শুনে চলে। সব কাজ ধীরে ধীরে করে! সবাইকে সেবা যত্ন করতে শেখে আবার লেখাপড়াও শেখে। যাকে বলে, রূপে লক্ষ্মী আর গুণে সরস্বতী। শুনিসনি, 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'?

রূপার বয়স একটু বেড়েছে, সারদার প্রশ্রয়ে সাহসও বেড়েছে। সে বলে, তা কেন হবে মা। মেয়েরাই শুধু খেটে মরবে কেন? কেন ঘরে বন্দি হয়ে থাকবে? আমার তো ইচ্ছে করে ডানা মেলে পাখির মতো উড়ে যাই। বেটাছেলেদের গায়ে যেন ডানা লাগানো আছে আর আমরা বিটিরা সব ডানাছেঁড়া।

সারদা ভাবেন, তাঁর পেটের মেয়ে হলে এ-কথা বলত না কখনও। বলেন, দাঁড়া, তোকে কী করে শিক্ষে দিতে হয় আমি দেখছি।

পরের দিন থেকেই পুরোদমে শুরু হয়ে গেল রূপা থেকে রূপকুমারী হয়ে ওঠার ক্লাস, শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি তৈরি করেই ছাড়বেন সারদা।

বর্ণকুমারী কিন্তু সহজে মেনে নিতে পারেন না মায়ের পুষ্যিটিকে। সে বেশ মায়ের পাশ ঘেঁষে ঘেঁষে বসছে রোজ দুপুরে, আবার পাঠশালায় একসঙ্গে পড়া শিখতে আসছে। বিরক্ত বর্ণ ফিসফিস করে রবিকে বলেন, দেখ মেয়েটা কেমন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।

রবির এ-সব নিয়ে অত মাথাব্যথা নেই। তাঁর দুশ্চিন্তা যে পড়া শেষ

হলেই ইস্কুলে যেতে হবে। ও জায়গাটা তাঁর মোটেই পছন্দ নয়। বর্ণদিদির আর চিন্তা কী? তিনি তো পড়ার পর অন্দরমহলের আরামে ঢুকে পড়বেন। নতুনবউঠানের সঙ্গে গল্পের লোভে রবি দু'-একদিন ওদের পিছু পিছু ঢুকতে চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু নিষ্ঠুর বর্ণদিদির তাড়নায় ফিরে আসতে হয়েছে চাকরমহলে। সুতরাং রবি ঠিক করে নেন, তিনি কিছুতেই বর্ণদিদির পক্ষ নেবেন না। বরং রূপার সঙ্গে বন্ধু পাতানো যায় কারণ সে মায়ের কোলঘেঁষা। আহা রূপার মতো ভাগ্যও যদি তাঁর হত!

রবি বললেন, ও তো পড়া শিখতে এসেছে, তুমি অমন করছ কেন? মা পাঠিয়েছেন বলেই তো এসেছে। আর তুমি পারলে সবাই পড়তে পারে।

রূপা বোঝে তাকে সহজে কেউ জায়গা ছেড়ে দেবে না, লড়ে জায়গা নিতে হবে। তবে এরা সব আলালের ঘরের দুলাল, তার সঙ্গে লড়াই করে জিততে পারবে না।

বর্ণকুমারী তাকে ঠেলা দিলে সেও পালটি ঠেলা মারে। বর্ণ চোখ পাকিয়ে তাকায়, সেও তাকায়। রবি ফিকফিক করে হাসতে থাকেন মজা পেয়ে।

মাস্টারমশায় এলে কাদম্বরীও ছাত্রদলে যোগ দিলেন। আজকের পাঠ 'মেঘনাদবধ কাব্য'। সেই কঠিন পাঠ্য মাস্টারমশায়ের ততোধিক কঠিন পাঠে ছাত্রদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে লাগল।

কাদম্বরীর হাতে রবি একটি চিরকুট গুঁজে দিলেন, তাতে লেখা— কী বুঝিতেছ?

তৎক্ষণাৎ চিরকুটের উত্তরও পেয়ে গেলেন রবি, বুঝিলাম তুমি রাবণ আর আমি অশোকবনে বন্দিনী সীতা। রামচন্দ্র কবে উদ্ধার করিবেন সেই অপেক্ষায় আছি।

কিশোর রবির মনে দাগা লাগে, নতুনবউঠান কেন তাকেই রাবণ ভাবলেন? রবির মধ্যে রামচন্দ্র হওয়ার কোনও যোগ্যতাই কি তাঁর চোখে পড়ল না!

অভিমানী রবি পাঠে মন দিয়ে কাদম্বরীকে উপেক্ষা করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকেন কিন্তু রহস্যময়ীর ঠোঁটের মৃদু হাস্য সেই মনঃসংযোগে বিলক্ষণ বিঘ্ন ঘটাতে থাকে।

৪

বিরহিণী পত্রলেখা

তেতলায় নতুন কয়েকটি ঘর তোলা হয়েছে। সেখানেই জ্ঞানদা তাঁর নিজস্ব ঘরটিকে সুন্দর করে সাজিয়েছেন। মেঝেতে পেতেছেন ফুল-তোলা মাদুর। এককোণে ছোট্ট জলচৌকির ওপর কাঁসার ঘটিতে একগুচ্ছ লাল গোলাপ। দেওয়ালে জ্যোতিরিন্দ্রের আঁকা জ্ঞানদার একটি পোর্ট্রেট। সেদিকে তাকিয়ে আপনমনে বসে ছিলেন ছবির মানবীটি। হাতে সত্যেনের পাঠানো একগোছা চিঠি।

বিনি দাসী রুপোর রেকাবে একরাশ কাটা ফল নিয়ে হাজির করে, খেয়ে নাও গো বোঠান, তোমার শরীরে এখন গত্তি দরকার।

জ্ঞানদা আলস্যে শুয়ে থাকেন, দুর বিনি, আর সারাদিন ফল খেতে পারি না। যা-না একটু তেঁতুলের আচার নিয়ে আয়। সেজদিদির কাছে চুপিচুপি চেয়ে আনবি।

বিনি মুচকি হেসে বলে, এ সময়ে টক খেতে মন চায়, আমারও এরকম হত। মেজোবোঠান, তুমি দাঁতে করে একটু ফল কাটো দিকিনি, পেটের বাবুসোনার পুষ্টি হবে। আমি এই ছুটে আচার নে আসছি। আহা এসময় বাপের বাড়ি গেলে কত ভাল লাগত, সে তো কত্তাবাড়ির রেয়াজ নেই।

বিনি চলে যেতে-না-যেতেই উত্তেজিত হয়ে একটি খাতা হাতে করে জ্যোতিরিন্দ্র ঘরে ঢোকেন কালবৈশাখী ঝড়ের মতো। মেজোবউঠান, শুনবে একটু আমার নতুন লেখাটা?

জ্ঞানদা উজ্জ্বল মুখে প্রিয় দেওরের দিকে তাকালেন, এতদিনে তোমার আসার সময় হল নতুনঠাকুরপো, আমি তো ভাবলাম নতুন বউ পেয়ে পুরনো বোঠানকে ভুলেই গেছ!

তুমি কোনওদিন পুরনো হবে না মেজোবউঠান, জ্যোতি জ্ঞানদার হাতদুটি ধরে আবেগের সঙ্গে বলে ওঠেন, তবে কাদম্বরীকেও একটু সময় দিতে হবে তো! সে বেচারা তো আমার ভরসাতেই এই প্রাসাদে ঢুকেছে।

নববিবাহের রক্তিমাভায় জ্যোতিকে আগুনের মতো রূপবান মনে হয়। জ্ঞানদার হৃদয় এক মুহূর্তের জন্য ঈর্ষায় উথালপাতাল হয়ে ভাবে, কে এক কাদম্বরী কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এই তরুণের হৃদয়ে! পরক্ষণেই নিজেকে শাসন করেন ধীমতী এই নারী, ছিঃ, এরকম করে ভাবছেন কেন তিনি! দেবরটিকে তো তিনি আঁচলে বেঁধে রাখতে পারেন না চিরদিন।

মাঝে মাঝেই জ্ঞানদার ঘরের পালঙ্কে জমিয়ে আড্ডা বসান জ্যোতি ও স্বর্ণকুমারী। কিশোরী কাদম্বরী কোনও কোনও দিন একপাশে এসে বসে থাকেন। জ্ঞানদার সাহিত্যপ্রীতি ও সুচারু সাজসজ্জায় মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন, কিন্তু মেজোবউঠানের দিক থেকে নতুনবউ বিশেষ সাড়াশব্দ পান না। তাঁদের জমাটি আসরে নিজেকে বড় বেমানান লাগে কাদম্বরীর, কিন্তু তিনি ঠিক করেন শিগগিরই শিখে নেবেন স্বামীর ভাললাগা বিষয়গুলি।

রাতের শয্যায় লাজুক নতুন বউ স্বামীর কাছে জানতে চান, মেজোবউঠানকে তুমি খুব ভালবাসো তাই না?

জ্যোতি বউকে জড়িয়ে ধরে বলেন, হ্যাঁ ভালবাসি কিন্তু তোমাকে তার চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসি, শতগুণ বেশি।

তিনি কত কী জানেন, আমি মুখ্যু কিছুই জানি না। তোমাদের মতো করে কথা বলতে বড় ইচ্ছে করে, জ্যোতির বুকে মুখ রেখে কাদম্বরী বলেন।

জ্যোতিও তো তাই চান, নিজের মনের মতো করে গড়ে নিতে চান বউকে। বধূকে চুম্বন করে তিনি বলেন, তুমি এখন নরম মাটির মতো, আমি তোমাকে গড়েপিটে মনের মতো পুতুল বানাব। সবুর করো ক'দিন, তখন সবাই অবাক হয়ে তোমাকে দেখবে।

জ্ঞানদা নিজের ঘরে বসে সত্যেনের চিঠি পড়তে থাকেন। প্রতিদিনের প্রাত্যহিক কথাও চিঠিতে কেমন অসামান্য হয়ে ওঠে। অতিপরিচিত স্বামীটিও যেন নতুন হয়ে ধরা দিচ্ছেন নিত্য নতুন চিঠিতে। সত্যেন প্রায় প্রতিদিন চিঠি লেখেন জ্ঞানদাকে।

'তুমি এখন কেমন আছ? এই দুই তিন দিনে অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছ অবশিষ্ট কাল কিরূপে থাকিতে হইবে। তোমার সঙ্গে সর্ব্বদা কে কে থাকেন। স্বর্ণ ও জানকী কি তেতলায় শোন? খাওয়া তোমার একলা হয় কি কেহ ভাগী থাকে? তুমি যেমন চাও তাহা পাইতেছ কি না? সকল বিশেষ করিয়া লিখিবে। নূতনকে আমার স্নেহ জানাইবে ও বলিবে যেন মধ্যে মধ্যে লেখেন—

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নীলকমল ও চারুর Photo তোমার album-এর জন্য পাঠাইলাম।

শ্রীস'

'ভাই জ্ঞেনু

আলাহাবাদ বাগানে একজন অন্ধ ব্রাহ্মের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি জন্মান্ধ, তবুও বুদ্ধিমান ও বিবেকী বোধ হইল। কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিলেন মন্দ নহে— অর্থাৎ রাগরাগিনী শুদ্ধ না হোক কিন্তু সুর মন্দ নহে। তিনি অন্যের মুখে শুনিয়া উপনিষদ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের পুস্তক সকলের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন। এমন কি অনেক শ্লোক তাঁহার কণ্ঠস্থ। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা চক্ষু হারাইবার ভয় কর, কিন্তু দেখ চক্ষু না থাকিলেও কত করা যায়। আলাহাবাদ ২৬এ প্রাতে পরিত্যাগ করিয়া সেই দিন সন্ধ্যার সময় জব্বলপুর পৌঁছিলাম। ভাগ্যে চারুর কাছ থেকে একখানা Novel সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম, তাহাই পথের একপ্রকার সম্বল হইয়াছে। এখন সেই গ্রন্থ পাঠ করিতেছি— তাহার নাম Oswald Cray— গ্রন্থকর্ত্তা অথবা গ্রন্থকর্ত্রীর নাম Mrs. Henry Wood। গ্রন্থখানি মন্দ নহে, তুমি আনাইয়া পড়িলে বুঝিতে পারিবে। ইংরাজ সমাজের দোষগুণ— ভাল দিক মন্দ দিক— তাহার অন্তরের ভাব অনেক লক্ষিত হইবে। এক এক স্থলে বর্ণনা বেশ আছে।'

জ্ঞানদা জানতে চান সত্যেনের নিজের কথা। এত পথচলায় কষ্ট হচ্ছে কি? পায়ের ব্যথা কেমন আছে? মনের মতো কথা বলার সঙ্গী কি পেয়েছেন সত্যেন?

সত্যেন জানান,

'দেখ এক সপ্তাহের মধ্যে বোম্বাই আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখন যে হোটেলে রহিয়াছি তাহা Adelphi অপেক্ষা অনেক গুণে ভাল। হোটেল হইতে পৃথক

একটা বাঙ্গলা পাইয়াছি— গোবিন্দ্ একটা পার্শ্ববর্ত্তী বাঙ্গলায় রহিয়াছে— আমরা দুইজন একত্রে আহার করি। গোবিন্দ্ সারাদিনই তোমাকে ইংলণ্ডে পাঠাইবার পরামর্শ দেয়— তাহা এখন আর কি প্রকারে হয়— পরে দেখা যাইবে— কি বল জ্ঞেনু? আজ আমার ছুটির বিষয়ে অনুসন্ধান করিলাম— তাহার কোন গোল হয় নাই— ১৫ই মার্চ হইতে তিন মাসের ছুটি পাইয়াছি— কল্য আমার অবশিষ্ট বেতন আদায় করিয়া লইব। আহমদনগরই এখন আমার কর্ম্মস্থল। কিন্তু আবার আসিষ্টাণ্ট জজের পদ পাইবার চেষ্টা দেখিতেছি, শুনিলাম পুণায় একটা খালি আছে।'

জ্ঞানদা পালটা চিঠিতে জানতে চান, তুমি কী খাও, কেমন স্বাদের খাবার খাও জানাবে? যাতায়াতে পথে খাওয়াদাওয়ার কোনও কষ্ট হয়নি তো? তোমার সঙ্গে এই বিচ্ছেদ আর ভাল লাগে না। এমন করে কতদিন যে তোমাকে ছেড়ে থাকতে হবে!

সত্যেন জবাব দিলেন,

'পথিমধ্যে বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই। কল্য দাসপুরে সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে পৌঁছিয়া সুপ মাংস পীচ প্রভৃতি বিলক্ষণ ফলার করিয়া লইলাম। সঙ্গে যে আহার সামগ্রী ছিল, তাহা প্রায় খুলিতে হয় নাই। রৌদ্রের উত্তাপও বিশেষ কিছুই বোধ হইল না। আমি যে গাড়িতে ছিলাম, তাহা আর কেহ অধিকার করে নাই, সমস্ত পথটা একাকীই চলিয়াছি। সঙ্গীর মধ্যে এক হৈমবতী পুস্তক, তাহাকে লইয়া আর কতক্ষণ থাকিতে পারি। তবে বসিয়া শুইয়া ভাবিয়া ত একপ্রকার কালক্ষেপ করিলাম। কল্য সন্ধ্যার সময় 'নব ইন্দুকলা' দেখিয়া তোমাকে মনে পড়িতে লাগিল— দেখিতে দেখিতে তাহা অস্ত গেল— আমিও শয়ন করিলাম।

তোমাতে আমাতে এবার এক বৎসরের জন্য বিচ্ছেদ হইবে কাহার মনে ছিল কিন্তু তাহাই ঘটিল। বোধহয় কোন দেবতা আমার প্রতি রুষ্ট হইয়া আমাকে, যক্ষের অনুরূপ 'বর্ষভোগ্য কান্তা বিরহ গুরু' শাপ দিয়া থাকিবেন। এক্ষণে আর কি করা যায়। ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ও কর্ত্তব্য সাধন মনে করিয়া এক বৎসর কাল কোন মতে ধৈর্য্য ধরিয়া থাক; তোমার যখন যাহা প্রয়োজন হয় তাহা জানকীকে বলিলে তাহা আনিয়া দিবে। আর যদি কিছু না পাও ও তোমার কোনরূপ কষ্ট হয়, আমাকে লিখিলেই আমি তাহার উপায়

করিয়া দিবার চেষ্টা দেখিব। তোমার যে কোন অসুখ হয়, একজন কাহাকেও সব খুলিয়া বলা অত্যন্ত আবশ্যক— গোপন করিলে অনেক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। রাজেন্দ্রবাবু তোমাকে যত্ন করিয়া দেখিবেন তাহাতে আমার কোন সন্দেহ্ নাই। তোমার যখনি আবশ্যক হয় তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইবে।'

কত নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ হয় সত্যেনের, তাদের বর্ণনা পড়তে জ্ঞানদার ভারী মজা লাগে। সত্যেনের চিঠিতে ছবির মতন ভেসে ওঠে কত মানুষ, এক ভোজসভায় আলাপ হল এক কালাসাহেবের সঙ্গে।

'কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ— প্রথমেই কেমন নিতান্ত ফিরিঙ্গি ফিরিঙ্গি বোধ হইল। তাহার এ দেশের কিছুই আর ভাল লাগেনা। Roast Beef ও Beer ভিন্ন দেশীয় সামগ্রী সকল তাহার মুখরোচক নহে। ভিক্টোরিয়া রাণীর নিতান্ত অনুগত ভক্ত দাস। তাহার পিতা হইতে স্বতন্ত্র বাস করিতেছে। ইংলণ্ডের জলবায়ু— লণ্ডনের কর্দ্দম-ধূম কোওাসা— মেঘ বাষ্প প্রভৃতি তাহার পক্ষে অতীব তৃপ্তিকর। আর এ দেশের জলবায়ু সূর্য্যকিরণ অসহনীয়। তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমাদের অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হইল। আমরা যত পারি ইংলণ্ডের নিন্দা করিলাম ও সে দেশের জনসমাজের যে সকল কুপ্রথা তাহা বলিতে লাগিলাম। তাহা শুনিয়া যেন সে কিছু অপ্রস্তুত হইল।'

পশ্চিমে থাকতে জ্ঞানদার সঙ্গে বেশ ভাব হয়েছিল মিসেস অলিফ্যান্ট-এর। জ্ঞানদা সত্যেনের কাছে জানতে চাইলেন তাঁর কথা, সত্যেন স্ত্রীর বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে এসে লিখলেন,

'এখানে কাল Oliphant-দের সহিত Tiffin করিলাম। Mrs. Oliphant তোমার কথা অনেক জিজ্ঞাসা করিলেন— যথা তুমি ঘোড়ায় চড়িতে শিখিয়াছ কি না— কলিকাতা থাকিতে ভালবাস কি না ইত্যাদি। আমি Mrs. O-কে বলিলাম, যদি তুমি আহমদাবাদে তাহাকে ঘোড়ায় চড়িতে শিখাইতে তবে শিখিতে পারিতেন, কিন্তু এখন আর তাহার যো নাই। আর বলিলাম, কলিকাতার আর সকল ভাল লাগে, কেবল যদি মনের মত থাকিতে পার। আমাদের সকল পরিবারেরা কেমন একত্রে মিলিয়া একগৃহে বাস করে, তাহা বলিলাম।

তুমি বোধ করি Mrs. Oliphant-কে সৌদামিনীর কথা বলিয়া থাকিবে, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিল তাহার সহিত সেখানে সাক্ষাৎ হয় কিনা?'

জোড়াসাঁকোর আনন্দের আসরে একটু মনমরা হয়ে থাকেন জ্ঞানদা। এমনিতে তিনি এখন অন্তঃসত্ত্বা, কোনও দুশ্চিন্তা করা উচিত নয়। তবু মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন হন। নতুন বউ এসে তাঁর গুরুত্ব কি একটু কমে যাচ্ছে এ-বাড়িতে? ওই একফোঁটা নিরক্ষর বালিকার প্রতি এত মনোযোগ দিচ্ছে কেন নতুনঠাকুরপো? এমনকী পুঁচকে বালক রবিও তার থেকে মাত্র কয়েক বছরের বড় নতুন বউয়ের পেছন পেছন ঘুরছে। বোধহয় তার চেলি ও গয়নার ঝকমকানিতে আকৃষ্ট হয়েছে সে। এই বালিকা কী করে উজ্জ্বল জ্যোতির সহধর্মিণী হবে? পরিশীলনে পরিমার্জনায় জ্যোতির মন যে উচ্চ তারে বাঁধা হয়ে গেছে, বালিকা কী করে তার নাগাল পাবে? হাসি পায় জ্ঞানদার, দুঃখও হয়।

জোড়াসাঁকোর মেয়েমহলে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে জ্ঞানদার। বিবির কাছে ইংরেজি শেখেন, বাচ্চার জামা সেলাই করাও শিখছেন। বাংলা, ইংরেজি উপন্যাস পড়ে, চিঠি পড়ে তাঁর দিন কাটে আলস্যে। জ্যোতি কাদম্বরীরা অনেকেই বোলপুরে হাওয়া বদলাতে গিয়েছেন। জ্ঞানদা সত্যেনের কাছে আবদার করেন জোড়াসাঁকোর বাইরে আলাদা বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিতে। সত্যেন দুশ্চিন্তায় পড়েন। ঠাকুরবাড়ির চার-দেওয়ালে আটকে পড়া জ্ঞানদাকে কী করে মুক্তি দেবেন? অথচ তাকে তো একলা অন্য বাড়িতে রাখা যায় না!

'প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

এখন ত তোমার অনেক কষ্টে দিন যাইতেছে। কাল বাবামহাশয়ের ছবিশুদ্ধ তোমার পত্র পাইয়া তবুও কতকটা সুস্থির হইলাম। তোমার গঙ্গার ধারে থাকিবার ইচ্ছা হয় ত নিকটে কি কোন বাড়ী পাইতে পার না? তোমার সঙ্গে বাড়ীর কাহাকেও পাও আর ডাক্তারদের হইতে দুর না হয়, তবে ক্ষতি নাই, কিন্তু এখন বড়ই সাবধানে থাকা প্রয়োজন।'

'...তোমার অন্য বাড়ীতে থাকার বিষয়ে কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না— বাবামহাশয় ইহার মধ্যে ত বাড়ী আসিবেন, না জানি তাঁহার কি মত? আর তুমি ত পাঁচিধোবানির গলিতে কোন বাড়ী লইয়া থাকিতে পারিবে না—

একটা ভাল স্থানে বাঙালীটোলায় বাড়ী পাওয়া সহজ নহে। তবে যদি কোন বাগানে গিয়া থাকিতে ইচ্ছা কর। সে এক কথা।'

'...কি বল জ্ঞেনু?— কৈ তোমার ও নতুন বৌয়ের ছবি পাঠাইলে না?'

সত্যেন বারবারই নতুন বউয়ের ছবি দেখতে চান। জ্ঞানদা বারবারই তা পাঠাতে ভুলে যান। ফোটোগ্রাফার ডেকে ছবি তোলানো কিছু কঠিন নয়, আজকাল ঠাকুরবাড়ির অন্দরেও তারা ছবি তুলতে আসে। কিন্তু নতুনবউ এসে তাঁর বাল্য সহচর জ্যোতিকে ছিনিয়ে নিয়েছে জ্ঞানদার কাছ থেকে। খুব একা লাগে, মনখারাপ হয়। ছবি পাঠানো আর হয়ে ওঠে না।

ইতিমধ্যে সত্যেন টাঙ্গাগাড়ি কিনেছেন, কুকুর পুষেছেন। বাংলোবাড়িতে আস্তানা গেড়ে স্ত্রীকে লেখেন,

'আমি এক নতুন খবর তোমাকে লিখিতে ভুলিয়াছি। আমি এক গরু কিনিয়াছি ও কাল তাহার এক বৎস হইয়াছে। শুনিতেছি /৫ সের দুধ দেয় ও ৫০ টাকা দাম। দুধ দেখিয়া দাম দিব। তার নাম কি রাখিব? তোমাদের বাড়ীতে লক্ষ্মী বলিয়া এক গরু ছিল, তাহাকে তুমি ভালবাসিতে— এর নামও লক্ষ্মী রাখি— কি বল? তোমার চিঠি দুই দিন পাই নাই, তোমার শরীর কেমন, কিছু কি ভাল হইয়াছে?'

দু'জায়গায় সংসার চালাতে টাকার জোগাড় করতে সকলে দুশ্চিন্তায় পড়েন মাঝে মাঝেই। জ্ঞানদা জোড়াসাঁকোয় থাকলেও তাঁর জন্য মেমসাহেব শিক্ষিকা রাখার খরচ বা বিশেষ বিশেষ বইপত্রের টাকা সত্যেনকেই পাঠাতে হয়। রোজগেরে পুত্রের হাতখরচ দেওয়ার ব্যাপারে দেবেন ঠাকুরের কিছু আপত্তি আছে। অথচ ওই ১০০ টাকা পেলে জ্ঞানদার কাজে লাগে। সত্যেন বাবামশায়কে চিঠিতে টাকা বন্ধ না করার আবেদন জানান। রোজগার করলেই কি পুত্র তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন? জ্ঞানদাকে লেখেন,

'—আগামী মাসে তোমাকে টাকা পাঠাইতে পারিব কিনা সন্দেহ, কারণ

গাড়ীঘোড়া জিনিষপত্র কিনিতে অনেক খরচ হইয়াছে। বোধ করি আগষ্ট মাসে একেবারে ২, ৩ শত টাকা পাঠাইতে পারিব। তুমি যদুর কাছ থেকে ত মাসে মাসে কতক পাইবে আর বাবামশায় যদি ১০০ টাকা এখনো দিবার অনুমতি করেন তাহা তোমার হস্তে দিবার জন্য জানকীকে লিখিয়াছি।— যদি এখানে Assistant জজের কর্ম্ম পাই তবে বেশ হয়। তাহার অনেক সম্ভাবনা আছে। হয়ত এবারকার গ্যাজেটে তাহার কিছু থাকিতে পারে। আমার প্রেম ও রাশি রাশি চুম্বন।'

অন্যদিকে জ্ঞানদার মনে হয় সত্যেন ওখানে সুখেই আছেন, কত বন্ধুবান্ধব, কত ভোজসভা, কত নতুন জায়গায় ভ্রমণ। এ-সবেই তাঁর সঙ্গী হওয়ার কথা অথচ গর্ভিণী বলে আটকে থাকতে হচ্ছে এই সেকেলে শ্বশুরবাড়িতে।

সত্যেন ৬৫০ টাকা মাইনের অ্যাসিস্টান্ট জজ হয়েছেন আহমেদনগরে। প্রায় সন্ধেবেলাই কোনও না কোনও সাহেবের বাড়িতে গিয়ে সৌজন্যসাক্ষাৎ করতে হয়, এটাই নিয়ম। কয়েকদিনের মধ্যে এত মেমসাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছে যে মুখ মনে রাখতে পারছেন না। তাঁর মতে,

'এখানে অনেক গুলি বিবি আছে— একবার দেখা করিয়া সকলকে চিনিয়া উঠা কঠিন— এক দঙ্গল মেষপালের মধ্যে যেমন এক মেষকে অন্য হইতে চেনা দুষ্কর। নিতান্ত কুৎসিত কি নিতান্ত সুন্দরী যে, তাকেই একবার দেখিয়া জানা যায়। এখানে কর্ম্মের বড় অধিক জঞ্জাল নাই, পড়িবার অনেক সময়।

জ্ঞানদা রোজ চিঠি পান,

'আমচী জ্ঞেনুমণি,

এখন অনেক সময় একলা থাকিতে হয় বলিয়া এক একবার বড় বিরক্ত বোধ হয়। ১০টার পর নাস্তা করিয়া তারপর দুই প্রহরের সময় কাচারিতে যাই, সেখানে দুই তিন ঘণ্টা থাকিয়া আবার আসিয়া চা খাই ও কিঞ্চিৎ পরে সন্ধ্যার সময় একবার বেড়াইতে যাই। কাল চলিয়া দেখিলাম কত পথ চলিতে পারি। প্রায় আধ ক্রোশ চলিয়াও বিশেষ কষ্ট বোধ হইল না, ক্রমে চলা অভ্যাস করিতে হইবে। রাত্রে এখন মন্দ ঘুম হইতেছে না, মশা নাই এক বড় সুবিধা, মশারিও দিতে হয় না। তোমার আসিবার আর কত বিলম্ব হইবে বোধ কর?'

'... কতদিন হইল আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়াছি। বোধ হইতেছে যেন অনেক দিন— অনেক মাস—...

...'আমার এখন কেমন কিছুই ভাল লাগে না— আমি আপনার প্রতি বিরক্ত —এখানকার লোকজনের উপর বিরক্ত— কাহারও সঙ্গে মিশিতে ইচ্ছা হয় না। ইংরাজদের সঙ্গে মিলিবার স্থান Gymkhana, Band Stand প্রভৃতি আছে— কিন্তু সেখানে যদি যাই, অনিচ্ছার সহিত যাই। আর বিবিদের সেই একরকম কৃত্রিমতা আমার ভাল লাগে না। আমার এখন ক্রমশই প্রতীতি জন্মিতেছে যেন ইংরাজদের সঙ্গে আমাদের যে জাতীয় প্রভেদ তাহা ভাঙ্গিবার নহে। যাহা কিছু মিল হয় মৌখিকমাত্র। ইংলণ্ডে আমার মত একরকম ছিল। এখানে উল্‌টিয়া যাইতেছে।'

আশ্বিনের এক রাতে জ্ঞানদার ব্যথা উঠল। সারদা খবর পেয়ে দাইকে ডেকে পাঠালেন। রাতে আসার জন্য দাই একটু টাকা বেশি চাইলেও শেষে আট টাকায় রাজি করানো গেল। আতুঁড়ঘর উঠোনের এককোণে। নাড়ি কেটে দাই আতুঁড়ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল শিশুটিকে কোলে নিয়ে, পুত্রসন্তান দেখে মেয়েরা শঙ্খ বাজিয়ে উলুধ্বনি করে নবজাতককে স্বাগত জানালেন। নাতির মুখ দেখে খুশি হয়ে সারদা একটি নতুন ধনেখালি শাড়ি ও প্রচুর মিষ্টি দিয়ে দাই-বিদায় করলেন।

পরদিন ভোরেই দুধমা ও ধাইমা ডেকে আনা হল। ঠাকুরবাড়িতে প্রায়ই শিশু জন্মায় বলে বেশ কয়েকজন বাঁধা দুধমা ও ধাইমা আছে, তারাই পালা করে সামলে দেয়। কিন্তু এবার একটা গণ্ডগোল হল। নবজাতক দুধমায়ের স্তন্যপান করতে করতে তীব্র স্বরে কেঁদে উঠল।

জ্ঞানদা অস্থির হয়ে পড়েন, বাচ্চা কাঁদে কেন? পেটব্যথা নাকি অন্য কিছু? তিনি ধাইয়ের কোল থেকে নিজের কোলে নিয়ে বাচ্চাকে থামাতে চেষ্টা করলেও শিশুর কান্না থামে না। সাহেব ডাক্তারের ওষুধ পড়ল, তাও বাচ্চা নেতিয়ে পড়ছে কেন? দু'দিন কান্নার পর কেউ কিছু বোঝার আগেই শিশুটি মারা গেল। প্রথম সন্তানের মৃতদেহ কোলে নিয়ে সারারাত বসে রইলেন জ্ঞানদা। তাঁর চোখের জল যেন শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে।

কয়েকদিন পর সত্যেনের চিঠি এল,

'প্রিয়তমা জ্ঞানদা,

১১ই অক্টোবর জানকীর পত্রে দেখিলাম তোমার একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে— আজ তোমার তেরই-এর পত্রে তাহার মৃত্যুসংবাদ পাইলাম। ইহাতে আর কাহার দোষও— তোমারই কি দোষ, ডাক্তারদেরই কি দোষ। জন্মমৃত্যুর উপর আমাদের ত হাত নাই— আমরা নিয়মমত থাকিবার চেষ্টা করিতে পারি, তাহাই কর্ত্তব্য। এক্ষণে তোমার শরীরে বল পাইলেই আসিতে পার— দুই এক মাস না গেলে হয়ত বল পাইবে না। তুমি যেমন যেমন থাক আমাকে লিখিবে ও তুমি বেশ ভাল হইলে তোমার আসিবার কোনরূপ ব্যবস্থা করা যাইবে।'

শোকার্ত জ্ঞানদাকে কিছুদিনের জন্য পেনেটির বাগান-বাড়িতে নিয়ে আসা হল। জ্যোতি, সারদাপ্রসাদ, হেমেন, সৌদামিনীরা তাঁর সঙ্গী হয়েছেন। গঙ্গার সংস্পর্শে তাঁর মন যদি কিছুটা আরাম পায়। মৃত সন্তানের জন্য তাঁর প্রথম অশ্রুপাত ঘটল এখানেই।

এই শোকের সময় জ্যোতি তাঁকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছেন। মেজোবউঠানকে সঙ্গ দেবেন বলে কাদম্বরীকেও সঙ্গে আনেননি এবার।

গঙ্গার ঘাটে বসে বসে ওঁদের বেশি সময় কাটে। ওপারে কোন্নগরের বাগানে ঘাঁটি গেড়েছেন ও-বাড়ির গুণেন্দ্ররা। বাড়ি ভাগাভাগির পরেও গুনো আর জ্যোতির খুব ভাব। তাঁরা একসঙ্গে বৌবাজার আর্ট স্কুলের প্রথম বছরের ছাত্র ছিলেন। মাঝে মাঝেই বিকেলবেলা ওপারের পানসি এপারে আসে। এপারের পানসি ওপারে যায়।

বন্দুকের আওয়াজে তাঁরা একে অপরকে সিগনাল পাঠান। এপারের থেকে গুলি ছোড়েন গুণেন্দ্র। ওপার থেকে জ্যোতির বন্দুক জবাব দেয়।

গুণেন্দ্র ভারী শৌখিন পুরুষ। নানারকম মহার্ঘ শিল্পবস্তু সংগ্রহ করেন তিনি। স্ত্রীর আয়নার সামনে সাজিয়ে দিয়েছেন অসামান্য একটি স্ফটিকের টিউলিপ দেওয়া ফুলদানি। যতবার আয়নায় তাঁর মুখের ছায়া পড়ে, ততবারই মুখের পাশে ভেসে ওঠে টিউলিপগুচ্ছ।

কোন্নগরের বাগানে আবার অন্যরকম মজা। কতরকম লোক আসে। এক নাপিত কাঠবেড়ালির ছানা এনে দেয়। বাবুইপাখির বাসা জোগাড় করে আনে। বহুরূপী এসে নাচ দেখায়।

বারান্দার বাইরে ছোট চালাঘরে মেয়েরা রান্নার তদারকি করছেন। কাঁঠালতলায় চৌকি পেতে আসর জমিয়েছেন গুণেন্দ্র, জ্যোতি, যদুনাথেরা।

কোন্নগরের রাস্তা থেকে এক বালক গায়ককে ধরে এনেছেন গুণেন, ছেলেটি ভারী মজার। ব্ল্যাকওয়ার নামে এক সাহেব রোজ ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণের পর গয়লাপাড়ায় গিয়ে গয়লানির কাছে এক পো দুধ খেত। পাড়ার লোকে তাই নিয়ে গান বেঁধেছে। গুণেনের নির্দেশে অর্গান বাজিয়ে সেই গানটি শোনায়।

'হায় রে সাহেব বেলাকর
আমি গাই দেব, তুই বাছুর ধর
ওটি শিষ্ট বাছুর গুতোঁয় নাকো—
কান দুটো ওর মুচড়ে ধর।
হায়রে সাহেব বেলাকর।'

গান শুনে হা হা করে হেসে ওঠেন জ্যোতি ও গুণেন।

গঙ্গাতীরে বাঁধানো ঘাটের সিঁড়িতে বসে জ্যোতি একদিন তাঁর শকুন্তলা অনুবাদ শোনাচ্ছিলেন জ্ঞানদাকে। জ্যোতির কাব্যের অপূর্ব ভাষায় ছন্দে জ্ঞানদার মনে আনন্দ ফিরে আসছিল। একে একে হেমেন, যদুনাথ ও সারদাপ্রসাদ এসে জড়ো হলেন।

কিছুক্ষণ কাব্যপাঠের পর জ্যোতিরিন্দ্র একটু থামতেই যদুনাথ জানতে চান, ভায়া তোমার কাব্য তো অতি সুন্দর। কিন্তু এই রচনার নেপথ্য প্রেরণা কোন সুন্দরী?

জ্ঞানদা জানেন, তিনি এই রচনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছেন, তাঁর বিদগ্ধ সান্নিধ্যেই জ্যোতির উদ্ভাস। কিন্তু সে-কথা প্রকাশ্যে বলার নয়।

যদুনাথের হাসিঠাট্টায় উত্ত্যক্ত হয়ে সারদাপ্রসাদ বলেন, কেন জ্বালাচ্ছ ভায়রা, তুমি কি জানো না, সদ্যবিবাহিত তরুণ কবির মনে যে শকুন্তলার ছবি ফুটে উঠছে সে আমাদের কাদম্বরী।

লাজুক মুখে জ্যোতি জানালেন এরকম বেরসিকদের সামনে তিনি কাব্যপাঠ করতে চান না। ভাইকে লজ্জারুণ দেখে রাশভারী হেমেন উঠে যান। যদু তখন হাত ঘুরিয়ে নেচে নেচে জ্যোতিকে কাদম্বরীর নাম ধরে খ্যাপাতে থাকেন। জ্ঞানদা ভীষণ বিরক্ত বোধ করেন, মনে হয় কাদম্বরী এ যাত্রায় ওঁদের সঙ্গী না হলেও তিনিই যেন আসরের মধ্যমণি।

জ্ঞানদা যেখানে যান সেখানে সাধারণত তিনিই রানিমৌমাছি। তাঁকে ঘিরে দিশি বিদেশি পুরুষেরা বিস্মিত হন, স্তুতি করেন। সত্যেনের বন্ধু ম্যাকগ্রেগর সাহেব কতবার বোম্বাই ও আমেদাবাদের পার্টিতে সমবেত বহু মহিলার মধ্য থেকে তাঁকেই বেছে নিয়ে মুগ্ধতা জানিয়েছেন। নাচের আসরে তাঁকে ছাড়া আর কারও সঙ্গেই ডান্স করতে চান না ম্যাকগ্রেগর। সত্যেন স্বয়ং তাঁকে নিয়ে কত গর্ব করেন। জ্যোতিও তাঁকে মাথায় করে রাখে। কিন্তু এখন, এই গঙ্গাতীরের বাগান-বাড়িতে হঠাৎ মনে হয়, এখানে তিনি প্রধান আকর্ষণ নন, অন্য কেউ। প্রিয়জনেরা সবাই তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ঘিরে আছেন, জ্যোতিও সেজন্যই এখানে একা এসেছেন, নতুনবউকে আনেননি। কিন্তু নতুনঠাকুরপোর মন পড়ে আছে কাদম্বরীর আঁচলেই।

জ্ঞানদা এ-সবের অনেক ঊর্ধ্বে। তাঁকে অনেক দূর যেতে হবে। এ-সব কথাবার্তা তাঁর অসহ্য লাগে, এই বিচ্ছিরি আসর ছেড়ে তিনি ঘাটের অবারিত সৌন্দর্যের দিকে পা বাড়ান।

জ্যোতি দেখলেন গোধূলি আলোয় রহস্যময়ী নারীর মতো ধীরে ধীরে নদীর জলে পা ভেজাতে নেমে যাচ্ছেন জ্ঞানদানন্দিনী। মুহূর্তের জন্য তাঁর ভ্রম হয়, এ নারী কে, মেজোবউঠান না তাঁর নাটকের শকুন্তলা! জলে নেমে এইবার বোধহয় তাঁর আংটি খোয়া যাবে!

কিছুক্ষণ পর জ্যোতিও জলের ধারে নেমে গেলেন। মেজোবউঠানের পিঠে হাত রেখে বললেন, চলো ঘরে বসে গান-বাজনা করা যাক। এখানে ঠান্ডা বাতাস লেগে যাবে।

জ্ঞানদা জ্যোতির হাত ধরে বললেন, চলো নতুন, এখানে আর ভাল লাগছে না, জোড়াসাঁকো ফিরে যাই চলো।

জ্যোতিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এখন যে ঘরেই তাঁর পিছুটান।

এর অল্পদিন পরেই স্টিমারে বোম্বাই ফিরে গেলেন সদ্য সন্তানহারা জ্ঞানদা। বাড়ির দুই জামাই সারদাপ্রসাদ ও জানকীনাথ সে-যাত্রায় তাঁর সঙ্গী হলেন।

পশ্চিমে বসেও জোড়াসাঁকোর সব খবর পান জ্ঞানদা। জ্যোতি বেনামে 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নামে একটি প্রহসন লিখেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই নাটকে ব্রাহ্মিকাদের স্ত্রীস্বাধীনতাকে কটাক্ষ করা হয়েছে এবং কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকায় তা নিয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদ শুরু হয়ে গেছে।

ক্ষুব্ধ সত্যেন এসে জ্ঞানদাকে ধর্মতত্ত্ব পত্রিকার রিভিউ পড়ে শোনান, 'আমরা শুনিয়া যারপরনাই দুঃখিত হইলাম যে "কিঞ্চিৎ জলযোগ" নামক একখানি নাটক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে ভারতাশ্রম, ব্রহ্মমন্দির, প্রচারকগণকে বিলক্ষণ গালি দেওয়া হইয়াছে, ব্রাহ্মিকাদিগকেও ইহার মধ্যে আনিয়া গ্রন্থকর্ত্তা যথোচিত আপনার নীচতা ও বিকৃত স্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এ কথা শুনিয়া অবাক হইলাম যে উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্যের পুত্র।'

জ্ঞানদাও খুব বিরক্ত হন, আমাদের নতুনঠাকুরপো কী করে এরকম নারীবিরোধী নাটক লিখতে পারেন, মেয়েপুরুষ একসঙ্গে প্রার্থনাসভায় বসছে বলে ব্যঙ্গ করতে পারেন, আমি ভেবে পাচ্ছি না। শ্যাম গাঙ্গুলির মেয়েকে বিয়ে করে এত অধঃপতন! ছি ছি!

আবার বঙ্কিমচন্দ্র কেমন তাতে ধুনো দিয়েছেন দেখো, সত্যেন বলেন, বঙ্গদর্শনে কত প্রশংসা বেরিয়েছে। রাজা রাধাকান্ত দেব ডেকে নিয়ে তাঁর নাটমন্দিরে মঞ্চস্থ করিয়েছেন। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' আর 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' একসঙ্গে অভিনীত হয়েছে শনিবার।

জ্যোতি কেন রক্ষণশীলদের দলে গিয়ে ভিড়ল বলো তো? জ্ঞানদা অবাক হন, আমার তো মনে হয় নতুনবউ ওর মাথাটা খাচ্ছে। এইজন্যই শিক্ষিত মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। বাবামশায় আপত্তি করলেন, এখন বুঝুন তিনি, জ্যোতি তো তাঁর বিরুদ্ধেই কলম ধরেছে।

জ্যোতিটা একটু ওরকমই, সত্যেন বললেন, জ্ঞেনু তোমার মনে নেই আমরা মেয়েপুরুষ মিলে গাড়ি করে ময়দানে হাওয়া খেতে বেরলে জ্যোতির কেমন অস্বস্তি হত, তোমাকে গাড়ির পরদা তুলতে দিত না। তারপর অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে পরদা তোলা গেল তো মেয়েদের জন্য ঢাকা গাড়ির বায়না। তুমি এখানে এমন খোলা গাড়িতে ঘুরছ দেখলে জ্যোতির বোধহয় লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। আর নিজের বউকে বোধহয় ঘরবন্দি করে রাখবে মা দিদিমার যুগের মতো।

তুমি ওকে এখানে ডেকে পাঠাও। আমাদের সঙ্গে থাকলে ওর মনের ধোঁয়াশা কেটে যাবে। আমরা মেয়েরা কত সাহস করে এগিয়ে যাচ্ছি আর ওর মতো প্রতিভাবান ছেলে এমন পিছিয়ে থাকবে কেন?

এখন কি আর ওকে একলা পাবে, এখন ওকে ডাকলে নতুনবউকেও

বলতে হবে। সেটা তোমার ভাল লাগবে কি বউ? জ্ঞানদা কাদম্বরীকে কতখানি অপছন্দ করেন সত্যেন সেটা বিলক্ষণ জানেন।

হায়, রাহুগ্রস্ত চাঁদকে কে বাঁচাবে! অনালোকিত কাদম্বরীর গ্রাস থেকে প্রিয় দেওরটিকে কী করে রক্ষা করবেন? চাঁদে যে গ্রহণ লেগেছে। গভীর বিষাদে মৌন হয়ে যান জ্ঞানদা।

৫

স্বর্ণকুমারীর বোম্বাইবাস

স্বর্ণকুমারীর বয়স এখন পনেরো। ঠাকুরবাড়ির বিখ্যাত রংরূপের সঙ্গে তেজি চালচলনে তাঁকে যেন আগুনের হলকা মনে হয়। জ্যোতিদাদার সঙ্গে দু'-একটি সভায় গিয়ে কবিতাপাঠ করেছেন ইতিমধ্যেই আর তাতেই যেন হইচই পড়ে গেছে কলকাতার তরুণ কাব্যপ্রেমী মহলে। ছিপছিপে কনকবর্ণা তরুণী কবিটিকে একটু দেখার জন্য ভিড় জমে যায় সভায় সভায়।

শোভাবাজারের এক বনেদি বাড়ির কবিতার আসরে স্বর্ণ সেদিন এলেন কমলা রঙের পাটোলা সিল্ক পরে, সঙ্গে তিনলহরী মুক্তোর হার। সবচেয়ে চোখে পড়ে মাথার ছোট্ট টুপি ও কপালে চুলের গুচ্ছে জড়ানো মুক্তোর টায়রা। তাঁকে দেখেই গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। স্বর্ণ নিজেও শুনতে পান নানারকম ফিসফাস আলোচনা।

কেউ বলছে, আরে বাবা, মেয়ের সাজ দেখব না পদ্য শুনব! শুনেছি ইনি নাকি একটি কন্যার জননী। আবার কবিতাও লেখেন।

উত্তরে আর-একজন বলে, আমি অবশ্য বিশ্বাস করি না এ-সব পদ্য ওই সাজুনি মেয়ের লেখা, নিশ্চয় দাদারা লিখে দেয় বোনের নামে। মেয়েদের আবার সাহিত্যচর্চা! কলি কালে কত কী দেখব!

প্রথমজন বলে, তালে বোধহয় রূপের জোরে লেখা ছাপাচ্ছে, সম্পাদকেরা অমন চেহারা দেখেই কুপোকাৎ।

আরে সম্পাদকেরা তো সব ঠাকুরবাড়ির প্রসাদ পাওয়ার জন্য বসে আছে। বিদ্যেসাগর ফিমেল এডুকেশন করেছেন, তাই দেখে দেবেনঠাকুর মেয়েকে সাহিত্যিক বানাচ্ছেন। ভাবছেন তরু দত্ত, জেন অস্টেন যদি পারে, তাঁর ঘরের মেয়েই বা পারবে না কেন!

স্বর্ণর এ-সব শুনে কান্না পায়, তাঁর এত সাধনার কি কোনও দাম নেই এদের কাছে? অন্য সবাই যখন তাঁকে ধন্য ধন্য করছে তখনও এ-সব নিন্দুকদের কুকথা ভুলতে পারেন না তিনি।

সভার মাঝখানে একবার জ্যোতিদাদার হাত চেপে ধরে বলেন, এখানে অনেকে বোধহয় আমাকে পছন্দ করছেন না, চলো আমরা ফিরে যাই।

জ্যোতি অবাক হন, সেকী রে, সবাই যে তোর কবিতার কথাই বলছে! এ-সব বাজে কথা কে তোর মাথায় ঢোকাল?

সবাই হাঁ হাঁ করে জ্যোতিকে সমর্থন করে। এমনকী যারা এতক্ষণ বাজে কথা বলছিল তারাও সামনে এসে স্বর্ণকুমারীকে বলে, সেকী আপনি চলে গেলে এই সভা যে অন্ধকার হয়ে যাবে! বিলেতের যেমন জর্জ এলিয়ট আছেন, আমাদের তেমন আপনি। অন্য মহিলারা যাঁরা বামাবোধিনীর পাতায় লেখার চেষ্টা করেন তাঁরা কি লেখক নাকি?

লোকের ভণ্ডামি সইতে পারেন না স্বর্ণ। প্রতিবাদ করে বলেন, ওভাবে বলবেন না, ওঁরা অনেক অসুবিধের মধ্যে দিয়ে চেষ্টা করছেন, অনেকেই ভাল লেখেন। আমি তো ওঁদেরই মতো, সবে শুরু করেছি।

একজন তাচ্ছিল্য করে বলে ওঠে, আহা কীসে আর কীসে...

এবার জ্যোতি ঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করলে আসরের কর্তাব্যক্তিরা গোলমেলে লোকদের কয়েকজনকে সরিয়ে নিয়ে যান। আবার কবিতাপাঠ শুরু হয়।

ঠাকুরবাড়িতে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে স্বর্ণকুমারী ও জানকীনাথের মেয়ের নামকরণ অনুষ্ঠান আর বর্ণকুমারীর বিয়ের তোড়জোড়। পরপর দুটি উৎসব তাই সবার মনেই সাজো সাজো রব। দেবেন ঠাকুর প্রত্যেক বাচ্চার জন্মের ছ'মাস থেকে একবছরের মধ্যে সুবিধেমতো দিনে মুখেভাত ও নামকরণ করার নিয়ম করেছেন। তিনি হিন্দুদের মতো অন্নপ্রাশন বলেন না, কিন্তু সেরেস্তার কর্মচারীরা ওই অন্নপ্রাশন বলেই হিসেব লেখেন।

স্বর্ণর মেয়ের নামকরণ অনুষ্ঠানটি পেনেটির বাগান-বাড়িতে বেশ ধুমধাম করে সম্পন্ন হল। রবির জন্মের পর থেকেই এ-বাড়ির অন্নপ্রাশন ব্রাহ্মমতে হয়ে আসছে। এ ব্যাপারে দেবেন ঠাকুর একটি সুন্দর প্রথা চালু করেছেন। নামকরণ উপলক্ষে একটি পিঁড়িতে শিশুর নাম লেখা হল 'হিরণ্ময়ী'। তার

চারদিকে আলপনা এঁকে বাচ্চারা মহর্ষির নির্দেশমতো পিঁড়ির চারদিকে মোমবাতি লাগিয়ে দিল। নামের চারদিকে মোমের আলো জ্বলে ওঠার পর স্বর্ণর মনে হয় তাঁর মেয়ের নামের ওপর যেন বাবামশায়ের আশীর্বাদ ঝরে পড়ছে।

জানকীনাথের অবশ্য একটু মনখারাপ তাঁর বাবামায়ের অনুপস্থিতির কথা ভেবে। তাঁর মনে হয়, স্বর্ণর মতো পুত্রবধূ পাওয়া যে কত ভাগ্যের ব্যাপার তা তো আমার বাবামশায় বুঝলেন না, এখন কি নাতনিকেও দেখতে আসবেন না!

গোঁড়া হিন্দুরা না এলেও বাড়িতে লোকজন অনেক। দেবেন ঠাকুর যথারীতি সারদার হাত দিয়ে নাতনির জন্য সোনার বিছেহার আশীর্বাদী পাঠিয়েছেন। জয়পুরি সাদা পাথরের থালা বাটি গেলাসের পারিবারিক উপহার তো আছেই। মামা-মাসিরা মেয়ের গা ভরে গয়না দিলেন আর জড়ো হয়েছে মেয়ের জামা সেলাই করার জন্য রাশিকৃত রেশমি ছিট কাপড়। সবাই হিরণকে কোলে নিয়ে মাতামাতি করছে, এত সুন্দরী মেয়ে হয়েছে বলে।

সব অতিথি চলে গেলে বিকেলের মরা আলোয় স্বর্ণ ও জানকীনাথ ঘাটে এসে বসলেন, জানকীর কোলে হিরণ্ময়ী।

আমি যে আজ কত খুশি তা তুমি ভাবতেও পারছ না স্বর্ণ, গর্বিত বাবা জানকীনাথ বললেন। শুধু বাবামশায়ের অভাবটা মনে আসছে এত আনন্দের মধ্যেও।

স্বর্ণ আদুরে গলায় বলে ওঠেন, তুমি কি এখন শুধু মেয়েকেই ভালবাসবে, আমার আদর ফুরিয়ে গেল!

স্বর্ণ, তোমার জন্য আমি জননী জন্মভূমি ছেড়েছি, এখন যদি বলো মেয়েকে ছাড়তে, তা পারব না। কৌতুক ক্লুরে জানকী বলেন, অত পরীক্ষা নিয়ো না সখী।

আহা কত ভালবাসা জানা আছে, এই তো সেদিন বলছিলে বোম্বাইতে মেজোদাদার কাছে পাঠিয়ে দেবে আমাকে। আর ভাল লাগছে না বুঝি?

স্বর্ণ, স্বর্ণ, সে দু'-তিন বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তুমি তো সেখানে আরামে থাকবে, আমিই একা একা কষ্ট পাব। কিন্তু তুমি যখন দু'বছর পর ঘষে মেজে ঝকঝকে কেতাদুরস্ত হয়ে ফিরে আসবে, সেদিনটা ভেবে গর্বে আমার বুক ভরে যাচ্ছে।

মেজোবউঠানের সঙ্গে বসে বসে এ-সব ষড়যন্ত্র করেছ তাই না? স্বর্ণ বলেন। কিন্তু তোমরা যা ভাবছ তা কী করে হবে? মেয়েকে সেখানে দেখাশোনা করতে হবে, অত পড়াশোনা কখন করব?

সেটা তুমি মেজোবউঠানের ওপর ছেড়ে দাও স্বর্ণ, তিনি যখন তোমার দায়িত্ব নিয়েছেন তখন আমি নিশ্চিন্ত, সব ব্যবস্থা তিনি ঠিকঠাক করবেন, জানকীনাথ আশ্বস্ত করেন।

মেজোবউঠানকে তোমার খুব পছন্দ তাই না, তুমি চাও আমি অবিকল তাঁর মতো হই। স্বর্ণ বললেন একটু অভিমানের স্বরে, আমার লেখার টেবিলে আমি যে সবার চেয়ে আলাদা তা বুঝি তোমার চোখে পড়ে না?

জানকী মেয়ে সমেত পঞ্চদশী স্ত্রীকে কাছে টেনে হেসে ওঠেন, স্বর্ণ তুমি বড় ছেলেমানুষ। বাবামশায়ের আর দাদাদের স্নেহের পুতলি হয়েই আছ, এখনও বড় হলে না। অবশ্য সেটাই তোমার দুর্নিবার আকর্ষণ।

তা হলে দূরে পাঠাচ্ছ কেন, আমার যে তোমাকে ছেড়ে থাকতে একদম ভাল লাগে না, স্বর্ণ ঠোঁট ফোলান।

জানকী বলেন, তুমি এখন খনি থেকে তোলা কয়লা-চাপা হিরে, কিন্তু বোম্বাইয়ে মেজদাদা মেজোবউঠানের শিক্ষায় ডায়মন্ড কাটিঙে তুমি হয়ে উঠবে দুষ্প্রাপ্য কোহিনূর।

আর সেই কোহিনূর শুধু তোমার মুকুটে শোভা পাবে? স্বর্ণ হেসে বলেন, সেটি হচ্ছে না মশায়, তখন দেখবে আমি প্রেমের স্বয়ম্বর ডাকব।

আর আমি হব তোমার স্বয়ম্বরের দারোয়ান। হা হা করে হেসে ওঠেন জানকী। তাঁর হাসির আওয়াজে ভয় পেয়ে হিরণ্ময়ী কাঁদতে শুরু করে। কান্না কিছুতে থামাতে না পেরে শেষে দাইকে ডেকে বাচ্চা হস্তান্তর করেন নতুন বাবা-মা। সন্ধ্যার গঙ্গার হাওয়ায় পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে আরও কিছুক্ষণ ঘাটে বসে থাকেন স্বর্ণকুমারী ও জানকীনাথ, দূরে বয়ে যাওয়া নৌকোয় এক এক করে রেড়ির তেলের কুপির আলো জ্বলে ওঠে।

অক্টোবরে হিরণ্ময়ীর নামকরণের রেশ কাটতে না কাটতেই নভেম্বরে বর্ণকুমারীর বিয়ে লাগল। এবার মেডিকেল কলেজের একটি মেধাবী ছাত্রকে জামাই করতে পেরে দেবেন ঠাকুর বেশ খুশি। সতীশচন্দ্র ব্রাহ্মণ সন্তান, বাড়ি গোস্বামী-দুর্গাপুরে। পিরালি বংশে বিয়ে করায় ইনিও ত্যাজ্যপুত্র হয়ে দেবেন ঠাকুরের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিলেন। বিয়ের পর থেকেই তাঁর

মেডিকেল কলেজের খরচ জোগানো হতে থাকল ঠাকুরবাড়ি থেকে। এমনকী বিলেতে পাঠিয়ে ডিগ্রি অর্জন করানোর পরিকল্পনা ভেবে ফেললেন মহর্ষি। নববিবাহিত বর্ণ ও সতীশের জন্য ঠাকুরবাড়িতে একটি আলো হাওয়াযুক্ত বড় ঘর বরাদ্দ হল।

এইসময়, ১৮৭০ সালের এক আশ্চর্য দিনে দেবেন্দ্রনাথের স্নানঘরে কলের জল লাগানো হল। তখন কলকাতার বাড়িতে বাড়িতে পাইপের সাহায্যে পলতা থেকে হুগলি নদীর পরিশ্রুত জল পাঠানো শুরু হয়েছে। সে এক বিস্ময়, তেতলার ওপরে এত অনায়াসে কল খুললেই জল পাওয়া যাচ্ছে দেখে বাড়ির ছোটবড় সকলেই মুগ্ধ।

বালক রবির বড় ইচ্ছে একদিন বাবামশায়ের ওই অবিরল জলধারায় স্নান করেন। কিন্তু তিনি বাড়ি থাকলে তা সম্ভব নয়, চাকরদের নজর এড়িয়ে কী করে চান করা যায় তার মতলব করতে থাকেন রবি ও সমবয়সি ভাগনে সত্য।

একদিন কুস্তির আসরের পর দুই বালক সবার নজর এড়িয়ে গুটিগুটি ঢুকে পড়ল বাবামশায়ের চানঘরে। কাদামাটি মাখা ছোট দেহদুটি জলধারার নীচে পেতে দিয়ে কী অনির্বচনীয় আনন্দ! কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্যামা চাকর এসে হাজির। দুই অপরাধীকে নিয়ে যাওয়া হল সারদার দরবারে।

সারদাদেবী কিছুক্ষণ বালকদের আপাদমস্তক দেখে বলেন, কেন গেছিলি কত্তার চানঘরে?

কাঁচুমাচু বালকরা উত্তর দেন, বড্ড কাদা লেগে গেছিল কুস্তি করতে গিয়ে। ওরা জানে মা কুস্তি পছন্দ করেন না।

সারদা যথারীতি বললেন, কী দরকার ও-সব বাজে খেলার? গায়ে ময়লা লাগে। একে তো শ্যামলা ছেলে, তায় আব্বর কাদা মেখে ভূত সাজছিস কেন রবি?

কী করব, হেমদাদা গণাদাদারা যে ডেকে নিয়ে যান, আমার কি ভাল লাগে নাকি তেল মেখে কাদা মেখে কুস্তি করতে? রবি জবাব দেন সাহস করে।

সারদাদেবী মানদা দাসীকে ডেকে বলেন, ওরে, আমার সামনে সর-ময়দা দিয়ে ছেলেদুটোকে আচ্ছা করে দলাইমলাই করার ব্যবস্থা কর। রোজ মাখাবি। আমার এই ছোট ছেলেটাই ময়লা, দেখি রং ফেরে কিনা!

রবির কাছে এ এক নতুন শাস্তি। কিন্তু ছাড় পাওয়ার কোনও উপায় নেই। মায়ের সামনে চলল ছেলেদের কষে রূপটান মাখানোর আসর।

একদিন হঠাৎ সারদার কাছে ছুটে এসে কাঁদতে শুরু করেন প্রফুল্লময়ী। মা, মা গো, আপনার ছেলের পাগলামি আর সামলাতে পারছি না। দেখুন আমাকে কীরকম মেরেছে! ঘরের জিনিস সব ভেঙে ফেলছে।

সারদা বিচলিত হয়ে দাসীদের ডাকেন। দেখ তো হেমেন আছে কি না, বীরেনের পাগলামি এত বেড়ে গেছে বউ তুমি আগে বলনি কেন, তা হলে তোমাকে মার খেতে হত না।

শান্ত দুঃখী এই বউমাটির জন্য সারদার মায়া হয়। বিয়ের পর থেকে বীরেনের পাগলামি ক্রমশ বাড়ছে। সারানোর সব চেষ্টাই বিফলে গেছে। এত দুঃখের মধ্যেও একটাই ভাল ঘটনা ঘটেছে প্রফুল্লময়ীর জীবনে, সম্প্রতি তাঁর একটি ছেলে হয়েছে। দেবেন্দ্র নাতির নাম দিয়েছেন বলেন্দ্রনাথ। শিশু বলেন্দ্র তার বাবার পাগলামি দেখে খিলখিল করে হাসে।

পরিবারে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। হেমেন্দ্রনাথ ভাইকে সামলাতে না পেরে সাহেব ডাক্তার ডেকে পাঠালেন।

ডাক্তারের হাত ঝাঁকুনি দিয়ে বীরেন বলতে থাকেন, আমার কলাবউ কই, কলাবউ?

হেমেন ধমক দিয়ে বলে ওঠেন, কী পাগলামো করছ বীরেন, ওই তো তোমার বউ প্রফুল্লময়ী, কলাবউ আবার কে?

বিয়ের আগে থেকেই বীরেন দিদিদের কাছে বায়না ধরেছিলেন কলাবউ বিয়ে করার। এখনও মাঝে মাঝে সেটা মনে পড়ে যায় বোধহয়। প্রফুল্লর ঘোমটা সরিয়ে ভাল করে মুখটা দেখে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন বীরেন, যাঃ তুমি আমার কলাবউ না।

প্রফুল্লময়ী জোরে কেঁদে ওঠেন। দিদি এবং বড় জা নীপময়ী তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যান। বড় শখ করে বোনের সঙ্গে দেওরের বিয়ে দিয়েছিলেন, এখন ওর কষ্ট চোখে দেখা যায় না।

ডাক্তারের পরামর্শে লুনাটিক অ্যাসাইলামে পাঠানো হল বীরেনকে। ঠাকুরবাড়ির পুরুষদের কম বেশি সকলেরই চন্দ্রদোষ আছে কিন্তু বীরেনই প্রথম ক্লিনিকালি লুনাটিক। বীরেনের জন্য শোকের ছায়া নেমে আসে সারা বাড়িতে।

এর ওপর হঠাৎই একদিন কলেরা হয়ে মাত্র আটাশ বছর বয়সে ও-বাড়ির গণেন্দ্র মারা গেলেন। লম্বা ফরসা উদ্যোগী দায়িত্ববান এই যুবকের মৃত্যুর জন্য কেউই তৈরি ছিলেন না। দু'বাড়ির বিরোধের মধ্যে তিনি সেতুবন্ধন করেছিলেন, তাঁরই উদ্যোগে দু'বাড়ির ছেলেরা মিলে নবনাটক করেছেন। চৈত্রমেলার আয়োজন করে সবাইকে মাতিয়ে রেখেছিলেন। বাড়ির সবাইকে একসুতোয় বাঁধার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। এখন দেবেন ঠাকুরের স্নেহধন্য এই ভাইপো চলে যেতে পুরনো ফাটলটা যেন আরও বড় হাঁ করে গিলে খেতে আসে পরিবারটাকে। দেওয়ালের একদিকে গণেনের মৃত্যুর জন্য শোক করেন সারদা, আর অন্যদিকে যোগমায়ার চোখের জল পড়ে বীরেনের কথা ভেবে। কত্তাও এখন প্রবাসে, সারদার মনে হয়, এতবড় সংসারের সব ভার তিনি আর বইতে পারছেন না। একসঙ্গে থাকলে তাও তো দুই জা মিলে এই শোক ভাগ করে নিতে পারতেন!

মহর্ষি এখন আর কলকাতার বাড়িতে থাকতে ভালবাসেন না। আগে দুর্গাপূজা এড়ানোর জন্য ওইসময়ে বেড়াতে যেতেন, আজকাল প্রায় সারাবছরই পাহাড়ে পাহাড়ে কাটান। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর বিশাল দেনার দায় তাঁর ওপর চেপেছিল। এক পাওনাদার দেনার দায়ে দেবেনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করিয়েছিল। কিন্তু নানারকম ব্যয়সংকোচ ও কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে কিছুদিনের মধ্যে সেই দুর্দিন কাটিয়ে উঠেছেন দেবেন।

ওইসময়ের একটা মজার ঘটনার কথা সারদার মনে পড়ে। ঠাকুরদের সেই দুর্দিনে একবার শোভাবাজার রাজবাড়িতে গানের জলসায় নিমন্ত্রণ এল দেবেনের কাছে। সব ধনী অভিজাত পুরুষেরা উৎসুক হয়ে আছেন, অভাবের দিনে দ্বারকানাথের ছেলে কী পোশাক কেমন অলংকার পরে আসবেন। সভা গমগম করছে হিরে জহরতের গয়না, জরি-কিংখাবের পোশাক পরা বাবুদের ঝলকানিতে, দেবেন প্রবেশ করতেই সবাই স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে। তাঁর পরনে সাদা ধবধবে আচকান-জোড়া, সাদা পাগড়ি, কোথাও সোনা রুপো জরি কিংখাবের লেশমাত্র নেই। তাকিয়ায় গা এলিয়ে বসে পা দুটো একটু বাড়িয়ে রাখলেন দেবেন, পায়ে সাদা মখমলের জুতোয় বিরাট দুটো মুক্তো বসানো। শ বাজারের রাজামশায় ছিলেন তাঁর বন্ধু। ছেলে ছোকরাদের ইশারা করে তিনি নাকি বলেছিলেন, 'দেখ, তোরা দেখ... একেই বলে বড়লোক। আমরা যা গলায় মাথায় ঝুলিয়েছি— ইনি তা পায়ে রেখেছেন।'

দেবেন্দ্র হিমালয়ে ঘুরে বেড়ান প্রিয় দু'-একটি শিষ্য নিয়ে। ঘরে বসে দুশ্চিন্তায় অধীর হয়ে ওঠেন সারদা। একদিন রবিকে অন্তঃপুরে ডেকে পাঠালেন তিনি। যে- কোনও সুযোগে অন্দরে যেতে পারলেই খুশিতে মেতে ওঠেন রবি, নীরস চাকরমহলের কঠিন অনুশাসন থেকে সাময়িক মুক্তির আশায়। মা এমনিতে ডাকখোঁজ বেশি করেন না, না ডাকলে ভেতরে ঢোকাও বারণ বাচ্চা ছেলেদের, রবির মন তবু উৎসুক হয়ে থাকে সুদূরচারী জননীর এমন একটি ডাকের অপেক্ষায়।

রবি আসতেই সারদা তাঁকে হুকুম দেন, কত্তামশায় অনেকদিন হল পাহাড়ে গেছেন, তাঁর কোনও খবর পাচ্ছিনে, আমার হয়ে তাঁকে একটি চিঠি লিখে দে তো বাবা।

রবির মন অজানা পুলকে নেচে ওঠে, দাদাদের না ডেকে তাঁকেই যে মা ডেকেছেন এই কাজের জন্য এ-কথা ভেবে তাঁর বুক ভরে যায়। তাড়াতাড়ি ছুটে কাগজ কলম নিয়ে মায়ের চৌকির পাশে বসে পড়ে বলেন, কী লিখতে হবে মা?

আসলে এবার সারদা অনেক ভেবেচিন্তেই রবিকে ডেকেছেন। এর পেছনে একটা কাহিনি আছে। এক হিতৈষিণী আত্মীয়া দু'দিন আগে সারদাকে জানিয়েছেন যে রাশিয়া ভারত আক্রমণ করেছে। কোথায় কোন রাজ্যে সেই যুদ্ধ লেগেছে সারদা জানেন না, আত্মীয়াও বলতে পারেননি। হেমেন ও জ্যোতিকে জিজ্ঞেস করেও জানতে পারেননি। তাঁরা এরকম কোনও যুদ্ধের খবর শোনেননি। কিন্তু খবর না পেয়ে দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকা স্বামীর জন্য সারদার উদ্বেগ তাতে বেড়েছে বই কমেনি। আবার জ্যোতি জানিয়েছেন শ্রাবণের সোমপ্রকাশ পত্রিকায় একটি সংবাদে লিখেছে, 'বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংসার ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের নিকটস্থ ধর্মশালায় জীবন যাপন করিবার মানস করিয়াছেন।' জ্যোতি যদিও বলেছে এ-সব গুজবে কান না দিতে, সারদা সন্দেহ নিরসনের জন্য কত্তামশায়কে পত্র দিতে চান। জ্যোতি হেমেনরা তাঁর চিন্তাকে গুরুত্ব না দেওয়ায় তিনি রবিকে ডেকেছেন।

কিন্তু মা ও ছেলে কেউই জানেন না চিঠির ভাষা ঠিক কীরকম হওয়া উচিত। জমিদারি সেরেস্তার মহানন্দ মুনশির শরণ নিয়ে রবি চিঠি রচনা করলেন। সারদাকে পড়ে শুনিয়ে চিঠি ডাকে দেওয়া হল।

মহর্ষি জবাবে লিখলেন, ভয়ের কিছু নেই, রাশিয়ানদের তিনিই তাড়িয়ে

দেবেন। এতে সারদা আশ্বস্ত হলেন কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা যে, বালক রবীন্দ্রনাথ বাবাকে প্রথম চিঠি লিখে এবং জবাব পেয়ে উত্তেজিত হয়ে প্রায়ই মহানন্দের দপ্তরে হাজির হতে লাগলেন। রোজ তিনি বাবামশায়কে চিঠি পাঠাতে চান। মহানন্দবাবু বালকের আবদারে মাঝে মাঝে চিঠি লেখার ভান করেন ঠিকই, কিন্তু সে-চিঠি আর হিমালয়ে পৌঁছয় না। তখন রবি তাঁকে নিয়ে একটি ছড়া লিখে ফেললেন নিজের খাতায়,

'মহানন্দ নামে এ কাছারিধামে
আছেন এক কর্মচারী,
ধরিয়া লেখনী লেখেন পত্রখানি
সদা ঘাড় হেঁট করি।...
হস্তেতে ব্যজনী ন্যস্ত,
মশা মাছি ব্যতিব্যস্ত—
তাকিয়াতে দিয়ে ঠেস...'

হেমেনের খুব ঘোড়ায় চড়ার শখ, তাঁর একটা ঘোড়া বারবাড়ির আস্তাবলে বাঁধা থাকে। সেই অশ্ব বাড়ির অনেকের মনে-পক্ষীরাজের স্বপ্ন উসকে দেয়। জ্যোতি আর কাদম্বরীর ঘরেও এমন এক স্বপ্নবোনা চলছিল।

কাদম্বরী আদুরে গলায় স্বামীকে বলেন, আমাকে ময়দানে হাওয়া খেতে নিয়ে চলো-না একদিন, তোমার সঙ্গে খোলা হাওয়ায় বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে খুব।

জ্যোতি ভয় পান, তোমাকে নিয়ে হাওয়া খেতে গেলে মা তোমার ওপর রাগ করবেন, অশান্তি হবে, না হলে আমার তো ইচ্ছে করে সেজদাদার ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাই। রূপকথার রাজকন্যে, দাঁড়াও না, একদিন ঠিক নিয়ে যাব।

কাদম্বরী ঠোঁট ফোলান, মেজোবউঠান যে স্টিমার পাড়ি দিয়ে ঘনঘন যাতায়াত করছেন, তখন তো ধন্য ধন্য কর। নিজের বউকে নিয়ে বাইরে বেরুতে এত ভয়?

সে যাচ্ছেন ঠিক, কিন্তু খাস কলকাতার বুকে হাওয়া খেতে তিনিও এখনও বেরোননি। আগে তিনি পথ দেখান, তারপর তুমি।

জ্যোতির কথায় অভিমান হয় কাদম্বরীর, কেন সবসময়ে তিনি আগে আর আমি পরে? তুমি ভেবেছ আমি আগে কিছু করতে পারি না? আসলে আমার সাহস আছে, তোমার নেই।

দমকা হাওয়ার মতো ঘরে ঢুকে পড়ে রূপকুমারী। সে জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে কয়েকটা কথা শুনতে পেয়েছে। সে বলল, জ্যোতিদাদা, আমিও ঘোড়ায় চড়ব, নতুনবউঠানের সঙ্গে আমিও যাব হাওয়া খেতে।

এই রে পাগলিটা এসে গেছে, জ্যোতি বলে ওঠেন। তুই সবসময় আমার কাছে ঘুরঘুর করিস কেন রে? জানো নতুনবউ, যেখানে যাব, ও এসে পথে দাঁড়িয়ে সঙ্গে যাওয়ার বায়না ধরবে।

ও মুখ ফুটে বলতে পারে আর আমি মনের ইচ্ছে চেপে রাখি। কাদম্বরী বলেন, ও যেমন ছটফট করে বেড়ায় আমার হৃদয়টাও তেমনি ছটফটে। খাঁচায় থাকতে চায় না।

জ্যোতি বলেন, সেজদাদার ঘোড়াটা তো আচ্ছা জ্বালালে! কথায় বলে লোকে ঘোড়া দেখলে খোঁড়া হয়, আর তোমরা যে পক্ষীরাজের ডানা চাইছ! চলো, তোমাদের আমার নতুন নাটক পড়ে শোনাই।

জ্যোতি এখন যে নাটকটা লিখছেন তার নাম দিয়েছেন 'সরোজিনী'। কাদম্বরী নাট্যরসে মজে যান, তাঁর মনে অপূর্ব আনন্দের সৃষ্টি হয়। কিন্তু রূপা কিছুক্ষণ পরেই কোথায় যেন চলে গেল।

আরও কিছুক্ষণ পরে বারবাড়িতে হইচই চেঁচামেচি শুনে জ্যোতি বাইরে বেরিয়ে এসে শুনলেন সেজদাদার ঘোড়ায় চড়ে রূপকুমারী উধাও হয়ে গেছে।

সারদার বারান্দায় এসে কাদম্বরী দেখলেন সেখানেও হুলুস্থুলু কাণ্ড।

মানদা দাসী লাফাচ্ছে, আরও আশকারা দাও কত্তামা, আরও মেয়ে মেয়ে করে মাথায় তোলো। কী দস্যি দজ্জাল বিটিরে বাবা! ওই বেটি তোমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবে।

সারদা ঠান্ডা থাকার চেষ্টা করেন, আঃ চুপ কর মানদা, গোল করিস না। আরে মেয়েটা তো মরে যাবে, ওই বিচ্ছু ঘোড়া নির্ঘাত পিঠ থেকে ফেলে দেবে ওকে, কেউ কি বাঁচাতে গেছে? যা, খবর নে।

কাদম্বরী বললেন, মা আপনার ছেলে তো দেখতে গেছেন, কিছু একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় করবেন।

সারদা অকূলে কূল পান যেন, গেছে জ্যোতি? দেখো যদি শেষরক্ষা হয়। মনে মনে গৃহদেবতার নাম জপ করতে থাকেন তিনি।

বড় মেয়ে সৌদামিনী সারদাকে সাবধান করতে চান, মা, এবার তুমি রাশ টানো। হয় ওকে থামাও নয় নিজে থামো। মেয়েটা বড্ড অবাধ্য, তোমাকে তিষ্ঠোতে দেবে না।

তাড়াও কত্তামা, ওকে এবার তাড়াও। মানদা আবার ফুঁসে ওঠে, আমরা কত কষ্ট করে চাট্টি ভাত খাচ্ছি আর ওকে তুমি আমাদের সবার মাথায় নেত্য করতে বসিয়ে দিলে।

এবার কাদম্বরী মানদাকে বকেন, আঃ মানদা, তোর কি কোনও আক্কেল নেই। বাচ্চা মেয়েটা না হয় না বুঝে একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছে, তাই বলে তুই মায়ের মুখের ওপর এরকম কথা বলবি?

সারদাও জোর পান নতুনবউয়ের কথায়, মানদা তোর বড় বাড় বেড়েছে দেখছি আমি। যত অলক্ষুনে কথা বলিস। দূর হয়ে যা এখান থেকে। যতক্ষণ না মেয়েটা ভালয় ভালয় ফিরে আসে ততক্ষণ আমার সামনে আসবি না।

ঘণ্টাখানেক বাদে বহু কসরত করে দারোয়ান বেহারার দল রূপকুমারীকে ঘোড়াসহ ধরতে পারল। ঝোঁকের মাথায় ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলেও ঘোড়সোয়ারির কোনও কিছুই তার জানা নেই, তাই ঘোড়া ছুটতেই নিজের বিপদ আঁচ করেছে রূপা কিন্তু তখন ঘোড়াই তার চালক। থামানোর কোনও উপায়ই সে জানে না। জ্যোতি চারদিকে লোক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রূপার আর্ত চিৎকারেও পেছন পেছন মজা দেখার অনেক লোক জড়ো হয়েছে। ভিড় থেকে নানারকম মন্তব্যও উড়ে আসছে রূপাকে লক্ষ্য করে।

কেউ বলছে, ঘোড়ার ওপর ডবকা মাগীর খেল দেখে যা আয়। আবার কেউ বলছে দেবীর কি এবার অশ্বে আগমন? ইনি দেবী না মানবী? গায়ে তো গয়নাগাটিও বেশ।

ভদ্দরলোকের বেটি তো খোলামেলা রাস্তায় নামবে না, এ নিশ্চয় কোনও বেশ্যামাগীর বাবু ধরার ছলাকলা।

একে ঘোড়া থামে না তারপর এ-সব নোংরা নোংরা কথা। বাইরের জগৎটা এত খারাপ, লোকেরা এত ইতর হতে পারে জানত না রূপা। এ-সব শোনার জন্যই সে বাইরে বেরতে চেয়েছিল, হায় রে! ক্ষোভে, ভয়ে তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে।

কোনওক্রমে রাস্তার লোকেরা ও বাড়ির দারোয়ান বেহারারা মিলে ঘোড়ার দড়ি ধরে থামায় শেষপর্যন্ত। ঘোড়া থামামাত্র উৎসাহী কিছু বদমাশ লোক রূপার গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করে। একটি বিচ্ছিরি ঢ্যাঙা লোক রূপার বাহু ধরে টানতেই রূপা তাকে ঠাসিয়ে চড় কষায়। বেহারারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই এতসব ঘটে গেল কিন্তু এবার কী হবে?

চোয়াড়েমার্কা কয়েকটি লোক রূপাকে জাপটে ধরার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু করল, এ মাগীটা তো বেশ সরেস মাল, আবার গায়ে হাত তোলে। দেখি এবার কে তোকে বাঁচায়!

ঘটনা আরও খারাপ দিকে যেতে পারত, কিন্তু ঠিক সময়ে জ্যোতিরিন্দ্র পালকি চেপে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে লোকগুলো পালাল বটে তবে তেড়ে খিস্তি দিতে ছাড়ল না। পরের দিন বিখ্যাত জ্যোতি ঠাকুরকে ঘটনার নায়ক করে দুটি সংবাদপত্রেও এই মুখরোচক খবর ছাপা হল।

৬

সারদার মৃত্যু

জ্যোতির আজ মনখারাপ। টাকাপয়সার অভাবে একটি দাতব্য হাসপাতালে অসহায়ভাবে মারা গেলেন মধুসূদন দত্ত। ধনী পিতার আদরের সন্তান মধু ভেবেছিলেন ইংরেজিতে কবিতা লিখলে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাবেন আর সেজন্য ছেঁদো হিন্দুধর্ম ছেড়ে খ্রিস্টান হওয়া দরকার। মধুর ধর্মত্যাগ সমাজে হুলুস্থুলু ফেলে দিল। রাগে ক্ষোভে বাবা রাজনারায়ণ তাঁকে ত্যাগ করলেন। মায়ের স্নেহ ছেড়ে, প্রেসিডেন্সি কলেজের বন্ধুদের পেছনে ফেলে, দেশত্যাগ করে মধু বেরিয়ে পড়লেন ভাগ্যান্বেষণে। কিন্তু ভাগ্যদেবী তাঁর সঙ্গে ছলনা করেছেন। সরস্বতীর কৃপায় কবিতায় আর নাটকে তাঁর খাতা ভরে উঠেছে, কিন্তু লক্ষ্মী তাঁকে ধরা দিলেন না, কোনওদিনই। মধু অবশ্য খুব শিগগিরি বুঝতে পেরেছিলেন যে লিখতে হলে ইংরেজি নয় বাংলাতেই লিখতে হবে। ইংরেজি ভাষায় অনেক প্রতিযোগিতা, কেউ তাঁর মতো নেটিভকে ঢুকতে দিতে চায় না। কিন্তু বাংলায় বহু কিছু করার আছে। প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুররা যে রকম কুলিমজুরের ভাষায় লিখছেন তা দিয়ে কালজয়ী সাহিত্য হতে পারে না। দুয়োরানি বাংলামায়ের শরীরে অলংকার পরিয়ে তিনি তাকে সুয়োরানি সাজাবেন। একটি কবিতায় বাংলাভাষার উদ্দেশে তাঁর অন্তিম ইচ্ছের কথাও লিখে গেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত,

‘রেখ মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন কোরো নাকো তব মন কোকোনদে’

মধুসূদনের প্রহসনের সঙ্গেই জ্যোতির 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল একবার। তার আগে থেকেই জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মধুর আসা-যাওয়া।

জ্যোতি বললেন, নতুনবউ, তুমি তো তাঁকে দেখনি। অমন প্রতিভা শেষ হয়ে গেল লালনের অভাবে, টাকাপয়সার অভাবে। আর ওদিকে তাঁর বিপুল পৈতৃক সম্পত্তির ওপর ছাতা পড়ছে!

কাদম্বরী জানতে চান, ওঁর বিদেশিনী স্ত্রী এখন ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে কী করে দিন কাটাবেন? তাঁর পাশে তো কেউ দাঁড়াবে না কলকাতায়?

হেনরিয়েটা খুব বিপদে পড়লেন। খাঁটি ফরাসি সুন্দরী, তার ওপর বিপন্না। অনেক ভদ্রলোকবেশী লম্পট ঘুরঘুর করবে তাঁর পেছনে কিন্তু প্রকৃত সাহায্য পাওয়া মুশকিল। সত্যি কষ্ট হয় তাঁর কথা ভাবলে।

আচ্ছা তুমি তাঁর পাশে দাঁড়াতে পারো না? সরল বালিকার মতো কাদম্বরী বলেন।

জ্যোতি বউয়ের থুতনি ধরে নেড়ে দিয়ে বলেন, আচ্ছা, আমাকে ওরকম রূপসি বিধবার কাছে পাঠাতে তোমার একটুও ভয় করবে না? আমি যদি তার প্রেমে পড়ে যাই?

তা হলে আমাকে বিষ খেয়ে মরতে হবে, কাদম্বরী মুখ নিচু করে বলেন।

জ্যোতি শিউরে ওঠেন বালিকাবধূর মুখে এমন কথা শুনে, আর কোনওদিন ঠাট্টা করেও এরকম কথা বলবে না নতুনবউ, তা হলে আমি ভীষণ রাগ করব।

অজানা আশঙ্কায় স্বামীর বুকে মাথা গুঁজে দেন কাদম্বরী। জ্যোতির মনে হয় যেন মহীরূহের গায়ে লবঙ্গলতিকাটি।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে কচি দাম্পত্যের অন্তরঙ্গ দৃশ্যটি দেখে ফেলেন জ্ঞানদা। মনের কোনায় কোথায় যেন খচ করে বেঁধে তাঁর।

বলেন, কী ব্যাপারটা কী, কখন রোদ উঠেছে, এখনও বিছানায় প্রেমালাপ চলছে তোমাদের? নতুনবউয়ের তো বেশ রীতি, আর সবাই কাজে লেগে পড়েছে, তুমি বরের সোহাগের লোভে বিছানায় পড়ে আছ এখনও? জ্যোতিকেও বুঝি কাজ করতে দেবে না?

কাদম্বরী ধড়মড় করে উঠে বসেন, লজ্জায় কাঁটা হয়ে যান মেজোজায়ের বকুনি খেয়ে। কিন্তু জ্যোতি হাসিমুখেই আবাহন করেন জ্ঞানদাকে, এসো

এসে বউঠান, আজ কার মুখ দেখে উঠেছি বলো তো, তোমার তোমার। মনটা ভাল ছিল না, এবার ভাল হয়ে যাবে।

কী কথা হচ্ছিল শুনি? জ্ঞানদা একটু নাক গলিয়ে ফেলেন, এই কচি বউকে নিয়ে কী এত আলাপচারি করে নতুন!

দেখো না বউঠান, কাদম্বরী ভয় দেখাচ্ছে যে আমি অন্য কোনও নারীর কাছে গেলে ও আত্মহত্যা করবে, তুমিই বিচার করো এ-কথা কি ওর বলা উচিত?

জ্যোতির কথা শুনে কাদম্বরী অবাক হয়ে বলেন, ওমা কী মিথ্যে কথা, আমি তো তোমাকে যেতে বললাম, তুমিই অন্য কথা বলছিলে তাই—

জ্ঞানদা বিরক্ত হন, ওমা এইটুকু মেয়ের পেটে পেটে এত? ঠাকুরপো তোমাকে এত ভালবাসে তাও এমন ভয় দেখাচ্ছ? দেওরের কাছ ঘেঁসে রহস্য করে আবার বলেন, তুমি কি ওকে আমার সঙ্গেও মিশতে দেবে না নতুনবউ?

জ্যোতি তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, সেকী কথা মেজোবউঠান. তুমি আমার প্রথম প্রেরণা, বউ তো অনেক পরে এসেছে।

এবার কাদম্বরীর একটু অভিমান হয়. জ্ঞানদাকে বলেন, তোমার সঙ্গে মিশতে বারণ করব এমন সাহস আমার নেই মেজদি। আর সে-কথা বলবই বা কেন, উনি কার সঙ্গে মিশবেন, কীভাবে মিশবেন, সেটা ওঁর ব্যাপার। আমি ওঁর শ্রীচরণে স্থান পেয়েছি এই আমার ভাগ্য!

ওবাবা, মেয়ের তো বোল ফুটেছে। না জ্যোতি এখন আর ওকে এড়িয়ে তোমার সঙ্গে মেশা যাবে না। আমাদের সাহিত্যবাসরে ওকেও ডেকে নিয়ো এরপর, জ্ঞানদার গলায় ঈষৎ শ্লেষ। বউয়ের অধিকার ফলাতে গিয়ে সাহিত্যবাসরে এসে বসলে নতুনবউয়ের সব জারিজুরি বেরিয়ে যাবে, জ্যোতিও নিজের ভুল বুঝবে। সাহিত্যিক হতে চাইলে ওর উচিত ছিল জ্ঞানদার কথামতো শিক্ষিত মেয়ে বিয়ে করা। শুধু রূপসি বলেই স্বামীর কাব্যের প্রেরণা হতে পারবে কি এই পুঁচকে বালিকা।

কিন্তু জ্যোতি বউকে বলেন অন্য কথা, নিজেকে কোনওদিন কারও শ্রীচরণে নামাবে না, এমনকী স্বামীর পায়েও না। নতুনবউ, কখনও ভুলো না, তোমার স্থান আমার হৃদয়ে।

আর আমাকে কোথায় রেখেছ ঠাকুরপো? জ্ঞানদা কৌতুক করে জানতে চাইলেন।

তোমাকে মাথায় করে রেখেছি বুঝতে পার না মেজোবউঠান? জ্ঞানদার মুখের দিকে তাকিয়ে জ্যোতির হঠাৎ মনে হল কাদম্বরীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতায় মেজোবউঠান কি কোনওরকম কষ্ট পাচ্ছেন! কিন্তু তা কেন হবে? বউঠান কি আশঙ্কা করছেন যে দেওর-বউঠানের মধুর সম্পর্কে কাদম্বরী বাধা দেবে? সেরকম ভাবলে তাঁর ভুল ভাঙানো দরকার।

জ্যোতি বলেন, এখন যে ক'দিন জোড়াসাঁকোয় থাকবে তোমরা মেজোবউঠান, সে ক'দিন তোমার সাহচর্যের জাদুতেই গুটিপোকা থেকে প্রজাপতি হয়ে উঠতে পারে নতুনবউ।

জ্ঞানদা কথাটায় যেন খুশি হলেন না, বললেন, সে ভার তো বাবামশায় নীপময়ীকেই দিয়েছেন, নতুনবউ তো দিব্যি কথা বলছে। বাবামশায় যখন আমার ওপর আস্থা রাখেননি, এর মধ্যে আবার আমাকে টানছ কেন নতুনঠাকুরপো? বরং তোমার নতুন লেখা পড়ে শোনাও, আমি তো সকাল সকাল কাজ সেরে তোমার শকুন্তলা কাব্য শুনব ভেবেই এসেছি।

দেওর আর বউঠান কাব্যপাঠে মজে যান। কাদম্বরীর সঙ্গে আর-একটি উৎসুক শ্রোতাও তৃষ্ণার্তের মতো সেই কাব্যসুরা পান করতে থাকেন তাঁদের অলক্ষ্যে, সে জানলার বাইরে থাকা রূপকুমারী।

সারদা খবর পেলেন রূপা নাকি জ্যোতির পিছু পিছু গিয়ে বৈঠকখানায় পুরুষদের আসরে বসে থাকছে আর দিব্যি জমিয়ে গল্পগাছাও করছে।

তার কাণ্ড দেখে বর্ণ একদিন এসে বললেন, মা আর তো পারা যাচ্ছে না তোমার পুষ্যিকে নিয়ে! তার জন্য যে আমাদের বাড়ির মেয়েদের সম্মান ধুলোয় লুটোচ্ছে।

কেন, আবার কী করল সে? সারদার হয়েছে জ্বালা, না পারেন গিলতে, না পারেন ফেলতে মেয়েটাকে। অবাধ্য, বেয়াড়া কিন্তু মনটা স্বচ্ছ সরোবরের মতো। ও যা করে সেটা কেন বারণ তাই সে বোঝে না।

তুমি যেন কিছু জানো না!]বর্ণ রাগ করে, তুমি ওকে যেমন মাথায় তুলছ, আমাদের তো কখনও তেমন স্বাধীনতা দাওনি। ওর বয়স তো অনেক হল মা!

সারদার মাঝে মাঝে বিষণ্ণ লাগে, এ কি তাঁরই ব্যর্থতা! আবার মনে হয় তা কেন, এতগুলো হিরের টুকরো ছেলেমেয়ে তাঁর, রূপা যে রক্তসম্পর্কের

না তাই বোধহয় শোধরাতে পারলেন না। তিনি বললেন, কেন রে, সাহিত্যের আসরে তো স্বর্ণও যায়, মেজোবউমাও যায়, রূপা গেলেই বা দোষ কী?

এবার সৌদামিনী মাকে বোঝাতে নামলেন, মা স্বর্ণ বা মেজোবউঠানের সঙ্গে কি ওর তুলনা হয়? রূপা সাহিত্যের কী বোঝে? তা ছাড়া ও তো সাহিত্যের টানে যায় না, ওর আকর্ষণ যুবক ছেলেরা। রূপা তাদের সকলের সঙ্গে কীরকম ইয়ারদোস্তের মতো মেশে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আমি পরদার আড়াল থেকে দেখেছি, হ্যারি নামে একটি সাহেবের সঙ্গে সারাক্ষণ ফুসফুস করছে, হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

মানদা দাসী কত্তামার জন্য পান সেজে রুপোর পাত্রে রাখছিল। সে আর চুপ করে থাকতে পারে না, বকুনি খাবে জেনেও বলে ওঠে, কী ঢলাঢলি, কী ঢলাঢলি মা গো! দেখলে মনে হবে বাইজিপাড়ার মেয়ে।

ছিঃ, চুপ কর মানদা। কত্তামা ধমকে ওঠেন। সব কথায় কথা বলিস না। পান দে একটা।

কথা শেষ হতে না হতেই রূপকুমারী ছুটে এসে ধুপ করে সারদার পায়ের কাছে বসে পড়ে। তাকে দেখে সবাই চুপ।

সারদা তার চুলের মুঠি ধরে জিজ্ঞেস করেন, মুখপুড়ি, তুই কি আমায় শান্তিতে থাকতে দিবি না? সারাদিন তোর নামে সবাই নালিশ করে কেন? আর সব মেয়েদের মতো লক্ষ্মীমন্ত হতে পারিস না তুই? কাল সকালে উঠে যার মুখ দেখব তার সঙ্গেই তোর বিয়ে দিয়ে দেব।

রূপা হেসে গড়িয়ে পড়ে, মা, তা হলে তো কোনও মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে হবে, বাইরে না বেরলে তুমি ছেলেদের মুখ দেখবে কোত্থেকে?

ধন্যি মেয়ে বাবা, সৌদামিনী বলেন, আমরা তোকে নিয়ে জেরবার হয়ে যাচ্ছি আর মেয়ের কোনও হুঁশ নেই? না, হাসির কথা নয়, এবার সত্যিই রূপার বর খুঁজতে হবে, বয়স তো তেরো-চোদ্দো হল।

রূপা আদুরে গলায় বলে, আমি বিয়ে করবই না।

সারদা এবার কঠোর হয়ে বলেন, না করতে চাইলে জোর করে বিয়ে দেব। তোকে বিদেয় না করে আমি মরেও শান্তি পাব না।

তা হলে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাব, পালাবই। স্থির সিদ্ধান্ত জানায় রূপকুমারী।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে হঠাৎই একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। সারদাসুন্দরী বেড়াতে গিয়েছিলেন পেনেটির বাগানে, সেখানেই তাঁর হাতের ওপর ভেঙে পড়ল লোহার সিন্দুকের ভারী ডালা। তড়িঘড়ি তাঁকে বাড়ি আনা হল। হাতে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে শয্যাশায়ী হলেন গৃহলক্ষ্মী। প্রথমে আর্নিকা ও মলম দিয়ে সারানোর চেষ্টা ব্যর্থ হল। তারপর বাড়ির ডাক্তার ডা. নীলমাধব হালদার এবং মেডিকেল কলেজের সার্জারির অধ্যাপক ডা. প্যাট্রিজ তাঁকে চিকিৎসা করলেও সারাতে পারলেন না। পরপর অনেক ডাক্তার এলেন গেলেন। ভেতরে লোহার টুকরো ঢুকে গিয়েছে। একবার অস্ত্রোপচার করে লোহা বার করার পরেও ব্যথা কমল না।

ঠিক এসময়েই দেবেন ঠাকুর বাড়িতে অনুপস্থিত। রবিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বেড়াতে গেছেন ডালহৌসি পাহাড়ে। দু'মাসের মধ্যেও সারদার রোগ না সারায় তাঁকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে। সংবাদ পেয়ে চিঠিতে, টেলিগ্রামে পরামর্শ দিতে লাগলেন উদ্বিগ্ন মহর্ষি।

শেষে মেডিকেল কলেজের পাঁচজন বিশিষ্ট সাহেব ডাক্তারের বোর্ড বসল সারদাদেবীর রোগ সারাতে। তাঁদের প্রত্যেকের ভিজিট বত্রিশ টাকা। তাঁদের পরামর্শ অনুসারে ক্ষতস্থানের মাংস কেটে বাদ দিয়ে ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে। এরকম চিকিৎসার কথা আগে বিশেষ শোনা যায়নি। সাহেবদের মাথা থেকেই এ-সব উদ্ভট চিকিৎসা বেরিয়েছে। কিন্তু কথা হল কার দেহ থেকে মাংস কেটে সারদার অঙ্গে লাগানো হবে, একমাত্র পরিবারের রক্তসম্পর্কের কেউ যদি এগিয়ে আসেন তবেই সারদা রাজি হবেন নয়তো বিনা চিকিৎসায় থাকবেন তাও ভাল।

বাবামশায় বাড়ি নেই। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে এলেন সেজো ছেলে হেমেন। সন্তানের অঙ্গ থেকে নতুন মাসমজ্জা লাগল গর্ভধারিণীর দেহে।

তবুও ব্যথা কমে না। সারদা অধীর হয়ে ওঠেন। অসুখও সারে না, কত্তামশায়ও ফেরেন না। তাঁকে একবার দেখতে বড্ড সাধ হচ্ছে। কী জানি আবার দেখা হবে কি না? তাঁর অনুরোধে বাবামশায়কে ফিরে আসার জন্য চিঠি পাঠান হেমেন।

মহর্ষি তখন রবিকে নিয়ে ডালহৌসি পাহাড় থেকে সমতলে নেমেছেন, তাঁর ইচ্ছা এবার অমৃতসরে কিছুদিন বসবাস করে আস্তে আস্তে কলকাতার দিকে পা বাড়াবেন।

শীতের শুরুতে ব্যথা বাড়লে হাওয়া বদলের জন্য গঙ্গায় বোট ভাড়া করে মাকে সেখানেই রাখলেন হেমেন্দ্রনাথ। বাড়ির বন্ধ চার দেওয়ালে চিরদিন বাস করে এখন এই নৌকোয় যেন মুক্তির আনন্দ পাচ্ছেন সারদাসুন্দরী। এই নৌকোটি যেন তাঁর একান্ত নিজের। এখানে তিনি আর ব্রহ্মোপাসনা করেন না, নৌকোঘরের এক কোণে লক্ষ্মীজনার্দনের নাম করে দুটি ঘট স্থাপন করেছেন। মানদা দাসীকে বলা আছে টাটকা ফুল বেল পাতা এনে দিতে, তিনি স্নান করে গঙ্গাজলসহ ওই নৈবেদ্য ঘটে নিবেদন করেন রোজ।

একদিন হেমেন এসে খবর দিলেন, মা, বাবামশায় ফিরে আসছেন শিগগিরই, টেলিগ্রাম করেছেন।

স্বস্তির শ্বাস ফেলে হাত মাথায় ঠেকান সারদা। গৃহদেবতা তাঁর কথা শুনেছেন, কত্তার সঙ্গে দেখা না হলে যে তাঁর মরেও শান্তি নেই।

বাড়ির ডাক্তার দ্বারিকানাথ গুপ্ত রোজ বোটে এসে তাঁকে পরীক্ষা করেন। মেয়ে-বউমারা রোজ দেখা করতে আসেন, কেউ কেউ সঙ্গে থেকেও যান। সবাইকে দেখে আনন্দ পান শুধু প্রফুল্লময়ী এলেই সারদার বড় কষ্ট হয় তার মুখের দিকে তাকিয়ে। ওর জন্য কিছু করে যেতে পারলেন না তিনি। কচি বয়সে ছেলে নিয়ে বিধবা হয়েছে, সারাজীবন নিরানন্দে কাটাতে হবে মেয়েটাকে। বীরেনের মৃত্যুশোক তিনিই কাটিয়ে উঠতে পারেননি, তো ও বেচারার কী অবস্থা!

মাসখানেকের মধ্যেই দেবেন ঠাকুর জোড়াসাঁকো ফিরে এলেন। পথে কিছুদিন অবশ্য রবিকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে এসেছেন তিনি। যাওয়া-আসার পথে এভাবেই তিনি প্রকৃতি উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারি পরিদর্শন করে নেন।

মহর্ষি ফিরে এলে সারদা বোট থেকে ঘরে ফিরলেন। তেতলার ঘরে এতদিন পরে স্বামীকে দেখে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁর মাথায় হাত রাখেন, এই তো আমি এসেছি, ভয় কী সারদা? এখন তোমার কাছেই থাকব।

কত্তার হাত জড়িয়ে ধরে সুখের কান্না কাঁদতে থাকেন সারদা, এবার না এলে আর আপনার দেখা পেতাম না। আর বোধহয় বাঁচব না আমি।

দেবেন সান্ত্বনা দিলেন, কে বলেছে বাঁচবে না? তোমার এখনও পঞ্চাশ হয়নি গিন্নি, এখন কোথায় যাবে? আমি নিজে দাঁড়িয়ে চিকিৎসা করাব, দেখি অসুখ সারে কি না!

সত্যি যেন প্রাণে নতুন জোয়ার এল সারদার। আগের তুলনায় তিনি এখন অনেক সুস্থ। ব্যথা আছে কিন্তু তাঁর সহ্য করার শক্তি যেন অনেক বেড়েছে। মাঝে মাঝে সকালের রান্নার জোগাড়ের সময় বা বিকেলের চুল বাঁধার আসরেও বসতে শুরু করলেন।

হিমালয় থেকে ফিরে রবি যেন অনেক বড় হয়ে গেছেন। বড়রা তাঁকে সম্মান দিচ্ছেন, মা তাঁকে ডেকে ডেকে হিমালয়ের গল্প শুনতে চাইছেন প্রায়দিনই। অন্তঃপুরের বন্ধ দরজা খুলে গেছে কী এক আশ্চর্য ফুসমন্তরে। সবাই তাঁর কাছে বেড়ানোর গল্প শুনতে চায়, বিশেষ করে নতুনবউঠান। রবি যেন একটি ভ্রমণকাহিনির খোলা পাতা।

সারদা তাঁর তেতলার ঘরে রবিকে ডেকে পাঠিয়ে জানতে চান, হ্যাঁ রে রবি, তোরা যে এত পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলি, তোর বাবামশায় ঠিকঠাক খাওয়াদাওয়া করতেন তো?

রবির একটু অভিমান হয়, মা কি শুধু বাবামশায়ের কথাই জানতে চান, আমার খাওয়াদাওয়ার খোঁজ নেবেন না? কিন্তু মা তো এরকমই। তবু তিনি যে ডেকে পাঠিয়ে এত কথা শুনছেন তাতেই আনন্দে বুক ভরে ওঠে রবির।

তিনি সোৎসাহে বলেন, মা রোজ সকালে বেরোনোর আগে আমরা পেট ভরে দুধরুটি খেয়ে নিতাম। তারপর ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে বেরিয়ে পড়া। উফ! সে যে কী অপূর্ব সুন্দর, না দেখলে বোঝানো যাবে না। আমি বড় হয়ে তোমাকে নিয়ে যাব মা।

হায় রে রবি, তুই যখন বড় হবি আমি কি তখন থাকব রে? সারদা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

রবি আকুল হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরেন, তুমি কোথায় যাবে মা, কোত্থাও যেতে দেব না। আমি শিগগির বড় হয়ে যাব.

আমার যে অসুখ করেছে রবি। আর বোধহয় বেশিদিন তোদের কাছে থাকতে পারব না। সারদা রবির মাথায় হাত রেখে বলেন, তুই এইরকম তোর বাবামশায়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকিস, তা হলেই তোর ভাল হবে। পাহাড়ের মতো বড় হবি তুই।

রবি মায়ের রুগ্ণ দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁকড়ে ধরে বলেন, না মা, তুমি থাকবে। ছোটবেলায় তোমার কাছে আসতে পারতাম না। এখন

তুমি আমাকে ডেকে নিয়েছ, আর কোথাও যাবে না। আমি তোমাকে পালকি করে তেপান্তরের মাঠে নিয়ে যাব একদিন।

সারদা হাসেন, এই ছেলেটা এখনও ছেলেমানুষ। তুই একা একা আমাকে নিয়ে কোথায় যাবি? যদি ডাকাত ধরে?

ডাকাত? আসুক না, আমি যুদ্ধ করে তাড়িয়ে দেব। রবি একটা লাঠি হাতে নিয়ে তলোয়ারের মতো ঘোরাতে ঘোরাতে বলে, দেখো মা, আমি বীরপুরুষ! ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছি।

সারদা মজা করে বলেন, যাস নে খোকা ওরে! আমি যে ভয় পাচ্ছি! এত লোকের সঙ্গে লড়াই কী করে করবি?

রবি অনেকক্ষণ লড়াইয়ের ভঙ্গিতে তলোয়ার ঘোরায়। ছেলের খেলার যুদ্ধ দেখতে মজা পান সারদা, নিজেও যেন তার সঙ্গী হয়ে গেছেন। ব্যথার কথাও সাময়িকভাবে ভুলে গেছেন তিনি।

রবি অনেক যুদ্ধের পর ক্লান্ত হয়ে ঘাম মুছতে মুছতে মায়ের সামনে এসে বলেন, দেখো, লড়াই গেছে থেমে। আমিই জিতেছি। আর তোমার ভয় নেই।

সারদা কষ্ট করে উঠে বসেন। রবিকে বহুদিন পরে কোলে টেনে নিয়ে চুমু খেয়ে বলেন, ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল, কী দুর্দশাই হত তা না হলে!

আরও বেশ কিছুদিন ক্ষুদ্র ভ্রমণকারীটি মায়ের কাছে এবং অন্দরের ঘরে ঘরে হিমালয় বেড়ানোর গল্প বলে আদর কাড়তে লাগল। স্বাধীনতার মাত্রাও বেড়ে গেল। চাকরদের শাসন এবং ইস্কুলের বন্ধন শিথিল হয়ে এল। বাড়ির দাদা দিদিদের সঙ্গে গান ও সাহিত্যের মজলিশে ঢুকে পড়তে লাগলেন কিশোর রবীন্দ্রনাথ। জ্যোতির আর কাদম্বরীর প্রেমঘন কাব্যসভায় নতুন কবিদের চর্চা হয়। নতুনবউ তখন বিহারীলালের কবিতার ভক্ত হয়ে উঠেছেন, প্রায়ই কবির সারদামঙ্গল কাব্য মুখস্থ বলছেন, আর সেই অমৃতসুধা পানের আশায় তাঁর পিছু পিছু ঘুরতে থাকেন রবি। সমবয়সি দেওর ও বউঠানের মধ্যে খেলার সঙ্গীর মতো খুনসুটি চলতে থাকে। জ্যোতির কাছে যা যা শেখেন কাদম্বরী, তাই আবার রবিকে শেখাতে চান। জ্যোতির প্রিয়শিষ্যা তিনি আর রবি তাঁর ছায়াশিষ্য।

ঠাকুরবাড়ির ঘরে ঘরে তখন সাহিত্যের নবজোয়ার। দ্বিজেনের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কবিতাটি সকলের প্রশংসা পেয়েছে। সত্যেন ও জ্ঞানদা এলে তাঁদের ঘরেই

আজকাল শহরের বিশিষ্ট কয়েকজন সাহিত্যিক আসর বসান। জ্যোতি ইতিমধ্যেই একজন প্রতিষ্ঠিত কবি ও নাট্যকার। অন্ধকারে চাঁদের উদয়ের মতো স্বর্ণকুমারীর জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ছে। এইসব উদ্ভাসে পাগল পাগল লাগে কিশোর রবির, তিনি কবিতারসে মাতাল হতে থাকেন ক্রমশ।

জ্যোতি ও দ্বিজেন ঠিক করে ফেললেন সামনের বসন্তে ঠাকুরবাড়িতে একটি বিদ্বজ্জন সমাবেশ করা হবে। দেশের সন্ধিক্ষণে ঠাকুরবাড়িকেই নিতে হবে অগ্রণী ভূমিকা। সবাই মেতে উঠলেন তার প্রস্তুতিতে।

সারদার শরীর কিছুটা ভাল থাকায় দেবেন ঠাকুরও নিশ্চিন্ত হয়ে পৌষের এক সন্ধ্যায় সদলবলে ব্রাহ্মসমাজে এলেন। ছেলেদের মধ্যে দ্বিজেন ও জ্যোতি এবং জামাই বন্ধু আত্মীয়স্বজন মিলে বেশ বড় দল। তাঁদের যোগদানে সেদিন ব্রহ্মসংগীত বেশ জমে উঠল। জ্যোতি ও দ্বিজেনের উদাত্ত গলার গানে যেন নতুন জোয়ার এল ব্রাহ্মদের দলটিতে। উপাসনার সময় দেবেন আজ শুধু স্ত্রীর আরোগ্য কামনা করলেন। সারদা অসুস্থ থাকলে ঘরে মন বসে না তাঁর। গৃহকে গৃহ মনে হয় না।

কিছুদিনের মধ্যেই উচাটন কাটাতে শিলাইদহে জমিদারি দেখতে গেলেন তিনি। সারদাও ঘরবন্দি না থেকে গঙ্গাবক্ষের মনোরম বাতাসে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু স্বামীর অনুপস্থিতিতে আবার তাঁর শরীর খারাপ হতে শুরু করল। এবার শুরু হল তুকতাক। এক হাতুড়ে আচার্যিনীর পরামর্শে তেঁতুলপোড়া বেটে ক্ষতের চারপাশে লাগানোয় ক্ষত বিষাক্ত হয়ে পেকে উঠল। এবার বোধহয় আর বাঁচবেন না। সারদা ভাবলেন, শেষ ক'টাদিন বাড়িতে কাটানোই ভাল।

রবির আবদারে বাড়িতে কয়েকদিন বালকদের ঘরের একপাশে বিছানা করে থাকছিলেন সারদা। অসুখ বেড়ে যেতে তেতলার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। ক্রমশ বিছানা থেকে ওঠার শক্তি হারালেন। বেডসোর থেকে বাঁচানোর জন্য উইলসন হোটেলের দোকান থেকে হাওয়া-বালিশ আনা হয়েছে। রোজ সেই বাতাসের বিছানা-বালিশে হাওয়া ভরার জন্য গাড়ি করে একজন লোক পাঠাতে হয়।

খবর পেয়ে বিষণ্ণ হয়ে পড়েন দেবেন্দ্রনাথ। সারদাকে কি আর ধরে রাখা যাবে না সত্যিই? গিন্নি না থাকলে বাড়ির প্রতি টানটুকু ধরে রাখাই মুশকিল হয়ে যাবে এরপর।

বাড়িতে কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেছে। সবাই ভাবছেন কর্তামশায় শিলাইদহ থেকে ফিরে এসে দেখতে পাবেন তো কর্তামাকে?

সারদা কিন্তু নাড়ি ছেড়ে যায় যায় অবস্থাতেও বললেন, তোরা ভাবিস না, কত্তার পায়ের ধুলো না নিয়ে আমি মরব না।

ঠিক তাই হল। দেবেন ফিরে এলেন জোড়াসাঁকোয়। সোজা চলে এলেন স্ত্রীর তেতলার ঘরে। সারদা অতি কষ্টে হাত বাড়িয়ে কর্তার পা ছুঁয়ে বললেন, আমি তবে চললাম। আর জন্মে আবার দেখা হবে।

ঘরভরা ছেলেমেয়ে বউ নাতিনাতনি, দাসদাসীর সামনে স্বামীর আশীর্বাদ নিয়ে চোখ বুজলেন সারদাসুন্দরী। ব্রাহ্মঘরের কোনও এক বউ মরদেহকে প্রণাম করে যেন গোঁড়া হিন্দুদের মতো বলে উঠলেন, আহা, শাখা সিন্দূর নিয়ে চলে গেলেন সৌভাগ্যবতী।

চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ছাদে চলে গেলেন দেবেন্দ্রনাথ।

শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় আবার নেমে এলেন। চিরসঙ্গিনীর দেহে নিজের হাতে ফুল চন্দন ছিটিয়ে স্বগতোক্তি করেন, 'ছয় বৎসরের সময় এনেছিলেম, আজ বিদায় দিলেম।'

সত্যেন মাকে শেষদেখা দেখতে পাননি। খবর পেয়ে সাতদিনের মাথায় জ্ঞানদাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। জীবিত সব পুত্রকন্যাবধূর উপস্থিতিতে ব্রাহ্মমতে মহাসমারোহে তাঁর শেষ কাজ হয়ে গেল। সারদার মৃত্যুতে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে একটি যুগের অবসান ঘটল।

বারবাড়িতে শুরু হল নতুন একটি যুগ। মাসখানেক পরে শোক কাটিয়ে উঠে সারদার ছেলেরা বাড়িতে বিদ্বজ্জনসমাগম ঘটিয়ে ফেললেন। সত্যেন এখানে থাকায় সভার আয়োজন হল সর্বাঙ্গসুন্দর। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু প্যারীচরণ সরকার ইত্যাদি বহু লেখক সম্পাদক গুণীজনে গমগমে সেই সভায় দ্বিজেন তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য পাঠ করলেন আর জ্যোতি পড়লেন নিজের নাটকের একটি অঙ্ক। কিন্তু গোলমাল বাধল প্যারীমোহন কবিরত্ন যখন ইংলন্ডেশ্বরীর প্রতি নিবেদিত একটি গানে স্বদেশির সঙ্গে বিলিতি দ্রব্যের বিনিময়ে ভারতের সর্বনাশের কথা বললেন। অনেকে তাঁর সঙ্গে একমত না হওয়ায় তর্ক শুরু হয়ে গেল। সেখানে প্রায় শ'খানেক বাঙালি বুদ্ধিজীবী জড়ো হয়েছেন, সবাই

তো কোনও বিষয়েই একমত হবেন না।

শেষে সত্যেন সংগীত শুরু করিয়ে দিতে হট্টগোল থামল। ঠাকুরবাড়ির বালক কিশোরেরা অনেকদিন ধরে মহড়া দিয়ে প্রস্তুত হয়েছে। তর্কের অবসানে গানের চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে!

এই অনুষ্ঠানটি রবির পক্ষে খুবই আনন্দের। যাঁদের লেখা পড়তে শুরু করেছেন, যাঁদের কথা বারে বারে শুনেছেন, তাঁরাই সশরীরে একেবারে ঘরের মধ্যে উপস্থিত! তাঁদের উৎসাহ পেয়ে মনে তাঁর খুশির বাধ ভাঙল যেন।

এই সভায় মেয়েদের নিমন্ত্রণ জানানো হয়নি। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎই কালো চাদরে মুখ ঢাকা দু'জন নারী আসরে এসে বসলেন। সৌজন্যবশত পুরুষেরা কেউ তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞেস করতে পারছেন না অথচ কৌতূহল হচ্ছে।

কেউ জানতে চান, মেয়েদুটি সত্যি মেয়ে তো?

আবার আর-একজন ফিসফিস করে বলেন, মুসলমানি মেয়েরা তো এভাবে বেরতেই পারে না? মেয়ে না কি হিজড়ে?

জ্যোতির কাছে সবাই জানতে চান। তাঁর অবশ্য সন্দেহ হয় স্বর্ণ দুষ্টুমি করছে না তো কাউকে জুটিয়ে নিয়ে? সে আসতে চেয়েছিল কিন্তু অনুমতি দেওয়া হয়নি দু'-চারজন রক্ষণশীল আপত্তি জানানোয়। নিজেদের বাড়িতে প্রথমবার সমাগম করতে গিয়ে কোনও বাধা আসুক তা জ্যোতি চাইছিলেন না। পরের বার নিশ্চয় মেয়েরাও আসবে। কিন্তু মেয়েদুটি কারা?

ঘোমটার নীচে মেয়েদুটি হাসিগল্পে মশগুল। জ্যোতিরিন্দ্র কায়দা করে ওঁদের পরিচয় জানার জন্য রবিকে পাঠালেন।

রবি ওঁদের সামনে গিয়ে জ্যোতিদাদার শেখানো কথাটাই বললেন, আপনারা যদি নিজেদের পরিচয় দিয়ে কোনও আলোচনায় অংশ নেন, আমরা খুব খুশি হব।

মেয়েরা রবিকে পাত্তা দেয় না। হাত নেড়ে চলে যেতে বলে, কিন্তু রবি নাছোড়বান্দা তাঁকে একটা গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তিনি বারবার নানাভাবে ওদের নাম জানতে চান।

রবির জ্বালাতনে অতিষ্ঠ হয়ে একটি মেয়ে বলে ওঠে, জ্যোতিদাদাকে বল আমরা সখীসমিতি।

রবি জানতে চান, দু'জনেরই এই নাম?

মেয়েটি বলে, দু'জনে মিলে এই নাম। বুঝলি গবেট! যা জ্যোতিদাদাকে বল আর আমাদের নিস্তার দে। সবাই হাঁ করে দেখছে।

রবির এবার চেনা চেনা লাগে গলাটা, তিনি উত্তেজিত হয়ে বলেন, বুঝেছি, তুমি তো স্বর্ণদিদি। স্বর্ণ তাড়াতাড়ি রবির মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেন, চুপ চুপ।

তা হলে বলো, তোমার সঙ্গে উনি কে? রবি ছাড়ার পাত্র নয়। না বললে চিৎকার করব। সবাইকে বলে দেব তোমরা লুকিয়ে লুকিয়ে এসেছ।

আরে আমি রূপা। এবার চুপ করো রবিদাদা। আমরা লুকোচুরি খেলছি বিদ্বজ্জনের সঙ্গে।

সখীসমিতিকে ঘোমটার মধ্যে হেসে গড়াগড়ি খেতে দেখে এবার রবিও হাসতে থাকেন। তিনিও যেন ওদের লুকোচুরি খেলার সঙ্গী হয়ে যান।

উৎসুক দু'-একজন প্রশ্ন করলে রবি বলেন, সে একটা গুহ্যকথা, সবাইকে বলা বারণ। শুধু জ্যোতিদাদাকে বলা যাবে।

উৎসবের শেষে খাওয়াদাওয়াটি অতি চমৎকার হলেও সবাই মনে একটা প্রশ্ন নিয়ে ফিরে গেলেন। রহস্যটা জানা হল না, কিন্তু জানতেই হবে মেয়েদুটি কে?

সভা যখন ভঙ্গ হল দেবেন্দ্রনাথ তখন অনেক দূরের এক পাহাড়চূড়ায় সূর্যাস্ত দেখছেন।

৭

হেকেটি ঠাকরুন

১৮৭৬-এ ইংলন্ডের রানি ভিক্টোরিয়া ভারতসম্রাজ্ঞী উপাধি নিয়ে সাড়ম্বরে সে-কথা ঘোষণা করলেন কলকাতায়। এদিকে ঠাকুরবাড়িতে সারদার মৃত্যুর পর বিরাট সংসারের ভার কাঁধে তুলে নিলেন তাঁর বড় মেয়ে সৌদামিনী আর অন্যদিকে মাতৃহারা রবিকে খাইয়ে পড়িয়ে, কাছে টেনে নিলেন কাদম্বরী। নতুনবউঠানের এই আন্তরিক চেষ্টার মধ্য দিয়েই নারীর কোমলতার প্রথম স্বাদ পাচ্ছেন রবি।

মেজোবউঠান বোম্বাই থাকায় জ্যোতিও এখন স্ত্রীর প্রতি পুরোপুরি মনোযোগী ও নির্ভরশীল। দুই তেজি নারীর অনুপস্থিতিতে ঠাকুরবাড়ির অন্দরে নতুন তারকার মতো ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছেন কাদম্বরী। তেতলার ছাদের ওপর তাঁর ঘর ও বাগান হয়ে উঠল জ্যোতির গান ও কবিতার কর্মশিবির। আর রবি সেই ঘরে সর্বক্ষণের অতিথি। জ্যোতি আর কাদম্বরীর উৎসাহে এখন বাড়িতে অন্দরমহলের পরদা যেন উঠে গেছে। জীবনের প্রথম দশবছর বাড়ির রূপরসগন্ধ আনন্দ-বেদনার মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন রবি বুভুক্ষের মতো গৃহসুখ আকণ্ঠ পান করতে লাগলেন।

নতুনবউঠানের পুতুলের বিয়েতে প্রধান নিমন্ত্রিত রবি। কাদম্বরীর হাতে চিংড়িমাছের চচ্চড়ির সঙ্গে লঙ্কামাখা পান্তাভাতের আয়োজনই হয়ে ওঠে অসাধারণ।

পরের দিন ঘরের সামনে বউঠানের চটিজোড়া দেখতে না পেয়ে মুখ গোমড়া হয়ে যায় রবির, নিশ্চয় তাঁকে না বলে কোথাও নেমন্তন্ন রাখতে গেছেন! ফিরে আসতেই পুতুলের গয়না লুকিয়ে সেই ছুতোয় ঝগড়া শুরু করেন রবি, আমি কি তোমার চৌকিদার, তুমি না থাকলে তোমার ঘর কে সামলাবে?

কাদম্বরী হেসে বলেন, তোমাকে সামলাতে হবে না রবি, তুমি নিজের হাত সামলাও।

কখনও ছাদের ওপর ডাল বেটে বড়ি দেওয়া হয়েছে, আমসত্ত্ব শুকোচ্ছে। শীতের দুপুরে মাদুরে চুল এলিয়ে আলস্য করে পাহারা দিচ্ছেন বউঠান, সঙ্গে রবি।

ছাদের ঘরে যেদিন পিয়ানো এনে বসিয়ে দিলেন জ্যোতি, সেদিন যেন উৎসব। পিয়ানো বাজাচ্ছেন জ্যোতি আর সুরে কথা বসিয়ে গান গেয়ে উঠছেন রবি। বারো বছরের ছোট ভাইকে সব বিষয়েই প্রশ্রয় দেন জ্যোতিরিন্দ্র, রবির মধ্যে তিনি প্রতিভার ছটা দেখেছেন।

কিন্তু কাদম্বরী তা মানতে নারাজ। রবির সঙ্গে খুনসুটি করে প্রায়ই বলেন, তোমার মধ্যে বিশেষত্ব তো কিছুই দেখছি না রবি। না রূপে না গুণে।

রবি বলেন. আমার গুণ না হয় তুমি চিনতে পারছ না বোঠান, চেহারাটাও কি তোমার চোখের বালি?

কাদম্বরী রহস্য করেন, না রবি ঠাকুরপো, তোমার দাদাদিদিদের তুলনায় তোমার নাকটা বেশ বোঁচা।

না হয় নাক বোঁচাই হল, তা বলে আমি কি দেখতে খারাপ? রবিও উসকে দিয়ে নিজের চেহারার কথা শুনতে চান বউঠানের মুখে।

গায়ের রং ময়লা, মা এত রূপটান মাখিয়েও রং ফেরাতে পারেননি। কাদম্বরী চোখ নাচিয়ে বললেন।

পুরুষের আবার রং লাগে নাকি বোঠান? ইংরেজি সাহিত্যে পড়ছ না টল ডার্ক হ্যান্ডসাম নায়কদের গুণগান! রবি এবার টক্কর দিয়েছেন।

কাদম্বরী ঠেস দেন, ইস! খুব নায়ক সাজার শখ না? কীসে নায়ক হবে, কবিতা লিখে? পারবে বিহারীলালের মতো কবিতা লিখতে?

রবি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন, পারতেই হবে, বউঠানের কাছে একদিন না একদিন নিজেকে প্রমাণ করবেন তিনি। কাদম্বরীর ছুড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জ থেকেই রবির ছোট নীলখাতাটি ভ'রে উঠতে থাকে কবিতায় কবিতায়।

সারাদুপুর কবিতা আর পিয়ানো চর্চার পর দিনের শেষে ছাদের ওপর পাতা হয় মাদুর আর তাকিয়া। রুপোর রেকাবিতে বেলফুলের গোরে মালায় জল ছিটিয়ে রেখে দিলেন কাদম্বরী, পিরিচে বরফ দেওয়া জল আর বাটায় ছাঁচিপান।

গা ধুয়ে, খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়িয়ে এক-এক দিন এক-এক রঙের নয়নসুখ বা বেগমবাহার তাঁতের শাড়ি পরে কাদম্বরী এসে যখন মাদুরের ওপর বসেন, রবির মনে হয় যেন স্বয়ং সরস্বতী নেমে এসেছেন। ফরাসি পারফিউমের গন্ধে ম ম করে ওঠে সন্ধ্যার বাতাস।

জ্যোতি আসেন ধুতি বা পাজামার ওপর গায়ে পাতলা একটি উড়নি জড়িয়ে, অল্প আতর মেখে। রবি আসেন গলায় গান নিয়ে, যদিও তাঁর গানকে বিশেষ মূল্য না দিয়ে বউঠান উৎসুক থাকেন জ্যোতির কণ্ঠসুধার জন্য।

ঠাকুরবাড়ির সবচেয়ে রূপবান গুণবান যুবকটিকে স্বামী হিসেবে পেয়ে নিজেকে রূপকথার রাজকন্যে মনে হয় কাদম্বরীর। প্রথম প্রথম তাঁর ভয় ছিল স্বামীর যোগ্য হতে পারবেন কি না। জ্যোতি যদি তাঁকে উপেক্ষা করতেন, আত্মহত্যা করবেন ভেবে রেখেছিলেন কাদম্বরী। বিশেষত মেজোজা জ্ঞানদানন্দিনী বিয়ের আগে থেকেই অযোগ্য বলে তাঁকে যেরকম অপছন্দ করতেন তাতে কাদম্বরী ভয় পেয়েছিলেন।

কিন্তু জ্যোতির আদরে সোহাগে তিনি এখন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী রমণী। পড়াশোনা ও কাব্যপাঠের পাশাপাশি তিনি মন দিয়ে ঘরকন্নাও করেন। অতি সাধারণ পদও তাঁর রান্নার গুণে অসাধারণ হয়ে ওঠে। আবার ছাদের ওপর তাঁর নিজের হাতে সাজানো বাগানটিও দেখার মতো। কিনারায় সারি সারি লম্বা পামগাছ। আশেপাশের টবে চামেলি, গন্ধরাজ, করবী, দোলনচাঁপা। ছাদের ভোল পালটে গেছে কাদম্বরীর হাতে।

বাড়ির মেয়েরা কেউ কেউ অবশ্য সেরেস্তার সামান্য কর্মচারীর মেয়ে বলে এখনও তাঁকে অবজ্ঞা করেন কিন্তু কাদম্বরী আর গ্রাহ্য করেন না। প্রেমিক স্বামী ও লক্ষ্মণ দেওর নিয়েই তাঁর দিন বেশ ভরপুর হয়ে ওঠে।

মাঝে মাঝে শিলাইদহের জমিদারি দেখতে চলে যান জ্যোতি, কখনও কখনও নিজের লেখা নাটকের রিহারসালে আটকে গিয়ে বাড়ি ফেরা হয় না, তখন কাদম্বরীর বড় একলা লাগে আর সেই বিরহিণী বউঠানের মনোরঞ্জনের আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন রবি।

পরদা উঠে গিয়ে আজকাল ছাদের আড্ডায় জ্যোতির সঙ্গে প্রায়ই চলে আসেন কবি অক্ষয় চৌধুরী। কিছুদিন আগেও ঠাকুরবাড়ির অন্দরে নারীপুরুষের এমন খোলামেলা আসরের কথা ভাবা যেত না। অক্ষয় আবার কাদম্বরীকে মুগ্ধ

করার জন্য গাইয়ে হওয়ার চেষ্টাও করছেন, যদিও তাঁর গলায় একফোঁটা সুর নেই। তিনি হাতের কাছে একটা মোটা বাঁধানো বই পেয়ে সেটাকেই তবলায় রূপান্তরিত করলেন। গান শুরু হতেই জ্যোতি আর কাদম্বরী চোখে চোখে হাসেন।

জ্যোতি বললেন, অক্ষয়, গান থাক না, আজ একটা কবিতা পড়ে শোনাও। কাদম্বরী কতদিন তোমার কবিতা শোনেনি।

অক্ষয় বিগলিত নয়নে কাদম্বরীর দিকে তাকিয়ে বলেন, সত্যি শুনবেন বউঠান? আমি ক'দিন ধরে নতুন বর্ষা-কবিতাগুচ্ছ লিখেছি, আপনাকে না শোনালে সেই বর্ষাজলধারা ঠিক প্রাণ পাচ্ছে না।

নিজের লেখা ছাড়াও অক্ষয়চন্দ্র 'আইরিশ মেলোডি' কাব্যগ্রন্থ থেকে উদাত্ত স্বরে আবৃত্তি করে মুগ্ধ করে দিতেন রবিকে। পড়ার বইয়ের শুকনো পাতায় যা পাওয়া যেত না, সেই নিত্যনতুন কাব্যরসের সন্ধান মিলত তাঁর উৎসাহে। রবি এ-সব কবিতাগুলি বাংলায় অনুবাদ করে কখনও জ্যোতি কখনও অক্ষয়কে শোনাতে শুরু করলেন। এভাবেই ভরে উঠছিল তাঁর 'মালতীপুঁথি'র পৃষ্ঠাগুলি। দাদাদের কাছে কিশোরকবি যতটা গুরুত্ব পাচ্ছিলেন কাদম্বরী অবশ্য সমবয়সি দেওরকে তা দিতে রাজি নন।

রবির সঙ্গে কাদম্বরীর একদিন তর্ক বেধে যায় পাখি পোষা নিয়ে। ধনীঘরের বউ-মেয়েরা আজকাল বারান্দায় খাঁচায় পাখি ঝুলিয়ে রাখেন। খাঁচার কোকিলের ডাক শুনলে রবির অসহ্য লাগে। কোথা থেকে একটা চিন দেশের শ্যামাপাখি এনে পুষতে শুরু করেছেন কাদম্বরী।

রবি ঝগড়া বাধিয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গে, খাঁচার পাখির কষ্টে তোমার মনখারাপ হয় না? ওকে ধরে রেখেছ কেন, ছেড়ে দাও।

কাদম্বরী জবাব না দিয়ে পাখিকে দানা দিতে থাকেন। রোজ সকালে এক পোকাওয়ালা আসে পাখির জন্য ফড়িং, পোকামাকড় জোগাতে। পোকাওয়ালার সঙ্গে কথায় ব্যস্ত হয়ে যান তিনি আর রবির রাগ বাড়তে থাকে।

রবি বললেন, উত্তর দিচ্ছ না কেন। জ্যোতিদাদা কিন্তু আমার সব প্রশ্নের জবাব দেন।

কীসের জবাব শুনি? সব কাজের কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি তোমাকে? ঝাঁঝিয়ে ওঠেন কাদম্বরী। আমার অত সময় নেই, দেখছ না কাজ করছি?

রবি মনে মনে রেগে যান কিন্তু বউঠানের কাছে নতিস্বীকার করা চলবে না। তিনিও ঝাঁঝিয়ে উত্তর দেন, কাজ না অকাজ? অসহায় প্রাণীগুলোকে খাঁচায় বেঁধে রেখে আবার কাজ দেখানো হচ্ছে?

পাখি পোষা খারাপ কাজ? দেখছ না কত আদর যত্ন করছি? কাদম্বরী একটু আপসের সুরে বললেন।

রবি ছাড়ার পাত্র নন, আজ তিনি হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বেন। শুধু পাখি? তুমি যে কাঠবেড়ালিদুটোকে পুষ্যি নেবার নাম করে খাঁচায় পুরেছ, বনের প্রাণীকে বন্দি করা তোমার ভারী অন্যায়।

কাদম্বরী চোখ পাকিয়ে দেবরটিকে বললেন, তোমাকে আর গুরুমশায়গিরি করতে হবে না, আমার ন্যায় অন্যায় আমি বুঝব।

একে তো ঠিক জবাব বলা যায় না, বড় হওয়ার সুযোগে বউঠান তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। কিন্তু রবির মন মানে না, এটা যে অন্যায় সেটা বউঠান বুঝবেন না কেন? জ্যোতিদাদাকে বলেও কোনও লাভ হবে না, তিনি তো আবার হরিণ পুষেছেন। হয়তো তর্ক এড়াতে বউঠানের মতেই মত দেবেন।

রবি তখনকার মতো চুপ করে গেলেন। কিন্তু একফাঁকে চুপি চুপি খাঁচা খুলে ছেড়ে দিলেন বনের প্রাণীদের। তারপর দেওর বউঠানের ঝগড়া থামাতে অবশ্য জ্যোতিকে আসরে নামতে হয়েছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রের নতুন নাটক 'সরোজিনী' বা 'চিতোর আক্রমণ' প্রকাশিত হয়েই হইচই ফেলে দিয়েছে। নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে, প্রধান ভূমিকায় নটী বিনোদিনী। এই নাটকের একটি গান রবির লেখা। ভাইয়ের প্রতি অনুরাগবশত জ্যোতি তাঁকে গান লেখার দায়িত্ব দিয়েছেন, আর রবি এই অভাবিত সুযোগ পেয়ে নিজের সৃজনীশক্তি নিংড়ে গানটি রচনা করেছেন।

যদিও রবির গান লেখা নিয়ে কাদম্বরীর আপত্তি ছিল। তাঁর মতে এই নাটকটি জ্যোতির সেরা রচনা। এত গুরুত্বপূর্ণ একটি নাটকে নটী বিনোদিনীর কণ্ঠে যে গান গাওয়া হবে সেটা রবিকে লিখতে দিয়ে অবিবেচনার কাজ করছেন জ্যোতি। গানটা তাঁর নিজেরই লেখা উচিত।

নাটক এবং নাটকের ওই বিশেষ গানটি কিন্তু দর্শকদের মাতিয়ে দিল। যে দৃশ্যে চারদিকে ধু ধু চিতা জ্বলছে, আর রাজপুত মেয়েরা কেউ লাল

শাড়ি পরে, কেউ বা ফুলের গয়নায় সেজে গান গাইতে গাইতে চিতারোহণ করছেন, সেই গানটিই রবির লেখা,

'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা ॥
দেখ্ রে যবন দেখ্ রে তোরা
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে।
সাক্ষী রহিলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগতে হবে ॥'

স্টেজে সত্যি আগুন জ্বালানো হত। মেয়েরা গান গাইতে গাইতে ঝুপ করে আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে আর পিচকিরি করে কেরোসিন ছিটিয়ে আগুন দাউ দাউ জ্বলে উঠছে। অভিনেত্রীদের গায়ে আঁচ লাগছে, চুল পুড়ে যাচ্ছে, কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই, দেশপ্রেমের উত্তেজনায় তারাও শরিক।

এই নাটকে সরোজিনীর নামভূমিকায় বিনোদিনী সবাইকে মুগ্ধ করে দিচ্ছেন। নাট্যকার স্বয়ং মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন বিনোদিনীর দিকে। তাঁর হৃদ্‌স্পন্দন বেড়ে যায়, বুক ধুক ধুক করে।

রবি বউঠানকে কটাক্ষ হেনে বলেন, কী বোঠান, একেবারে হেলাফেলা করার মতো নয়, কী বলো?

মন্দ নয়! কাদম্বরী হেসে তাঁর পিঠ চাপড়ে দিলেন। তোমার একটা পুরস্কার পাওনা হল।

কী পুরস্কার দেবেন বউঠান, রবি কৌতূহলে ছটফট করতে থাকেন কয়েকদিন ধরে। তাঁর ঘুর ঘুর করা দেখে মজা পান কাদম্বরী, কিন্তু রহস্য ভাঙেন না।

ইতিমধ্যে একবার জ্যোতি শিলাইদহে যাওয়ার সময় রবিকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। সরোজিনী নাটকের গানটি লিখে রবি তাঁকে চমৎকৃত করেছেন, জ্যোতি ঠিক করলেন এখন থেকে রবিকে তাঁর সব কাজের সঙ্গী করে নেবেন। কবিতা লেখাই তো শুধু কাজ নয়, জ্যোতি ঘোড়ায় চড়া আর পাখি শিকারেও

রবিকে সমকক্ষের মর্যাদা দিচ্ছেন। কাদম্বরী জ্যোতিকে চিঠি লেখেন, রবিকেও। সেই চিঠির বড় বড় উত্তর লেখাও রবির একটি কাজ।

শিলাইদহ রবিকে বাধাবন্ধন হীন স্বাধীনতার স্বাদ এনে দিল, যেন প্রখর গ্রীষ্মের পর একপশলা বৃষ্টি। এখানে এসে জ্যোতি নিজেও যেন হৃদয় খোলা খেপামিতে মেতে ওঠেন। এই খেপামি কলকাতায় ফিরেও থামল না। তিনি মেতে উঠলেন সঞ্জীবনী সভা নিয়ে।

তখন কলকাতার যুবকমহলে ইতালির মাৎসিনির স্বাধীনতা যুদ্ধের কাহিনি প্রচার করে সাড়া ফেলেছেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার আন্দোলনে গুপ্তসমিতি তৈরি করে তিনি যে স্বাদেশিকতার আগুন জ্বালিয়েছেন, সে-সব শুনতে শুনতে অনুপ্রাণিত বাঙালি যুবকেরা বেশ কিছু গুপ্তসমিতি তৈরি করছিলেন, সেরকমই একটি সঞ্জীবনী সভা। উদ্দেশ্য লোকহিত এবং জাতীয়তাবাদের চর্চা।

জ্যোতি ও রবি তার সদস্য হলেন। গুপ্ত সমিতি, তাই সভা বসত গোপনে, ঠনঠনের একটি পোড়োবাড়িতে। দীক্ষাগ্রহণের দিন সভার অধ্যক্ষ রাজনারায়ণ বসু মশায় এলেন লাল পট্টবস্ত্র পরে। আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে আনা লাল কাপড়ে জড়ানো একটি বেদ পুঁথি টেবিলে রাখা হল। বেদগান দিয়ে সভার শুরু। তারপর টেবিলের দু'পাশে দুটি মড়ার খুলি রেখে তাদের চোখে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলেন কেউ। মড়ার মাথা মরা ভারতের প্রতীক, মোম জ্বালিয়ে মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারের ও জ্ঞানচোখ উন্মোচনের শপথ নিলেন দুই ভাই।

সভ্যরা তাঁদের আয়ের এক দশমাংশ সভায় দেন। ঠিক হল যে স্বদেশি দেশলাই, স্বদেশি কাপড়কল ইত্যাদি উদ্যোগে টাকা দেওয়া হবে। প্রথম দেশলাই বেরোনোর পর সবাই উত্তেজিত। জ্যোতি সকালে উঠেই দেখলেন সমাচার চন্দ্রিকায় খবর বেরিয়েছে, 'একটি শুভ চিহ্ন।/আজ আমরা একটি নূতন দেশলায়ের বাক্স দেখিলাম। বাক্সটীর আকার বিলাতি ব্রায়ান্ট এবং মের সেফটিম্যাচের ছোট বাক্সের ন্যায়। পাতলা দেবদারু কাঠেই সুন্দর রূপে বাক্সটী নির্ম্মিত হইয়াছে। দুই ধারে দেশলাই ঘষিবার মসলা মাখান। কাঠিগুলি দেবদারু কাঠের না হইয়া বাঁসের করা হইয়াছে, ঘর্ষণ মাত্রেই উত্তম জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু একটু ঠাণ্ডা লাগিলে বাঁসের কাষ্ঠ যেমন সহজেই শীতল হইয়া জ্বলনশক্তির হ্রাস হয় এগুলিকেও সে দোষ হইতে মুক্ত দেখিলাম না।'

তিনি উত্তেজিত হয়ে রবিকে ডেকে পাঠান, দেখ রবি সমাচার চন্দ্রিকা কত প্রশংসা করেছে স্বদেশি দেশলাইয়ের।

রবি কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, কিন্তু বড্ড খরচ। এ দেশলাই চালানো শক্ত হবে। এরকম এক বাক্স দেশলাই তৈরির খরচে একটি পল্লির সারা বছরের জ্বালানি হয়ে যায়।

জ্যোতি আশঙ্কা উড়িয়ে বললেন, দিশি দেশলাই করা গেল তাই না কত, টাকাপয়সা যা লাগে সবাই মিলে তুলে দেওয়া যাবে। বাজারে নামুক তো আগে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে রবির আশঙ্কাই সত্যি হল। স্বদেশি দেশলাই তৈরি করতে দেনার দায়ে গাঁ উজাড়। অনেক টাকা খরচ করে যে কাপড়ের কল বসানো হল, সেটাও কয়েকটি গামছা উৎপন্ন করে ঋণের ভারে থেমে গেল। কিন্তু স্বদেশি উৎপাদনকে উৎসাহ দেওয়া থামল না। পাথুরিয়াঘাটার বাবু আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মুদ্রাযন্ত্র নির্মাণ করলেন, বাবু গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সুতাকল বসালেন। বাঙালির বিজ্ঞানচর্চার জন্য সত্যপ্রসাদকে কুপার্স হিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পাঠানো হল। রবিকে উৎসাহিত করা হল বিলেতে গিয়ে সূক্ষ্মশিল্প শিখতে।

জ্যোতির মাথায় এল ভারতীয়দের সর্বজনীন পোশাকের ডিজাইন করতে হবে। অনেক ভাবনাচিন্তার পর একদিন তিনি পায়জামার ওপর একখণ্ড কাপড় দিয়ে মালকোঁচা করে পরলেন, মাথায় লাগালেন পাগড়ি ও টুপির মাঝামাঝি একটা বস্তু। প্রখর দিনের আলোয় সেই অদ্ভুত পোশাক পরে দেশোদ্ধারে চললেন জ্যোতি ঠাকুর। এই বিচিত্র দৃশ্য দেখতে রাস্তায় লোক জমে গেল।

মুগ্ধ ভাই রবি সেদিকে তাকিয়ে নতুনবউঠানকে বললেন, ধন্য তোমার স্বামী। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকতে পারে, কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোশাক পরে গাড়ি করে কলকাতার রাস্তা দিয়ে যেতে পারার মতো লোক নিশ্চয় বিরল।

কাদম্বরীও মুগ্ধ, সত্যি রবিঠাকুরপো, এমন দুঃসাহসী স্বামীর জন্য আমার গর্ব হয়। তাই তো আর কাউকে আমার মনে ধরে না।

আর কাউকে মনে ধরার দরকার কী ঠাকরুন, রবি তাকান কাদম্বরীর দিকে, তুমি তো সকলের মাথা ঘুরিয়ে দাও।

পরের দিন অবশ্য জ্যোতিই সবার মাথা ঘুরিয়ে দিলেন আরেকটি নতুন উদ্ভাবনে। সেদিন সকালেই তেতলার ঘরে জড়ো হয়েছেন অক্ষয় আর রবি। দু'জনে পাল্লা দিয়ে কবিতা পড়ছেন আর কাদম্বরী লুচি তরকারি জোগান দিয়ে যাচ্ছেন।

জ্যোতির হঠাৎ মনে হল এই দুই কবি-বিহঙ্গের গান শুধু আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে, ওদের জন্য একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। কাব্যপাঠ থামিয়ে দিয়ে বললেন, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।

কাদম্বরী কৌতুক করে বলেন, তোমার মাথায় তো সবসময়েই আইডিয়া গিজগিজ করছে। এ আর নতুন কী?

না না, এ একেবারে নতুন, শুনলে চমকে উঠবে। রবি ও অক্ষয়ের অগাধ আস্থা তাঁর ওপর, তাঁরা উৎসুক হয়ে ওঠেন।

জ্যোতি বললেন, আইডিয়া একটা পত্রিকার। এই ঘর থেকেই বেরবে একটি চমকে দেওয়ার মতো সাহিত্য পত্রিকা। তোমাদের আর যাযাবরের মতো ওড়াওড়ি করতে হবে না, যা লিখবে সব ধরা থাকবে পত্রিকার পাতায়।

রবি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, ওঃ জ্যোতিদাদা, তোমার এই আইডিয়াটা একেবারে তুরুপের তাস। বাবামশায়কে রাজি করাতে পারবে তো?

আগে চল দোতলায় বড়দাদার ঘরে যাই। প্রবীণ বিহঙ্গরাজ মত দিলে বাবামশায় আপত্তি করবেন না।

চারজনে দল বেঁধে নেমে আসা হল দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে, তিনি কাব্যসাহিত্যের চেয়ে জ্ঞানচর্চায় বেশি ব্যস্ত থাকেন। কনিষ্ঠদের উৎসাহে তিনিও মদত জোগালেন, আইডিয়া তো খুব ভাল, কিন্তু জ্যোতি, নতুন পত্রিকার কী দরকার, আবার সবাই মিলে তত্ত্ববোধিনীকেই জাগিয়ে তুলি না কেন?

জ্যোতি দ্বিধা করেন, বড়দা, তত্ত্ববোধিনীর গায়ে বড্ড রাশভারী গন্ধ। সাহিত্যের পত্রিকা হবে বঙ্গদর্শনের মতো স্বাদু অথচ এক্সপেরিমেন্টাল। পাঠকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পারি এমন পত্রিকা চাই, যাতে পাঠকের রুচি উন্নত করা যায়।

ভাল পত্রিকা হলে মানুষ তো পড়বেনই, ও নিয়ে চিন্তা করিস না, দ্বিজেন আশ্বস্ত করতে চান।

কিন্তু অক্ষয় অন্য কথা বললেন, বড়দাদা, আপনি দেখছেন তো কতশত বাঙালি পাঠকের রুচি এখনও বটতলায় আটকে আছে।

জ্যোতি তাঁর কথা লুফে নিয়ে বলেন, সেই নিম্নরুচি পাঠকদের শিক্ষিত করার দায় নেব আমরা, সাহিত্যরুচি উন্নত না হলে জাতির প্রগতি হয় না। তত্ত্ববোধিনী সাধারণ লোকের কাছে পৌঁছতে পারে না, আমাদের সম্পূর্ণ নতুন করে শুরু করতে হবে।

দ্বিজেন জানতে চান, তা হলে কী নাম দেবে ভাবছ পত্রিকার?

তুমিই ঠিক করে দাও বড়দাদা, রবি এবার বললেন।

দ্বিজেন বললেন, 'সুপ্রভাত' কেমন নাম? সবাই একটু চুপ। জ্যোতির ঠিক পছন্দ হয় না, অবশেষে তিনি বলেন, এই নামটার মধ্যে একটু ঔদ্ধত্য আছে। মনে হবে আমরা দাবি করছি যে এতদিনে বাংলা সাহিত্যে সুপ্রভাত আনলাম আমরাই।

একটু ভেবে দ্বিজেন আরেকটা নাম বললেন, তা হলে 'ভারতী' কেমন হবে?

জ্যোতির পছন্দ হল নামটা, বেশ একটা স্বদেশি গন্ধ আছে, আবার ভারতীর একটা অর্থ বাণী, আর-এক অর্থ বিদ্যা।

দ্বিজেন আবার বলেন, যে অর্থে ব্রিটেনের অধিষ্ঠাত্রী ব্রিটানিয়া, আথেন্সের এথেনিয়া, সেই অর্থেই ভারত-সরস্বতীর নাম ভারতী ধরা যায়।

সবার সম্মতিতে ভারতী নামটাই রইল। প্রথম সংখ্যা পাঁচশো কপি ছাপার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল, আর ভারতীকে কেন্দ্র করে ঠাকুরবাড়িতে শুরু হয়ে গেল সাহিত্যের মহাসম্মেলন। প্রতি রোববারে রবি আর জ্যোতি ভারতীর ফাইল নিয়ে চলে আসেন অক্ষয়চন্দ্রের বাড়িতে, সেখানে অক্ষয়ের স্ত্রী শরৎকুমারী লাহোর থেকে সদ্য এসেছেন। তিনিও মহা উৎসাহে জড়িয়ে পড়লেন। কোনও কোনও দিন আবার সবাই মিলে যাওয়া হত বিহারীলালের বাড়িতে। রোববার ছাড়া অন্য দিনগুলোর সন্ধেবেলায় প্রায়ই ভারতীর দপ্তর বসে স্বর্ণ-জানকীর রামবাগানের বাড়িতে। সেখানে কাদম্বরীর সঙ্গে প্রফুল্লময়ীও মাঝে মাঝে চলে আসতেন গান ও কবিতায় বিষণ্ণতা কাটানোর জন্য। স্বর্ণ কোনওদিন ডিনার না করিয়ে ছাড়েন না, ফলে আসর লম্বা হতে থাকে দীর্ঘ রাত্রির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

ভারতী পত্রিকায় অনুবাদ করবেন ভেবে তেতলার ছাদে বসে রবি একদিন কাদম্বরীকে ম্যাকবেথ পড়ে শোনাচ্ছিলেন। তিন ডাইনির বর্ণনা শুনে কাদম্বরী উত্তেজিত হয়ে বললেন, এই ডাইনিরা কত স্বাধীনা, নিজের ইচ্ছেয় বাঁচে, ইচ্ছেমতো পুরুষের মুন্ডু চিবিয়ে খায়।

রবি হেসে ফেললেন, বউঠান তুমি ডাইনিদের হিংসে করছ! তুমিই বা কম কীসে, সারাক্ষণ আমার মুন্ডু তো চিবোচ্ছোই, আর বেচারা অক্ষয়বাবুর তো আর মুন্ডুই নেই।

যাঃ, আমাকে ডাইনি বলছ রবি? ভাল হচ্ছে না কিন্তু, কাদম্বরী ঈষৎ অভিমানী হয়ে বললেন। অক্ষয়বাবুর ঘরে শরৎকুমারী আছেন, তাঁকে ওরকম বদনাম দিয়ো না রবি।

রবি বলেন, হে আমার মাথা চিবিয়ে খাওয়া দেবী, আজ থেকে তোমার নাম দিলেম হেকেটি ঠাকরুন। তুমিই ম্যাকবেথের হেকেটি ডাইনি, তুমিই ত্রিমুণ্ড গ্রিক দেবী হেকেটি। কোন মন্ত্রে আমাকে ভেড়া করে রেখেছ ঠাকরুন, তুমিই জানো।

যাও যাও, তোমাকে ভেড়া করে রাখতে আমার বয়েই গেছে, এখনও নাক টিপলে দুধ বেরোয়, আবার পাকা পাকা কথা!

ষোলো বছরের রবির মাঝে মাঝে নতুনবউঠানের ওপর খুব অভিমান হয়, ষোলো বছর বয়স কি এতই ফেলনা! সংস্কৃতশাস্ত্রে ষোলো বছরের ছেলেকে প্রাপ্তবয়স্ক ধরা হয়। এখনও তো এ বয়সের কত যুবক বিয়ে করে বাচ্চার বাবা হয়ে যায়। এই তো সেদিন রবির ভাগনে সত্যর বিয়ে হয়ে গেল।

রবি বুঝতে পারেন না, বউঠান কেন শুধু তাঁর সঙ্গেই এমন কৌতুক করেন! একে তো তিনি এখনও প্রতিশ্রুতি মতো পুরস্কার দেওয়ার নাম উচ্চারণ করছেন না, তার ওপর জ্যোতিদাদাকে তিনি যত মনোযোগ দেন, ইদানীং তার অর্ধেকও যেন রবিকে দিতে চাইছেন না। অথচ কেন যে তাঁর একটু প্রশংসার জন্য রবির কবিমন কাঙাল হয়ে থাকে! নিজের ওপরেই রাগ হয় তাঁর। জ্যোতি ও অক্ষয় এলে কবিতা পড়া শুরু হয়।

একসময় তেতলার ছাদের সান্ধ্যবাসর শেষ হয়ে সবাই ঘরে ফেরেন, জ্যোতি ও কাদম্বরী নিজেদের শোবার ঘরে চলে যান, তারপরেও অনেকক্ষণ একা একা ছাদে ঘুরে বেড়ান অস্থির রবি। কত কী আকাশ পাতাল ভাবনা মাথায় আসে। চাঁদনি রাতে ছাদের ওপর সারি সারি পামগাছের ছায়া যেন মায়াবী আঁকিবুকি। রাত একটা বাজে, দুটো। সামনের বড় রাস্তায় ধ্বনি ওঠে ‘বল হরি, হরি বোল’।

সেদিন এমন গভীর রাতে ছাদে পায়চারি করতে করতে জ্যোতিদের ঘরের জানলায় চোখ পড়তে চন্দ্রাহত হয়ে তাকিয়ে থাকলেন রবি। জানলার পরদা

উড়ে গেছে হাওয়ায়, আর জ্যোৎস্না গিয়ে পড়েছে ঘরের নিভৃত একটি দৃশ্যে। চাঁদের আলোয় শঙ্খলাগা দুটি নারী ও পুরুষের অপরূপ দৃশ্য। রবির মাথা ঝিমঝিম করে।

সেই একঝলক দেখা দৃশ্যই কৈশোরের ঘোরলাগা সরলতার গণ্ডি পেরিয়ে হঠাৎ যেন প্রাপ্তবয়স্ক করে দিল তাঁকে। নিষিদ্ধ আপেল দেখে ফেলা রবির মাথায় নৃত্য করতে থাকে এক জ্যোস্নাময়ী। সারারাত ঘুমোতে পারেন না তিনি, শেষ রাতে ধুম জ্বর আসে।

ইতিমধ্যে শিকারপুরে ডিস্ট্রিক্ট জাজের কাজ করার সময় সত্যেনের একটি ছেলে হয়েছে, নাম কবীন্দ্র। কলকাতায় স্বর্ণকুমারীর ছোটমেয়ে ঊর্মিলাও সদ্য জন্মেছে।

সত্যেন ও জ্ঞানদা ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকাতায় এলেন বিলেত যাওয়ার তোড়জোড় করতে। সত্যেনের ইচ্ছে রবিকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন, লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়াবেন।

ওঁরা এসে পড়ায় তেতলার ছাদের সাহিত্যবাসরে নতুন জোয়ার এল। রোজ সন্ধ্যায় জ্যোতি, রবি, কাদম্বরীর সঙ্গে যোগ দেন সত্যেন ও জ্ঞানদা। স্বর্ণকুমারী তো আসেনই, এখন কাদম্বরীর প্রিয় কবি বিহারীলালও মাঝে মাঝে এসে কবিতা শোনান। ছাদের ওপর যেন চাঁদের হাট নেমে এসেছে। রবি অবশ্য কয়েকদিন নতুনবউঠানের থেকে একটু দূরে দূরে থাকছেন।

সেদিন সবাই জড়ো হলেন বিহারীলালের কবিতা শুনতে। এত নামী কবি, এত লালিত্যময় কবিতা, সত্যেন আর জ্ঞানদার উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। তাঁরা প্রবাসে অনেকদিন উপোসি থাকার পর কবিকণ্ঠে কবিতা শোনার এমন সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু জ্ঞানদা লক্ষ করছেন কবি বিহারীলাল যেন নির্দিষ্ট একজনের উদ্দেশেই সব কবিতা পড়ছেন, পড়তে পঁড়তে বারে বারে শুধু কাদম্বরীর মনোযোগ চাইছেন। আর কাদম্বরীও মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর কবিতা শুনছেন।

আর এইসব বাইরের পুরুষদের সামনে নতুনবউ কত অনায়াস! জ্ঞানদা কিছুদিন ছিলেন না, তার মধ্যে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অন্তঃপুরের পরদা উঠে গেছে। কাদম্বরী ঘোমটা খুলে ফেলে হয়ে উঠেছে সাহিত্যবাসরের মক্ষীরানি। এতে জ্ঞানদার খুশিই হওয়ার কথা কিন্তু তাঁর মন খচখচ করছে। এ-সব পরিবর্তন তো তিনিই শুরু করেছিলেন,

তখন কত বিরোধিতা, বাবামশায় আর শাশুড়ির গোমড়া মুখ, দাসী চাকরের কান্নাকাটি, রাস্তার লোকের টিটকিরি! কত সহ্য করেছেন জ্ঞানদা আর এখন সেই তৈরি করা বেদিতে বসে হাততালি কুড়োচ্ছে কিনা শ্যাম গাঙ্গুলির মেয়ে? কী এমন তালেবর হয়ে উঠল যে বিহারীলাল তার প্রশংসার কাঙাল, অক্ষয়চন্দ্র মুগ্ধচোখে তাকিয়ে থাকেন, রবিকে এমন গুণ করেছে যে সে নতুনবউঠান বলতে অজ্ঞান। আর জ্যোতি তো মাথা কেটে বউয়ের পায়ের তলায় রেখে দিয়েছে।

এই পরিবেশে তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসে, এরা কি সব পাগল হয়ে গেল, জ্ঞানদা সামনে থাকতেও কাদম্বরীর জাদুতে বশীভূত! স্বর্ণকে জ্ঞানদা বললেন, চলো ঠাকুরঝি, তুমি আমি একটু নিভৃতে গল্প করি।

স্বর্ণ সাহিত্যের আড্ডা ছেড়ে যেতে চান না, একটু পরেই তিনি কবিতা শোনাবেন বিহারীলালকে, তিনি বলেন, দাঁড়াও না মেজোবউঠান, এখন কবিতা শুনি তারপর রাতে গল্পগুজব হবে।

বিহারীলাল এবার জ্ঞানদার দিকে ফেরেন, সে কী বউঠান, আমার কবিতা কি এতই খারাপ, আপনি চলে যেতে চাইছেন?

জ্ঞানদা হেসে বললেন, আপনার অনেক মুগ্ধ পাঠক-পাঠিকা আছেন এখানে, আমার না থাকলেও চলবে।

বোসো না মেজোবউঠান, জ্যোতি অনুরোধ করলেন এবার, তুমি চলে গেলে আসর জমবে না।

জ্ঞানদা গম্ভীর মুখে বলেন, তোমরা আসর জমাও, আমি জলখাবার পাঠানোর ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।

এবার কবিতার ঘোর ভেঙে কাদম্বরী বলে ওঠেন, ও নিয়ে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না মেজদি, জলখাবার এসে পড়বে এক্ষুনি, সব বলা আছে।

বলতে বলতেই দুটি দাসী থরে থরে সাজানো রেকাবি নিয়ে আসে। উৎফুল্ল হয়ে অক্ষয়চন্দ্র বলে ওঠেন, ওই দেখা যায় থালাভরা ফিশ কাটলেট, মাটন চপ।

কাদম্বরী হেসে বলেন, না মশায়, আজ মাটন চপ নেই, আজ অন্য মেনু।

অক্ষয় দুঃখী মুখ করে বললেন, সেকী কাদম্বরী বউঠান, এখানে আসার প্রথম অ্যাট্রাকশন আপনি স্বয়ং আর দু'নম্বরটা আপনার হাতের স্পেশাল মাটন চপ। সেটাই নেই!

সবাই হেসে উঠে ধোঁয়া-ওঠা শিক কাবাবের দিকে হাত বাড়ালেন। শুধু জ্ঞানদার মনে হয়, গৃহিণীপনাতেও কি তাঁকে হারিয়ে দিচ্ছে নতুনবউ? জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তিনি যেন একটু অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাচ্ছেন, আর তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে জাঁকিয়ে বসেছে কাদম্বরী।

কাদম্বরী বুঝতে পারেন মেজোজা প্রখর দৃষ্টিতে তাঁকে লক্ষ করছেন। মনে মনে মজা পান তিনি। এই মেজোবউ একদিন কী অবহেলাই না করেছেন তাঁকে। আজ তিনি দেখুন। আমার ছাদের বাগানে এত গুণীজন আমাকে ঘিরে কবিতা শোনায়। গান করে। আমাকে খুশি করতে পারলে আর কিছু চায় না। দেখো মেজদি যাকে কাচ বলে ফেলে দিতে চেয়েছিলে সেই এখন জ্যোতি ঠাকুরের কণ্ঠের হারে।

জ্ঞানদা আর কাদম্বরীর মধ্যে সবার অলক্ষে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বাতাস বইতে থাকে। জ্ঞানদা ভাবেন, দাঁড়াও নতুনবউ, দুটো কাব্য পড়তে শিখেছ বলে মুড়ি মিছরি এক করে পাল্লা দিতে চাইছ আমার সঙ্গে!

সাহিত্যের নির্মল বাতাসের পেছনে ঘনিয়ে ওঠে ঘনঘোর দুর্যোগ।

৮

বটতলা বনাম ভারতী পত্রিকা

সেদিন বই-মালিনী ঠাকুরবাড়ির উঠোনে পা দিতেই কয়েকজন মেয়ে-বউ খিলান পেরিয়ে তাকে টেনে নিয়ে আসে মার্বেলের বারান্দায় মহিলা আসরের মাঝখানে। তার কাছে ঢপ, খেউড়, ঝুমুরগান শুনতে আবদার ধরে তারা। মালিনীর মুখ তখন পানের রসে টইটম্বুর, পিক ফেলে মুখ ধুয়ে এসে মাদুরের ওপর জমিয়ে বসে সে একটি ঝুমুর গেয়ে ওঠে, গানটি চিরাচরিত বৈষ্ণব পদাবলির একটি লোকায়ত প্যারডি, ভবানী বা ভবরানির প্রচলিত ঝুমুরগান,

চল সই বাঁধা ঘাটে যাই অ-ঘাটের জলের মুখে ছাই
ঘোলাজল পড়লে পেটে গাটা অমনি গুলিয়ে ওঠে
পেট ফেঁপে আর ঢেকুর উঠে হেউ হেউ হেউ...

একসময় ভবানী বা ভবরানি নামে এক মহিলার ঝুমুরগানের দল খুব বিখ্যাত হয়েছিল কলকাতায়। তার গান এখনও শুনতে চায় আধুনিক শিক্ষার ছোঁয়া-না-লাগা অন্তঃপুরের মেয়েরা। সেসময় বিয়েতে ঝুমুরওলির নাচগান খুব চলত, এমনকী গ্রামের বিয়েতে গোরুর গাড়ির ওপরে ঝুমুর দলের নাচ হত।

গান শুনে নিস্তরঙ্গ অন্তঃপুরে একটু ঢেউ ওঠে। আরেকটা শোনাও, বলে মালিনীর গলা ধরে ঝুলে পড়ে রূপা।

ঝুমুরের পর মালিনী বলে, এবার তা হলে একটা খেউড় শোনো, রূপারানি। স্ত্রী-পুরুষের প্রেমালাপ। শোনো, স্ত্রী বললে, মালিনী সুর টেনে বলে: 'ওরে আমার কালভ্রমর, মধু লুটবি যদি আয়।'

মেয়েরা ছেঁকে ধরে, তখন পুরুষ কী বললে?

মালিনী হাসিমুখে বলে, আর পুরুষ বললে, কী বললে বলো তো দিদিরা, বোঠানরা? এবার বেশ সুর করে বলে মালিনী, আর পুরুষ বলে, 'আমি থাকতে চাকের মধু পাঁচভ্রমরে খেয়ে যায়?'

মেয়েরা কেউ কেউ হাসিতে লুটিয়ে পড়ে, বাড়িতে পুরনোপন্থীরা আছেন, কম শিক্ষিতরা আছেন, গরিব আশ্রিতারা আছে, দাসীরা আছে। তারা অনেকেই এধরনের ছড়ায়-খেউড়ে মজা পায়। সৌদামিনী, নীপময়ী, শরৎকুমারীরও মাঝে মাঝে এমন কৌতুকরস ভালই লাগে। রূপকুমারী তো কৌতুকে উচ্ছল হয়ে চকমেলানো বারান্দার উঁচু উঁচু থামের গায়ে গায়ে ছুটে বেড়ায়, মালিনীর গা ঘেঁসে ওর সঙ্গে গাইবারও চেষ্টা করে।

অথচ এ-সব চলতি গ্রাম্য ভাষায় কোনও পরিশীলনের ছোঁয়া নেই বলে জ্ঞানদার কানে তা রীতিমতো অশ্লীল শোনায়। মকরমুখী রুপোর জাঁতিতে সুপুরি কাটতে কাটতে তিনি বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকালেন, কী শোনাও এ-সব মালিনী, না আছে কোনও ছন্দ না শ্রী।

শহরের বুদ্ধিজীবীরা যখন ভাষাসরস্বতীকে ইতর অশ্লীল গেঁইয়াপনার হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, তখন এ-সব মেয়েলি খেউড় শুনে স্বর্ণও খুব রাগ করেন, নতুন বঙ্গদর্শনের পাতা থেকে মুখ তুলে তিনি বললেন, এ-সব কী হচ্ছে মালিনী, তুমি কত ভাল ভাল সাহিত্য জানো, কত অশিক্ষিতাকে অক্ষর শেখাও আর সেই তুমি এ-সব লঘু খেউড় শোনাচ্ছ?

শুধু লঘু না, জ্ঞানদা বলেন, রীতিমতো অশ্লীল সব গাঁইয়া ছড়া। এ-সব এখানে বোলো না মালিনী। রূপা ওখান থেকে উঠে আয়, খবরদার ও-সব গান মুখে আনবি না। আমাদের ঘরের মেয়েরা ও-সব গায় না।

মালিনী ক্ষুব্ধ হয়ে ঝাঁপি গুটোনোর উদ্যোগ করে বলে, তোমরা না চাইলে বলব না স্বর্ণদিদি, কিন্তু এ-সব ঢপ, ছড়া, খেউড় কীর্তন যারা চর্চা করে তোমরা যে তাদের মানুষ মনে কর না সেটা কি ঠিক? যে মাদুরটার ওপর বসেছ, সেটাও তো সেই গাঁয়ের জিনিস।

স্বর্ণ বলেন, আরে ও-সব গাঁইয়া অশুদ্ধ কালচার কি সাহিত্যের শুদ্ধ অঙ্গনে জায়গা পেতে পারে? অনেক পরিশীলনে এই নতুন বাংলাভাষা তৈরি করেছেন বিদ্যাসাগর মধুসূদনের মতো লেখকরা, না হলে তো বাংলা সাহিত্য 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' আর 'আলালের ঘরের দুলাল'-এই থেমে থাকত।

নীপময়ী শুনছিলেন, এখন বললেন, গানের আবার জাত বেজাত কীসের স্বর্ণঠাকুরঝি? আমার তো সুরে গাইলে সব গানই ভাল লাগে। সেতারে যে সুর বাজে, একতারাতেও সেই সুর।

জ্ঞানদা বিস্মিত হয়ে বললেন, সে কী সেজো? তুমি নিজে এত ভাল উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম নিয়ে এ-কথা বলতে পারলে? গানের জাত থাকবে না? সেতার আর একতারা কি এক হল?

বঁটিতে ঝিঙের শিরা ছাড়াতে গিয়ে নীপময়ীর আঙুলগুলো তখন তরকারির রসে মাখামাখি। আঁচলে আঙুল মুছে তিনি বললেন, আমার তো কোনও অসুবিধে হয় না ঢপ খেউড় শুনতে, ওর মধ্যেও মানুষের প্রাণের ভাষা আছে, লোকায়ত জীবনের রস আছে।

গায়ে সর-ময়দা মাখছিলেন শরৎকুমারী, তিনিও মুখ খোলেন, আমারও কিন্তু খারাপ লাগে না মেজোবউঠান, মালিনীর কাছে এ-সব গান শুনে গ্রামের সহজ জগৎটাকে দেখতে পাই।

মালিনীর গোমড়া মুখ অবশ্য সহজ হয় না, সে বলে, জানো মেজোবউঠান, তোমাদের এই গুমরের জন্য এখন শহরে ইতর-ভদ্র ভাগ হয়ে যাচ্ছে!

হোক না ভাগ, যা রুচিহীন তাকে তো জাতে তোলা যায় না, যতই তোমরা ওই সস্তা খেউড়ে তাল দাও, ও-সব গান বাড়ির পরিবেশ নষ্ট করছে। জ্ঞানদা বললেন, যার শুনতে হয় নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে শোনো না!

নীপময়ী স্পষ্টতই বিরক্ত হন জ্ঞানদার কথায়, সবসময় এত গুরুগিরি ফলানো ভাল লাগে না বাপু। টিপটপ বিবি সেজে বসে থাকো সারাক্ষণ আর গবর্নরের পার্টি টার্টিতে যাও বলে কি আমাদের সকলের মাথা কিনে নিয়েছ মেজদি? বাইরে মেলামেশা করি না বলে কি বাড়ির ভেতর আমাদের কোনও মতামত থাকবে না? এখানে তোমার যত দাবি আমারও ততটাই।

তোমার সঙ্গে আমার মতে মিলবে না সেজো, জ্ঞানদা বলেন, কিন্তু তাই বলে ইতর রসে আমার আপত্তি তো আমি গিলে ফেলতে পারি না। তাঁর নাকে হিরের ফুল রাগে ঝলকিয়ে ওঠে।

বই-মালিনীর রুপোর পাঁয়জোরও রাগ করে ঝমকায়, সে বলে, দেখো মেজোবউঠান, তোমাদের এ-সব গানবাজনা, সাহিত্যচর্চা, পোশাক, স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার হাওয়াকে ওরা ঠাট্টা করছে আবার ওদের চিরকেলে ছড়া, গান, খেউড়, যাত্রাপালার ভাষাকে তোমরা এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে চাইছ। দেশের

দুর্দিনে কোথায় ইংরেজের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়বে তা না নিজেরা লড়ে মরছ। এটা কি ভাল হচ্ছে স্বর্ণদিদি?

কথাটা ঠিক। ইদানীং শহরে ভদ্র ও ইতর সংস্কৃতির শ্রেণির লড়াই বেশ জমে উঠেছে। গ্রাম থেকে আসা মানুষদের সঙ্গে শহরে ঢুকে পড়েছে গ্রাম্যরসের যাত্রা, কথকতা, পাঁচালি, ঢপ, খেউড়। শহরের ধনীঘরের বারবাড়িতে আর অন্তঃপুরে একসময় আমোদের খোঁজে এদের ডেকে আনা হত। কিন্তু এখন সেই ঝাঁঝালো বাংলাকে হঠিয়ে জায়গা নিচ্ছে সংস্কৃতঘেঁষা উচ্চবর্গের বাংলা। এই লড়াইয়ে কেউ কাউকে সইতে পারছে না। মালিনী স্বর্ণকে সাক্ষী মানতে চায় কিন্তু তিনি কোনও সাড়া দেন না।

বরং জ্ঞানদা আবার বলেন, ওই যে তোমাদের কাঁড়াদাস না কে একজন আমাদের নিয়ে ঠেস দিয়ে গান বেঁধেছে, কী অসভ্য সব কথা! ইতর লোকে তা নিয়ে ধেই ধেই নৃত্য করছে। এগুলোকে সংস্কৃতি বলছ মালিনী? ছিঃ!

কোন গানটা বলছ মেজোবউঠান? মালিনী অবশ্য জানে উচ্চবর্গের মেয়েদের আচার আচরণকে শ্লেষ করে লেখা কাঁড়াদাসের একটি গান খুব জনপ্রিয় হয়েছে সম্প্রতি। ওই যে ওই গানটা? জ্ঞানদাকে খেপাতেই যেন সে গেয়ে ওঠে,

'হদ্দমজা কলিকালে কল্লে কলকেতায়।/ মাগীতে চড়লো গাড়ী ফেটিং জুড়ি।
হাতে ছড়ি হ্যাট মাথায়/ ষষ্ঠী মাকাল আর মানেনা,
সেঁজুতির ঘর আর মানেনা,/ আরসিতে মুখ আর দেখেনা
এখন কেবল ফটোগ্রাফ চায়।/ এখন গাউন পরে ঘোড়ায় চড়ে,
গঙ্গাস্নান তো দেছে ছেড়ে,/ গোসলখানায় খানসামাতে টাউয়েল দিয়ে গা মোছায়।'

খবরদার ওই গান গাইবে না মালিনী, স্বর্ণও রেগে ওঠেন, ছিঃ, খানসামা এসে গৃহিণীর গা মুছিয়ে দিচ্ছে, এ-সব কী কেচ্ছা? ইচ্ছে করে ভদ্রঘরের মেয়ে-বউদের টেনে নামাতে চাইছে। আর এত ভুলভাল ছন্দমিল আমার কানে সয় না।

সে তো বুঝতেই পারছ দিদি, মালিনী বলে, গ্রাম্য কবিয়াল শহুরে ভদ্রমেয়েদের আচার আচরণ তো নিজের চোখে দেখেননি, কিছুটা শুনেছেন,

বাকিটা কল্পনা করেছেন। একটু নির্মল ঠাট্টা করতে চেয়েছেন বই তো নয়। পুরুষের রচনায় মেয়েদের মুখ চিরদিনই কল্পনার ঘোমটায় ঢাকা থাকে, এও সেরকম। খানসামা যে মুসলমান বাড়িতে রান্না করে তা না জেনেই বোধহয় কবি তাকে দিয়েছেন চানঘরে হিন্দু বা ব্রাহ্ম গৃহলক্ষ্মীর গা মোছানোর ভার।

তুমি আর ওদের হয়ে সালিশি কোরো না মালিনী, এ-সব শুনে জ্ঞানদা স্বাভাবিকভাবেই রেগে যান। বরং তোমার ঝাঁপিতে পত্রপত্রিকা কী আছে বের করো, নতুন কোনও মহিলা লেখিকার খোঁজ পেলে কি না বলো।

আজ তোমরা মনটা খারাপ করে দিলে গো মেজোবোঠান। যদি মেয়েদের লেখার কথাই বলো তো বলি, তোমাদের ঘরের শিক্ষিত মেয়েদের অনেক আগে থেকেই কিন্তু এ-সব হাটঘাটের মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে তাল মিলিয়ে ছড়া লিখছে, ঢপ-খেউড়-ঝুমুর গাইছে, কবির লড়াই করছে। একসময় হরু ঠাকুরের সঙ্গে যজ্ঞেশ্বরীর কবিগানের তরজা কত লোক টেনেছে। বছর কুড়ি আগে বিখ্যাত জগন্মোহিনী তো এই ঠাকুরবাড়িতেও ঢপকীর্তন গেয়ে গেছেন। তোমাদের মা দিদিমায়ের আমলে এ-সব জাতবিচার ছিল না।

স্বর্ণর একটু গায়ে লাগে, তিনি এখনকার মহিলা লেখকদের মধ্যে অগ্রণী হয়েও যেন মালিনীর কাছে ঠিকঠাক স্বীকৃতি পাচ্ছেন না, বললেন, মালিনী তুমি যে-সব মেয়েদের লেখার কথা বলছ, তাদের একটাও স্মৃতিধার্য পঙ্‌ক্তি বলতে পার?

মালিনী তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়, নিশ্চয়ই পারি, রামী ধোপানির কবিতা শোনো, তিনিই বোধহয় বাংলার পয়লা মেয়ে কবি,

‘কি কহিব বঁধু হে বলিতে না জুয়ায়/ কাঁদিয়া কহিতে পোড়ামুখে হাসি পায়

অনামুখো মিনসেগুলোর কি বা বুকের পাটা/ দেবীপূজা বন্ধ করে কুলে দিয়ে বাটা...

অবিচারপুরী দেশে আর না রহিব /যে দেশে পাষণ্ড নাই সেই দেশে যাব।’

মালিনী বলে, দেখছ কী ঝাঁঝাল ভাষা, কী সাহসী! মিনসে-তন্ত্রের দাপটের কাছে মাথা না নুইয়ে কেমন পালটা কথা বলতে পেরেছে!

হেটো মেয়েরা পুরুষের অবিসংবাদিত কর্তাতির প্রতি যে উদ্ধত উপহাস ছুড়ে দিতে পেরেছে শিক্ষিত স্বাধীন মেয়েদের সে সাধ্য বা সাহস হয়নি। সেটার স্বীকৃতি দিতেও নারাজ তারা।

স্বর্ণ বলেন, সাহস আছে তো কী হল, কাব্যগুণ কম।

বেগুনি পাড় সবুজ ধনেখালির শাড়ি গাছকোমর করে পরা মালিনী যেন সেই প্রান্তিক রামী, যজ্ঞেশ্বরী, জগন্মোহিনীদের প্রতিনিধি, তাদের হয়ে অভিমান করে সে বলে, আজ আর ভাল লাগছে না গো দিদিরা বোঠানরা। আজ আমি চললাম।

সবার অলক্ষ্যে ঔদ্ধত্যের এই নতুন রসের খোঁজে উৎসুক হয়ে ওঠে ঠাকুরগৃহপালিত রূপকুমারী। সে ভেতরের আঙিনা ছেড়ে মালিনীর পিছুপিছু চলতে থাকে। মালিনীর অন্যরকম কথা, অন্যরকম কাপড়চোপড়, গয়নাগাটি, অন্য জগতের হাতছানি তাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। হেটো মেয়েদের এই স্বাধীন ভাষায় ও আচরণে ভদ্রমেয়েরা প্রভাবিত হয়ে পড়বে বলে বাবুদের যে আশঙ্কা ছিল, তা যেন সত্য হয়ে উঠছে রূপার আচরণে।

ইংরেজ এবং বাঙালি হিন্দুবাবুরা একজোট হয়ে ঝুমুরওলি, ঢপওলি, কীর্তনিয়াদের উচ্ছেদ করার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। সোমপ্রকাশ সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে, 'কৃষ্ণলীলা বর্ণনাবসরে রাস ও বস্ত্রহরণাদি বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অশিক্ষিত যুবতীর চিত্ত অবিচলিত থাকা সম্ভাবিত নয়... যাহারা কুলকামিনীদিগকে কথকতার স্থলে গমণের অনুমতি দিয়া থাকেন, তাহাদিগের সতর্ক হওয়া উচিৎ।'

যেন চিত্তবিচলিত হওয়ার অধিকার একমাত্র পুরুষের, তারা বাইজির ঘরে পড়ে থাকবে, আদিরসের গান শুনবে, কৃষ্ণলীলা রচনা করবে, কিন্তু মেয়েরা দেখলে, শুনলে, করলেই গেল গেল রব ওঠে। পুরুষ যেন জন্মেছে নারীর ওপর খবরদারি করতেই, আর নারীরা তাদের খেলার পুতুল!

রূপার গা জ্বলে যায় এ-সব দেখলে-শুনলে। কেন রে তোরা আমার ওপর খবরদারি করবি? আমি কম কীসে?

মালিনী হেসে বলে, ওই যে কথায় বলে না, 'দরবারে না মুখ পেয়ে ঘরে এসে মাগ ঠেঙায়'। পুরুষগুলো সব ওরকম। ওই বাবুদের দেখ না, ইংরেজের কাছে মান পায় না, ঘরের বউয়ের ওপর কর্তারি ফলাচ্ছেন।

কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়। বাঙালি হিন্দুবাবুরা ঘরের মেয়েদের অশিক্ষিত

করে ঘরে আটকে রেখেছে তাই ইংরেজরা তাদের অনগ্রসর বলে উপহাস করে, আর বাবুদের তত রোখ চেপে যায়। নিজেদের উদারতা প্রমাণ করতেই এক-এক করে স্ত্রীশিক্ষার অনুমতি দিচ্ছিলেন তাঁরা। তবে শিক্ষা দিলেও স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নন বেশিরভাগ ভদ্রজন। পাছে নিম্নবর্গের স্বাধীন মহিলাদের দেখে ভদ্রমহিলারাও গৃহবিপ্লব করে বসেন, সেই দুশ্চিন্তায় তাঁরা খুব কাতর। তাই তো অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে ঢপওয়ালি, খেউড়ওলিদের মেলামেশা বন্ধ করতে চান বাবুরা। জ্ঞানদা স্বর্ণর মতো উচ্চশিক্ষিত মেয়েরাও তাই এই লোকসংস্কৃতির ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে শিখেছেন।

সৌদামিনী ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, রূপা মেয়েটা কোথায় গেল রে? মালিনীর পিছু পিছু বেরিয়ে গেল নাকি? আমার হয়েছে জ্বালা, মা এই আপদটাকে ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গেলেন। আঁচলটা গাছকোমর করে বেঁধে আবার বললেন, নে মানদা, অনেক তরকারি হয়েছে, এইবেলা পাকঘরে পাঠিয়ে দে।

তোমরা ওকে ঠিকমতো শাসন করতে পারছ না, জ্ঞানদা ঘোষণা করেন, এ-বাড়ির সংস্কৃতির কোনও ছাপই পড়ছে না ওর ওপর। পশ্চিমের মিহি তাঁতের শাড়ি পরা, খোঁপায় ফুল লাগানো জ্ঞানদার দিকে অপাঙ্গে তাকিয়ে সৌদামিনী মনে মনে বলেন, হুঁ, ফুলবিবি আবার মাস্টারনিগিরি শুরু করলেন।

ঝুড়িতে স্তূপাকৃতি তরকারি গোছাতে গোছাতে মানদা বলে ওঠে, এক গাছের শেকড় কি অন্য গাছে লাগে গো বোঠান? যাতই শেখাও, ও শিখবে না।

সেটা কোনও কথা নয় মানদা, এবার স্বর্ণ বললেন, আমাদের দাদামশায়কেই তো বড়দাদামশায় দত্তক নিয়েছিলেন, তবে হ্যাঁ, দ্বারকানাথ এই বংশেরই অন্য শাখার সন্তান। রূপাকে শাসন করা দরকার।

সৌদামিনী মুখ ভার করে জানান, ওকে শাসন করা খুব শক্ত, বকাঝকা করলে আগে মায়ের আঁচলের তলায় লুকোত আর এখন নতুনবউয়ের ঘরে পালায়। ছেলেপিলে হয়নি বলে নতুনবউ ওকে আগলে রাখে।

নতুন বোঠানের সব ভাল, কিন্তু এ বয়সে একটাও বাচ্চা এলনি। মানদার মুখ থেকে কথা খসতেই শরৎকুমারী বললেন, সে যদি বলো, কাদম্বরীর জন্য আমার মায়াই হয়, অমন লক্ষ্মীমন্ত রূপ, মেয়েটার এত গুণ, কিন্তু বাঁজা।

জ্ঞানদা সুপুরি কাটা থামিয়ে বলেন, তোমার ওর জন্য মায়া হচ্ছে সেজদি,

আমি ভাবছি নতুনঠাকুরপোর কথা, আট বছর হয়ে গেল বিয়ের, তার বোধহয় আর সন্তানের মুখ দেখা হল না। শুষ্ক জীবনটাকে সাহিত্য দিয়ে, ব্যাবসা দিয়ে ভরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

জ্ঞানদার খোঁপায় রুপোর কাঁটা লাগাচ্ছিলেন স্বর্ণকুমারী, তিনি কিন্তু অন্যসুরে বলেন, কী করবে বেচারি নতুনবউঠান, হয়তো বন্ধ্যানারী, অথচ ওর মনটা কত স্নেহময়। আমি আমার লেখার কাজ নিয়ে থাকি বলে বাচ্চাদের কোলে নেওয়ারও সময় পাই না কিন্তু নতুনবউঠান সবকাজের মধ্যেও আমার ছোট মেয়েটাকে নিয়ে কত আদর যত্ন করে, রূপাকে কত আগলে রাখে আর রবি তো বলতে গেলে ওর কাছেই মানুষ।

ইতিমধ্যে দাসীরা পাথরের থালায় থালায় জলখাবারের ফল সাজিয়ে এনেছে। নীপময়ী চুপচাপ স্বর্ণর কথা শুনছিলেন, থালা থেকে দু'-একটি আঙুর মুখে দিয়ে এবার বললেন, রবিকে নিয়ে অত বাড়াবাড়ি বাপু আমার ভাল্লাগে না, আগে তো দেওর বউঠানের এত মাখামাখি দেখিনি, সে তোমরাই চালু করেছ মেজদি। তুমি যেমন জ্যোতিকে একেবারে মাথায় তুলেছিলে, এখন নতুনবউ রবিকে তুলছে। দেওর-বউঠানের ভাব ভাল, অতিভাব চোখে লাগে।

তাতে আবার দোষের কী দেখলে সেজো? বিরক্ত হন জ্ঞানদা, পরিবারের মধ্যে এমন সহজ মেলামেশায় মনের বিকাশ হয়। কাব্যসাহিত্যের আদানপ্রদানে মন বড় হয়। তুমি যে ঘরে বসে এত ভাল গান শিখলে, বাইরের মানুষকে শোনাও না কেন?

নীপময়ীও বিরক্ত, তা মেজদি, তোমার গায়ে লাগছে কেন? আমার তো ঘরেই ভাল লাগে। গান শিখেছি নিজের জন্য, বাইরের লোক ডেকে শোনানোর জন্য তো নয়। পরদা উঠে গেলেও একটা আব্রু থাকা ভাল, তেতলার ছাদে আসর জাঁকিয়ে একগাদা পরপুরুষের সামনে মক্ষীরানি হয়ে বসে থাকা আমার পোষাবে না আর তোমার মতো পার্টিতে গিয়ে সাহেবমেমদের সঙ্গে বলডান্সও করতে পারব না।

বউয়েরা নিজেরাই নিজেদের ঠেস দিচ্ছে। সৌদামিনী কথা ঘোরানোর জন্য দাসীদের হুকুম দেন, যা তো রূপাকে খুঁজে আন, ধরে আন যেখান থেকে পারিস। দেখি আজ তার কতবড় বুকের পাটা।

মেয়েমহলের তিক্ততায় আর মন বসে না স্বর্ণর, ফলাহার শেষ হলে তিনি জ্ঞানদাকে টেনে নিয়ে যেতে চান তেতলার দিকে, ভারতীর আসরে।

জ্যোতির ঘরেই আপাতত ভারতীর দপ্তর। সেখানে যথারীতি রবি, জ্যোতি, অক্ষয় ও কাদম্বরী মহা উৎসাহে সম্পাদকীয় কাজকর্ম করছেন। লেখা জমা করার জন্য একটি হলুদ টিনের বাক্স কেনা হয়েছে ঠাকুরবাড়ির তহবিল থেকে। সেটা থাকে কাদম্বরীর জিম্মায়।

কফি ও বড়া সহযোগে সেখানে তখন মহা কর্মযজ্ঞ চলছে। রবি ও অক্ষয় লেখা পড়ে বাছাই করছেন, সাজাচ্ছেন। কাদম্বরী মহা উৎসাহে বাছাই করা লেখা সাজিয়ে রাখছেন হলুদ টিনের বাক্সে। বাড়ির অন্য মেয়েদের থেকে তিনি যেন আলাদা, কাজের মধ্যে থাকলেও মনে হয় তিনি যেন দুটো ডানায় উড়ে বেড়াচ্ছেন মাটি থেকে ওপরে।

জ্যোতি হিসেবপত্র নিয়ে ব্যস্ত। ভারতীর খরচ জোগাতে দ্বিজেন ও জ্যোতি দু'জনেই পঞ্চাশ টাকা করে জমা করেছেন। অল্পস্বল্প গ্রাহকচাঁদাও উঠছে। দপ্তরে বেশ কিছু গ্রাহক আবেদন জমা পড়েছে, তা নিয়ে সকলের হইচই। প্রথম সংখ্যার আগে গ্রাহক সংগ্রহের জন্য হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দেওয়ার আইডিয়াটা কাজে লেগে গেছে। বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল,

'আগামী শ্রাবণ মাস হইতে ভারতী নামে সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতি নানা-বিষয়িণী এক খানি মাসিক সমালোচনী পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। এখনকার সুপ্রসিদ্ধ লেখকের মধ্যে অনেকে এই পত্রিকার সাহায্য করিবেন। ইহার কলেবর রয়েল ৮ পেজি ৫ ফর্ম্মা। মূল্য বার্ষিক ৩ তিন টাকা। বিদেশে বার্ষিক [...] ছয় আনা ডাকমাসুল লাগিবে। ইহা প্রতি মাসের ১৫ই প্রকাশ হইবে। যাঁহারা ইহার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন তাঁহারা যোড়াসাঁকো দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন ৬ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাসের নামে পত্র লিখিবেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদক।'

কাগজ বেরলেই দু'জন বিলি সরকার হাওড়া ও কলকাতায় লেখক, গ্রাহক ও বিশিষ্টদের কাছে পৌঁছে দেন। মফস্‌সলে ডাক মারফত ৮৪ কপি পাঠানো হল প্রথমদিনেই।

বাড়ির মধ্যে থেকেই বেশিরভাগ লেখা সংগ্রহ হয়ে যায়। প্রধান লেখক রবি, জ্যোতি ও অক্ষয়। প্রথম সংখ্যায় রবির কবিতা ও গল্প একসঙ্গেই

প্রকাশিত হল। অক্ষয় কবিতা ছাড়াও সরস সাহিত্য আলোচনায় হাত পাকাচ্ছেন। দ্বিজেন মাঝে মাঝেই ভাবগম্ভীর প্রবন্ধ লেখেন, আবার গঞ্জিকা নামে কৌতুক বিভাগেরও তিনি প্রধান রচয়িতা।

স্বর্ণ ও জ্ঞানদা জ্যোতিদের ঘরে এসে পৌঁছলে আসর জমে উঠল। রবি স্বর্ণকে বললেন, দেখো ন'দিদি, কত মেয়েরাও কবিতা পাঠিয়েছেন। অবশ্য মেয়েরা একটু চোদ্দোমাত্রা মিলিয়ে লিখলেই সবাই ধন্য ধন্য করছে, আর ছেলেদের বেলায় যত সূক্ষ্মবিচার।

স্বর্ণ তর্ক তোলেন, তা কেন বলছিস রবি, মেয়েদের লেখাও যথেষ্ট চুলচেরা বিচার করা হয়। এত যে মেয়েদের কবিতা এসেছে, কোনওটাই তোর ভাল লাগেনি?

রবি মোটেই মেয়েদের লেখার গুণ বিচার করতে চায় না, মেয়েদের নিয়ে কাব্য লিখতে চায়, কাদম্বরী হাসিমুখে ঠাট্টা করেন। মেয়েরা যেন শুধু কবির প্রেরণা হয়ে থাকবে, কবিতা লিখবে না।

রবিও হেসেই জবাব দেন, তা সত্যি নতুনবউঠান, তুমি নিজেই তো এই অধম কবির ভগ্নহৃদয়ের মূর্তিমতী প্রেরণা। পাতলা সুতির পাজামার ওপরে গেরুয়া ফতুয়া পরে আছেন রবি। যেন এক নগরবাউল উঠে দাঁড়িয়ে কাদম্বরীর দিকে নাচের ভঙ্গিতে হাত ঘুরিয়ে গেয়ে উঠলেন, 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা', হে বউঠান।

বাবা রে, জ্ঞানদা বললেন, কাদম্বরীর প্রশ্রয়ে রবির মুখে যে কাব্যের খই ফুটছে। রবি আর কিশোরটি নেই, রীতিমতো বড়দের ভাষায় কথা বলে।

অক্ষয় কৌতুকে যোগ দেন, আপনি জানেন না মেজোবউঠান, শুধু রবির নয়, উনি আমাদের ত্রিমুণ্ডী হেকেটি। জ্যোতি, রবি আর আমি তিনজনেই সারাক্ষণ ওঁর প্রেরণার জন্য কাড়াকাড়ি করছি।

সম্প্রতি মহাকবি বিহারীলালও সেই দলে যোগ দিয়েছেন মনে হচ্ছে। দুষ্টু রবি ফোড়ন কেটে বললেন।

স্বর্ণ এবার বলেন, দাঁড়ান অক্ষয়বাবু, লাহোর থেকে আপনার শরৎকুমারী আসুন না, তখন লাহোরিণীর সামনে আপনার সব জারিজুরি বেরিয়ে যাবে।

জ্ঞানদা ভাবেন, কী আশ্চর্য, জ্যোতি কী করে বিগলিত মুখে বউয়ের গুণগান শুনছে? তিনি জানতে চান, কী নতুন, তোমার বউ যে সব তরুণ কবিদের হৃদয়হরণ করছে, তোমার বুকে কোনও জ্বালা ধরছে না?

জ্যোতি জবাব দেওয়ার আগেই কাদম্বরী বলেন, আর উনি যে নাটকের রিহার্সালে গিয়ে কত অভিনেত্রীর হৃদয় হরণ করছেন, মেজদি কি তার খবর রাখ? এক-একদিন তো বাড়ি আসতেই সময় পান না।

এ-কথা সত্যি যে আজকাল মাঝে মাঝে রিহার্সালে গিয়ে আটকে পড়েন জ্যোতি। আর এ-কথাও সত্যি, যে অভিনেত্রীর জন্য সব বাবুরা পাগল সেই স্বয়ং নটী বিনোদিনীই জ্যোতি ঠাকুরের রূপগুণে মুগ্ধ। কিন্তু আট বছরের পুরনো স্ত্রীর প্রতি জ্যোতির টান এখনও এতটুকু কমেনি।

কাদম্বরীর গলায় চাপা অভিমান ঠিকই টের পান জ্যোতি, বলেন, যখন বাইরে যাই আমার হৃদয়টা তো তোমার সিন্দুকেই জমা রেখে যাই বউ, তবু তোমার মনে সন্দেহ?

কী জানি, আমি তো তাদের মতো ছলাকলা পারি না! কাদম্বরী নিচু গলায় বলেন। তার মতো সুন্দরীও নই।

জ্ঞানদা তাঁকে ধমক দেন, সে কী নতুনবউ, তুমি এমন করে ঘরে আটকে দিতে চাও নতুনকে? ওর কত নামযশ, কত ব্যস্ততা। না হয় দু'-চারজন নটী মুগ্ধ হল, তাতেই বা কী? মন ছোট কোরো না। তোমারও তো রূপমুগ্ধ কম দেখছি না।

জ্ঞানদার গলায় অসন্তোষ চাপা থাকে না। ঘরের মধ্যে আবার যেন একটা ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়ে গেছে দুই রূপসি মেধাবিনীর। জ্ঞানদার গায়ে লেপটে থাকা মিহি তাঁতের হলুদ চান্দেরিতে ঝড়ের পূর্বাভাস। আর কাদম্বরীর খোলা চুল যেন কালবৈশাখীর বিদ্যুৎ।

জ্যোতি বোঝেন মেজোবউঠান এখনও কাদম্বরীর ওপর অপ্রসন্ন। তাকে ঘিরে এত প্রশংসা যেন ভালচোখে দেখছেন না। কী যে করেন তিনি, এই দুই নারীই তাঁর অতি প্রিয়। কিন্তু প্রথমদিন থেকেই যেন দু'জন দু'জনকে বিষনজরে দেখেছেন। পরিস্থিতি সামলাতে জ্যোতি বলেন, মেজোবউঠান, আমি তো এখনও মুগ্ধ তোমাকে দেখে। আজীবনের মুগ্ধহরিণ। ইনি হেকেটি হলে তুমি 'বর্জিনী'।

তা, বর্জিনী-বউঠান বুঝি শকুন্তলার মতো হরিণ শিশুকে গুণ করেছেন। জ্যোতিকে কটাক্ষ করে অমনি কাদম্বরী বলে ওঠেন।

স্বর্ণ অধীর বোধ করেন এতক্ষণ এ-সব আলোচনায়, তোমরা কি শুধু এ-সব রসের কথা বলবে না ভারতীর লেখাপত্র কিছু পড়ে শোনাবে? দাও না নতুন কী লেখা এসেছে দেখি।

রবি ফাইল থেকে একটি কবিতা এগিয়ে দিয়ে বলেন, দেখো ন'দিদি, অক্রুর দত্তের বাড়ির এক মহিলার রচনা, খারাপ নয়, পড়ে দেখো।

স্বর্ণকুমারী কাগজটি হাতে নিয়ে দেখলেন কবিতার ওপরে মুক্তোর মতো হাতের লেখায় কবির নাম, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। স্বর্ণ পড়তে থাকেন।

তখনই এক দাসী ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকে কাদম্বরীকে আড়ালে ডেকে নিয়ে কী সব ফিসফিস করে। কাদম্বরীও ছুটে বেরিয়ে যান তার সঙ্গে। কী হল খোঁজ নিতে পেছনে জ্ঞানদাও গেলেন। নীচের মহলে তখন হইচই লেগে গেছে, রূপকুমারীকে পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ বলছে সে মালিনীর সঙ্গে গেছে আবার এক দারোয়ান নাকি তাকে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে এক সাহেবের সঙ্গে চলে যেতে দেখেছে।

একটি বালিকাদাসী সৌদামিনীর গায়ে অলিভ তেল মালিশ করে দিচ্ছে, আর তিনি তাকিয়া ঠেস দিয়ে চৌকিতে আধশোয়া হয়ে আরাম নিতে নিতে রাগে টঙ হয়ে কাদম্বরীকে বলছেন, আর নয়, এবার তোমার পুষ্যিকে তাড়াও। ফের এলে আর ঘরে ঢুকতে দেব না। এতদিন অনেক সহ্য করেছি, আর না।

সামনে দাঁড়ানো কাদম্বরী মুখ গোঁজ করে বললেন, মা যাকে এত আদর করে পুষ্যি নিয়েছিলেন, তাকে তাড়িয়ে দিলে যদি তোমার প্রাণে সুখ হয়, আমি আর কী বলব বড়ঠাকুরঝি।

জ্ঞানদা নেমে এসে পরিস্থিতি দেখে সৌদামিনীর পক্ষ নেন, সত্যি নতুনবউ, আর একে ঘরে রাখা যায় না, বাড়ির মেয়েরা ভুল শিক্ষা পাবে। মা না হয় স্নেহের বশে আদর করে কাছে রেখেছিলেন, সে যদি এখন বেয়াড়া হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, তাকে আর ঘরে রাখা যায় না।

কাদম্বরী মানতে চান না, ভুল মনে হলে শেখানো যায়, তোমরা কে কতটা শেখানোর চেষ্টা করেছ বলো তো? আমি জানি ওর মনটা সরল। বিধিনিষেধের গণ্ডি পেরিয়ে মজা দেখতে গিয়ে অনেক ভুল করে ফেলে কিন্তু অন্যায় জেনে করে না। তোমরা এত নিষ্ঠুরভাবে বিচার করলে মা স্বর্গ থেকেও কষ্ট পাবেন।

মায়ের নাম করে তুমি কেন এই বেয়াড়াপনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছ নতুনবউ? জ্ঞানদা ধমকান, আমাদের বাড়িতে কোনও মেয়ে কি কখনও এরকম কাজ করতে সাহস করত? নিজের পেটের মেয়ে হলে তুমি তার এমন বেয়াড়াপনার প্রশ্রয় দিতে?

কাদম্বরীর চোখ জ্বালা করে, মেজোবউঠান তাকে অযথা আঘাত করতে চাইছেন কিন্তু তিনি ঠোঁট চেপে চুপ করে থাকেন।

সৌদামিনীও কাদম্বরীর ওপর রাগ করেন, আমাকে সংসারটা চালাতে হয় নতুনবউ, তুমি ওকে আগলে রেখে অশান্তি জিইয়ে রাখছ। একে তোমার চালচলন নিয়ে বাঁকা কথা শুনতে হয় আমাকে, তার ওপর ওই অবাধ্য মেয়েটাকে পুষছ।

আমার চালচলনে আবার কী দোষ দেখলে বড়ঠাকুরঝি? কাদম্বরী অভিমানী স্বরে জানতে চান।

সে আর শুনে কী হবে বাছা! সৌদামিনী বললেন, নীচের তলায় তো নাম না আজকাল, জানবে কী করে? আঁচলে তেলহলুদের দাগ নিয়ে আমরা খেটে মরছি আর তুমি সক্কালবেলা সেজেগুজে সাহিত্যচর্চা করছ। তাই বলছি সংসারের ব্যাপারে তুমি আর নাক গলাতে এসো না।

কোন কাজটা করিনি ঠাকুরঝি? এবার কেঁদে ফেলেন কাদম্বরী, আমাকে এত কথা শোনাচ্ছ কেন? রূপা তোমাদের চক্ষুশূল না আমি? সৌদামিনীর দিকে তাকিয়ে তিনি মনে মনে ভাবেন, তুমিই বা কম কীসে, চৌকিতে বসে গায়ে তেল মাখাচ্ছ আর হুকুম চালাচ্ছ!

বালাই ষাট, নীপময়ী এবার বললেন, তুমি কেন চক্ষুশূল হবে নতুনবউ? কিন্তু সংসারে থাকতে গেলে সংসারের নিয়ম একটু মানতে হয়, না হলে কথা ওঠে।

কী নিয়ম মানিনি? কাদম্বরী জানতে চান। তাঁর মনে হয় সবাই যেন একযোগে পেছনে লেগেছে। কেউ কি তাঁর হয়ে বলার নেই!

শরৎকুমারীর রূপটান এতক্ষণে শুকিয়ে গেছে, গা থেকে ঘষে ঘষে সর-ময়দা তুলছিলেন, এখন বললেন, ছাড়ো তো ও-সব। ওর বাচ্চা হয়নি, বেচারা নিজের মতো সাহিত্য নিয়ে, বাগান নিয়ে, রূপা আর ঊর্মিলাকে নিয়ে মেতে আছে, থাকতে দাও না।

না, আমি আজ জানতে চাই, দোহাই তোমাদের। শরতের সহানুভূতি পেয়ে কাদম্বরী তাঁর পাশে বসে পড়ে বলেন, আমার বিরুদ্ধে যা যা মনে আছে বলো।

জ্ঞানদার এতক্ষণে মনে হচ্ছে একটু বেশিই আক্রমণ করা হয়ে যাচ্ছে কাদম্বরীকে, তিনি সান্ত্বনা দিতে চান, দেখো নতুনবউ, তুমি ওদের থেকে দূরে

দূরে থাক তো, বাইরের লোকেদের সঙ্গে রোজ মেলামেশা করছ, এ-সব সবাই ঠিক ভালচোখে নিতে পারছে না। পরদা তো আমিই ভেঙেছি, বাইরের পুরুষদের সঙ্গেও যথেষ্ট মিশি। কিন্তু বাড়ির মহিলাদের সঙ্গেও মিলেমিশে থাকি।

কাদম্বরী বলেন, আমি মিশি না এটা ঠিক কথা না মেজদি। ওরাই বরং আমাকে দূরে রাখে, কেন সেটাই বুঝি না আমি। সেজন্য নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি তেতলার ঘরে, সেখানেই নিজের জগৎ রচনা করেছি।

বোঠান তুমি একটু ষষ্ঠী ঠাকরুনের পুজো দাও না, মানদা দাসী বলল, এত বয়সে ছেলেপুলে হয়নি, দোষ কেটে যাবে। নিজের কোলে একটা এলে রূপা রূপা করে পাগলামিও সারবে।

কাদম্বরী ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁর ভেতরের কষ্টটাকে হঠাৎ এরা সবাই মিলে যেন উলঙ্গ করে দিয়েছে। সন্তান না হলে কি নারীজন্মের কোনও দাম নেই? শুধু মা হতে পারছেন না বলে বাড়ির মেয়েমহলে সবাই তাঁকে পর করে দেবে?

তাঁকে কাঁদতে দেখে স্বর্ণর খারাপ লাগে, এগিয়ে এসে পিঠে হাত দিয়ে বলেন, তুমি তো অনেক সৌভাগ্য পেয়েছ, না হয় সন্তান হয়নি, কাঁদছ কেন?

নীপময়ী বললেন, হ্যাঁ, আমাদের তো কখনও স্বামীর সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে ময়দানে হাওয়া খাবার সৌভাগ্য হয়নি, আর ভক্ত পরিবৃত হয়ে গান-কবিতা শোনাও হয়নি। কাঁদতে হয়তো আমরা কাঁদব, তুমি কেন?

বিরক্ত হয়ে স্বর্ণ বললেন, আঃ সেজোবউঠান, শুধুমুধু নতুনবউঠানকে ঠেস দিচ্ছ কেন? তুমি যা করনি অন্য কেউ সেটা করতে পারবে না তা তো হয় না। সেজদাদা যখন তোমাকে ওস্তাদের কাছে গানের তালিম দেওয়ালেন, তখনও অনেকে ভুরু কুঁচকেছিল, তাতে কি তুমি থেমে গেছ? তোমার মেয়েদের যে অন্যদের সঙ্গে মিশতে দাও না, আলাদা করে গান শেখাচ্ছ, পড়াচ্ছ, তাতে কি আমরা আপত্তি করছি? বাবামশায় আমাদের সবাইকে নিজের মতো করে জীবন গড়ে নিতে দিয়েছেন, তাতে তুমি আমি কেন আপত্তি জানাব?

শরৎকুমারীও অশ্রুময়ী কাদম্বরীকে জড়িয়ে ধরে বললেন, সত্যি বাপু, নতুনদাদার আদরের বউটাকে কাঁদাচ্ছ কেন তোমরা?

জ্ঞানদার অবশ্য এই কান্না ন্যাকামি মনে হয়, কাদম্বরী কেঁদেই বাজিমাত

করবে ভাবছে। কিন্তু তিনি তা মুখে বলেন না। বরং বললেন, নতুনবউ, তুমি নিজের মতোই থাকো কিন্তু ওই রূপাটাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরো না, তা হলেই কেউ কিছু বলবে না তোমাকে।

কাদম্বরী কান্না থামিয়ে হঠাৎ ফুঁসে ওঠেন, আমার যা হয় হোক মেজদি, কিন্তু প্রাণ থাকতে আমি ওই অসহায় নিরপরাধ মেয়েটাকে তোমাদের ক্রোধানলে বলি হতে দেব না।

এই বিদ্রোহে যেন আগুনে ঘি পড়ে। জ্ঞানদা, নীপময়ী, সৌদামিনীর মুখ রাগে গনগনে। আঁচলের চাবির গোছা খুলে মেঝেতে ছুড়ে দিয়ে সৌদামিনী বললেন, ভাল, তবে আজ থেকে সংসারের ভার তুমিই নাও, আমাকে বেগার খাটার দায়িত্ব থেকে ভারমুক্ত করো নতুনবউ।

মেয়েদের কলহের ঝনঝনানির সঙ্গে তাল মিলিয়ে রুপোর কারুকাজ করা চাবিটি ঝমঝম শব্দে মেঝের ওপর আছড়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ নৈঃশব্দ্যের পর জ্ঞানদা বললেন, তা হলে বাবামশায়ের কাছে চিঠি লেখা হোক, তিনিই ঠিক করুন রূপার ভবিষ্যৎ। তিনি রাখলে রাখবেন, না রাখলে যা বলবেন তাই হবে।

আর চাবিটা? সৌদামিনী জিজ্ঞেস করেন, সংসারের হাল কে ধরবে?

সংকটকালে জ্ঞানদাই সিদ্ধান্ত নেন, চাবিটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে আবার সৌদামিনীর আঁচলে বেঁধে দিয়ে বলেন, ছোট ছোট বিষয়ে মাথা গরম করতে নেই বড়ঠাকুরঝি। তোমার এই আঁচলেই চাবিটা ভাল মানায়।

কাদম্বরীর মনে হয় চারদিকে সবাই তাঁর বিরুদ্ধে, তাঁকে নিয়েই এত অশান্তি। তিনি তো কিছুই চাননি, শুধু নিরপরাধকে বাঁচাতে চেয়েছেন। অশ্রু চেপে একা একাই তেতলার নির্জন কোণের দিকে পা বাড়ান তিনি।

স্বর্ণ তাঁর আড়াই বছরের ফুটফুটে মেয়ে ঊর্মিলাকে কোলে করে দৌড়ে আসেন তাঁর দিকে, কাদম্বরীর কোলে মেয়েটাকে তুলে দিয়ে বলেন, নতুনবউঠান, আজ থেকে ঊর্মিলা তোমার মেয়ে, তোমার কাছেই থাকবে।

ঊর্মিলার দেবশিশুর মতো হাসিতে বারান্দার কলহতিক্ত আসরটা যেন আলো হয়ে যায়। তাকে কোলে চেপে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলেন কাদম্বরী, চোখে তখন খুশির অশ্রু।

৯

দীপনির্বাণ

পৃথিবীর সেই বিরল সৌভাগ্যবতীদের একজন স্বর্ণকুমারী, যাঁর লেখিকা হওয়ার পথে গোলাপের পাপড়ি বিছিয়ে দিয়েছেন তাঁর স্বামী, ছেলেমেয়েদের দেখাশোনায় বা সংসারের কাজে আটকে স্ত্রীর লেখাপড়ায় যাতে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে সে দিকে কড়া নজর জানকীনাথের। তিন ছেলেমেয়ে জ্যোৎস্নানাথ, হিরণ্ময়ী ও সরলাকে নিয়ে প্রথমে শেয়ালদার বৈঠকখানা রোডে বাসা বেঁধেছিলেন জানকী ও স্বর্ণকুমারী। বাচ্চাদের দেখার দায়িত্ব দাসীদের। এ ব্যাপারে স্বর্ণ মায়ের চেয়েও উদাসীন।

রোজ বিকেলে হাত মুখ ধুইয়ে পরিষ্কার জামা পরিয়ে শেয়ালদা স্টেশনে বেড়াতে নিয়ে যায় দাসীরা। দাসীর সঙ্গী দারোয়ান দাঁড়িয়ে থাকা বগিতে বাচ্চাদের বসিয়ে রেখে যুবতী দাসীর সঙ্গে একটু রসের কথাবার্তা বলে। ওই বিকেলের লোভনীয় অবসরটুকুর জন্য বাচ্চাদের মতো রোজই দাসী-চাকরেরাও মুখিয়ে থাকে। কিন্তু একদিন বাচ্চাদের নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বগি শান্টিং করার জন্য হঠাৎ চলতে শুরু করল। সরলা কেঁদে উঠে বলে, একী, একী গাড়ি চলছে? কোথায় যাচ্ছে?

দাসীও ভয়ে চিৎকার করে উঠলে দারোয়ান তার বীরত্ব দেখিয়ে বগির সঙ্গে সঙ্গে হাত নেড়ে হাঁটতে লাগল। দু'মিনিটের মধ্যেই অবশ্য গাড়ি থেমে গেল। ছেলেমেয়েদের এ-সব অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি স্বর্ণ বা জানকী কখনও জানতে পারেন না। তবে বাচ্চা জন্মানোর পর জানকীর বাবামশায় আর রাগ করে থাকতে পারেননি। মাঝে মাঝেই তিনি এসে নাতিনাতনিকে আদর করে যান, বাচ্চারাও সেই স্নেহস্পর্শটির জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে।

কিছুদিন পর স্বর্ণ ও জানকী সিমলেপাড়ায় মিনার্ভা থিয়েটারের পাশের গলিতে

একটি দোতলা বাড়িতে উঠে এলেন। সেখানে চার বছরের সরলা একদিন খেলতে খেলতে ছাদের মার্বেল সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধাল। সামনের দুটি দাঁত ভেঙে মেজেতে গড়াগড়ি। দাসীটি নিজেকে নির্দোষ দেখানোর জন্য সরলাকে এমন বকতে লাগল যে সে ভয়ে কাঁদতেও পারল না।

একে অসহ্য ব্যথা তার ওপর দিদি হিরণ্ময়ী বলল, তোর দাঁত ভেঙেছে, চিরকাল ফোকলা থাকবি।

দাসীরা আবার আরও ভয়ংকর কথা বলল, সরলাদিদির বিয়ে হবে না, বর এসে ফোকলা দাঁত দেখে ফিরে যাবে।

অনেক শোরগোলের পর জানকীনাথ নেমে এসে ওষুধ লাগিয়ে দিলেন কিন্তু তপস্যারত স্বর্ণকুমারীর কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তাঁর ধারণা আতুপুতু না করলেই বাচ্চারা স্বাবলম্বী হবে। বাঙালি মায়েরা বাচ্চা মানুষ করতে গিয়ে যেভাবে নিজের জীবন বিসর্জন দেয় সেটা তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়।

মাতৃত্ব নিয়ে জ্ঞানদার বিচার প্রিয় ঠাকুরঝির থেকে একদমই আলাদা। বোম্বাই প্রবাসে প্রায়ই এ নিয়ে তর্ক বেধে যেত ননদ-ভাজে। স্বর্ণর মতে মাতৃত্ব একটি অনিবার্য জৈবিক ঘটনা, তা নিয়ে বেশি মাতামাতি করলে মেয়েদের লেখাপড়া করা সম্ভব না। জ্ঞানদা কিন্তু মনে করেন মেয়েদের প্রগতির পথে মাতৃত্ব কোনও বাধা হবে না, বরং যে সন্তানদের তিনি স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে এনেছেন, অগ্রগতির পথে তাদের পেছনে ফেলে নয়, বরং সঙ্গে নিয়েই এগোতে হবে।

এখন স্বর্ণকুমারী সিমলের বাড়ি ছেড়ে জোড়াসাঁকোয় আছেন, জানকীনাথ ব্যারিস্টারি পড়তে গেছেন বিলেতে। বাইরের দিকের তেতলায় জ্যোতিদাদার ঘরেব পাশেই স্বর্ণর শোবার ঘর। একেবারে যাকে বলে, নিজস্ব কুঠুরি। এখানে সারাদিন তিনি লেখেন, পড়েন, ভারতী সম্পাদনায় সাহায্য করেন নতুনবউঠান ও জ্যোতিদাদাকে। এই ঘর সরস্বতীর আপন দুনিয়া।

বাচ্চারা থাকে অনেক দূরে, ভেতরে মহলের তেতলায় দাসীদের সঙ্গে। দিনান্তে একবারও তাদের সঙ্গে দেখা হয় না বহুদিন। মায়ের সঙ্গ না পেলেও জোড়াসাঁকো বাড়ির বিশালত্ব, মাস্টার পণ্ডিত, দাসদাসী, ভাইবোনেদের সঙ্গে মেলামেশা, চলাফেরার মধ্যে দিব্যি দিন কেটে যায় সরলা, হিরণ্ময়ী,

জ্যোৎস্নানাথের। অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে একটু পার্থক্য ছিল যে, ঝি চাকর থাকলেও তারা মাঝে মাঝে মা-বাবার সংসর্গ পেত কিন্তু স্বর্ণর শিশুরা একেবারে তাদের হাতেই সমর্পিত।

তিনজনের তিনটি আলাদা দাসী, তারা যে যার ভাগের বাচ্চার জন্য ভাল খাবারটুকু জোগাড় করার চেষ্টা করে। নাওয়া, ধোয়া, পরিচ্ছন্নতা দেখে। তবে স্বভাব অনুযায়ী দেখাশোনার তারতম্য হয় তো বটেই। সরলার মঙ্গলা দাসী হিন্দুস্তানি গয়লানি, গায়ের রং যেমন ঘোর কালো তেমনি তার মেজাজ। দেখভাল করে বটে, তবে তার কথার একচুল এদিক ওদিক করলেই মেরে সরলার ফরসা চামড়া লাল করে দেয়। তখন তার মার প্রতি খুব অভিমান হয়। সরলার আগের বাড়ির যাদুদাই স্নেহের টানে মাঝে মাঝেই দেখতে আসে হাতের ঠোঙায় কিছুমিছু খাবার নিয়ে। সে বড় স্নেহপ্রবণ, আদরে চুমুতে ভরিয়ে দেয় এলেই। কিন্তু তাকে দেখলেই ভাইবোনেরা বড্ড হাসিঠাট্টা করে বলে সরলার লজ্জা করে। ওদিকে সতীশ পণ্ডিতের কাছে পড়তে বসেও আরেকপ্রস্থ মার খেতে হয় বালক-বালিকাদের। তিনি বাড়িতেই থাকতেন, ফলে পাঠশালার বাইরেও যখন তখন তাঁর রুলের বাড়ি গায়ে পড়ার সম্ভাবনাও সামলে চলতে হয় বাচ্চাদের। সকালে উঠে দুধ খেয়েই বাইরের পড়ার ঘরে তাঁর কাছে আসতে হয়, তিনি প্রথমেই দেখেন দাঁত ঠিকমতো মাজা হয়েছে কি না, না হলেই রুলের গুঁতো।

সরলা, হিরণ্ময়ীর স্কুলে যাতায়াত শুরু হয়েছে। স্কুল থেকে ফিরেই শশীপণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত পড়া, তারপরেই চলে আসেন গানের মাস্টারমশাই ভীমবাবু। বড়মেয়ে হিরণ্ময়ীর গুণপনা নিয়ে খুশি ছিলেন স্বর্ণকুমারী, এবার রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের স্কুল থেকে আসা ভীমবাবু যখন সরলার গানের গলা নিয়ে ভাল রিপোর্ট দিলেন, সেই প্রথম মেজোমেয়ের দিকে ভাল করে নজর পড়ল তাঁর।

শরৎকুমারীর মেয়ে সুপ্রভা বিশেষ পড়াশোনার ধার ধারে না, কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধির জোরে সে বালিকামহলের নেত্রী। সরলার গান প্র্যাকটিসের সময় বেড়ে যাচ্ছে দেখে সে সরলাকে উদ্ধার করার একটা উপায় বলল, অতক্ষণ ধরে প্র্যাকটিস করতে যদি ভাল না লাগে, দরকার কী করার?

সরলা ভয় পেয়ে যায়, সে কী করে হবে? প্র্যাকটিস না করে তো উপায় নেই।

আছে বইকী, অকুতোভয় সুপ্রভা বলে, ওই সময়ে ঘড়ির কাঁটাটা রোজ একবার করে এগিয়ে দিলেই হবে।

ওরে বাবা, সে আমি পারব না, সরলা শিউরে ওঠে এই প্রস্তাবে।

সুপ্রভা বলে, ঠিক আছে, আমি করে দিচ্ছি। একটি চেয়ারের ওপর উঠে ঘড়ির কাঁটা কুড়ি মিনিট এগিয়ে দিয়ে সে চলে যায়।

কিছুক্ষণ পরে স্বর্ণ এসে কিছু একটা সন্দেহ করলেন। সরলা ঘড়িতে হাত পাবে না, কিন্তু সুপ্রভাকে এ ঘরে ঘুরঘুর করতে দেখেছেন তিনি। বুঝে নিলেন সবটাই কিন্তু দিদির মেয়েকে তো শাসন করা যায় না আর আসল দোষ তো সরলার। স্বর্ণ ঠিক করলেন চড় মেরে শাসন করবেন সরলাকে। কিন্তু ঘরে অন্য সকলে আছে, তাদের সামনে চড় মারা স্বর্ণর বিচারে অশোভন। তাদের ঘর থেকে চলে যেতে বলে তারপর একটি কোমল চপেটাঘাতে শাস্তি দিলেন মেয়েকে। কিন্তু মঙ্গলার বিরাশি সিক্কার চড়ের কাছে মায়ের এই চড় তো আদরমাত্র। লোকের সামনে মারলে বালিকার আত্মমর্যাদায় লাগবে, স্বর্ণর এই সংবেদনশীলতায় সরলার বালিকামনে যেন আলোর ছোঁয়া লাগে। শাস্তি পেয়ে সরলা এত খুশি কেন তা বুঝতে পারলেন না স্বর্ণ কিন্তু তারপর থেকে গানের তালিমটা কমিয়ে দিলেন আধঘণ্টা।

হেমেন আর নীপময়ীর সন্তানরা ঠাকুরবাড়িতে আর-এক রকম কড়া শাসনে থাকে, বাবা-মায়ের শাসন। অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে মেশার হুকুম নেই তাদের, নিজেদের মহলে গান ও পড়ার নিয়মনিগড়ে একদম বাঁধা। একটু বিচ্যুত হলেই হেমেন তাদের উত্তমমধ্যম লাগান।

স্বর্ণর ছোট মেয়েকে অবশ্য এ-সব কঠিন নিয়ম স্পর্শ করে না, তাকে নিয়ে সারাক্ষণই মেতে থাকেন কাদম্বরী। তাঁর নিঃসন্তান মাতৃহৃদয়ের সব স্নেহমমতা দখল করে নিয়েছে ঊর্মিলা। শুধু সে যখন থেকে স্কুলে ভরতি হয়েছে, সরলা, হিরণ্ময়ীর সঙ্গে এক পালকিতে যাওয়ার সুবাদে তিনবোনের মেলামেশা হচ্ছে কিছুটা।

জানকীনাথ এখন প্রবাসে। স্বর্ণ এই পুরো সময়টা সরস্বতীর সেবায় ব্যয় করবেন ঠিক করেছেন। মেয়েরা লিখতে পারে না— এই বদনাম ঘোচাতেই হবে তাঁকে। এতদিন ধরে লিখে সবে শেষ করেছেন তাঁর প্রথম উপন্যাস দীপনির্বাণ। টডের রাজস্থানি কাহিনি 'অ্যানালজ অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিজ অভ রাজস্থান' ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের খুব প্রিয় বই। বঙ্কিমচন্দ্রের

কপালকুণ্ডলার প্রভাবে স্বর্ণ লিখতে চেয়েছেন ঘটনাবহুল একটি ঐতিহাসিক কাহিনি।

জ্যোতিদাদার মতো তিনিও রাজপুত নায়কদের বীরগাথায় মুগ্ধ। জ্যোতিদাদার মতোই মুসলমান ও ইংরেজ শাসনের চাপে কোণঠাসা হিন্দু সংস্কৃতিকে লেখার মাধ্যমে জাগিয়ে তোলার ব্রত নিয়েছেন স্বর্ণও। রবি কয়েক বছর আগে শান্তিনিকেতনে গিয়ে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামে একটি বীররসের কবিতা লিখেছিলেন। স্বর্ণও মহম্মদ ঘোরির হাতে পৃথ্বীরাজের পরাজয় নিয়ে তাঁর দেশাত্মবোধক উপন্যাসের উপাদান আহরণ করেছেন এই রাজপুত ইতিহাস থেকে। আর্য অবনতির এই কাহিনিতে পৃথ্বীরাজ আর্যদের লুপ্ত শৌর্যের প্রতীক। স্ত্রীচরিত্রগুলিও সেইসব কল্পনার আর্যনারীর প্রতিচ্ছবি, যাদের জন্য গর্ব হয়। জ্যোতির ধারণা, আর্যভারতকে স্বদেশি মন্ত্রে দীক্ষিত করতে সাহায্য করবে এই উপন্যাসটি, তাই বইটি প্রকাশের ব্যাপারে জ্যোতি ও কাদম্বরী অত্যন্ত উৎসাহী। গ্রন্থ প্রকাশের তোড়জোড় চলছে।

লেখা ছাড়া স্বর্ণকুমারীর বাকি সময়টা কাটে নতুনবউঠান আর জ্যোতিদাদার সঙ্গে, ভারতীর মজলিশে। মাঝে মাঝে কখনও খেয়াল হলে নীচের মহিলাদের আসরে গল্প করতেও নামেন।

ঠাকুরবাড়ির উঠোনে সেদিন বিশু তাঁতিনি এসেছে। বিরাট শাড়ির পুঁটলি ঘিরে জমা হয়েছে মেয়ে-বউরা। কাদম্বরীর হাত ধরে স্বর্ণও নেমে এলেন নীচে।

একটি মেঘডম্বরু বিষ্ণুপুরী সিল্কের শাড়ি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে কাদম্বরী বলেন, বেজায় দাম বলছ বিশু।

শাড়িওলি বলল, কিন্তু বোঠান, এ কাপড়ের জাত আলাদা, দু'-তিন পুরুষ ঠেসে পরলেও ছিঁড়বে না। আর যিনি পরবেন তাকে দেখাবে যেন রাজরানি।

দু'-তিন পুরুষ কী গো, আমরা কি পুরুষমানুষ নাকি? হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়ে রূপকুমারী।

সৌদামিনী সুপুরি কাটছিলেন, তিনি খোঁজেন লুপ্ত হয়ে যাওয়া এক বিশেষ বস্ত্র। বলেন, মায়ের ছিল একখানা ধূপছায়া রঙের সূক্ষ্ম পায়নাপল শাড়ি। এখন আর সেরকম একটা কাপড় আনতে পার না তাঁতিনি?

মিলের সুতোয় তৈরি একটি গানপেড়ে শাড়ি দেখে স্বর্ণ পুলকিত হন, তার

পাড় জুড়ে বুনে তোলা কবিতার দুটি পঙ্‌ক্তি— 'যমুনাপুলিনে কাঁদে রাধা বিনোদিনী/ বিনে সেই বাঁকা রায়শ্যাম গুণমণি।'

এমন শাড়ি আগে দেখিনি তো! স্বর্ণ বলেন। কিন্তু কাদম্বরী মনে করান, কেন ঠাকুরঝি, সেই যে একসময় স্ত্রীশিক্ষা আর বিধবা বিয়ে চালু করার জন্য বিদ্যাসাগর মশায়কে সম্মান জানাতে তাঁতিরা বিদ্যেসাগরি ধুতি বুনেছিল, যার পাড়ে লেখা হয়েছিল, 'বেঁচে থাকুন বিদ্যেসাগর চিরজীবী হয়ে', মনে নেই!

বিশু তাঁতিনির কাছে গামছার বাহারও কম নয়। সে চমৎকার ছড়া কেটে বলে, জানো তো দিদিমণি বউমণিরা, কথায় বলে, 'নিরগুণ পুরুষের তিনগুণ ঝাল/ পরনে গামছা, গায়ে ঠাকুরদাদার শাল'।

মানে কী তাঁতিনি? রূপকুমারী জানতে চায়। দেবেন ঠাকুরের সৌজন্যে সে এ-বাড়িতে টিকে গেছে। সব শুনে রূপাকে ধমক দিয়ে সংযত হতে বলেছেন দেবেন্দ্রনাথ, কিন্তু সারদার আদরের পুষ্যিকে বাড়িছাড়া করতে তাঁর মন সায় দেয়নি।

কাদম্বরী রূপাকে কাছে টেনে নিয়ে বলেন, বোকা মেয়ে, এটাও বুঝলি না, মানে হল যে পুরুষের গুণ নেই, কাপড় কেনার মুরোদ নেই সে গামছার ওপর ঠাকুরদাদার শাল জড়িয়ে দুর্দশা ঢাকতে চায় আর ঈর্ষায় অন্যের ওপর ঝাল ঝাড়ে।

মেয়েদের কারও কারও ভুরু কুঁচকে যায় এ-কথায়, কেননা স্বর্ণ আর কাদম্বরী যত মহার্ঘ সব সিল্কের শাড়ি বাছছেন, অনেকেরই তা কেনার সামর্থ্য নেই। বাড়ির বউরা স্বামীর উপার্জনে গরবিনী, তাঁদের খরচের হাতটাও বড়। কিন্তু মেয়েদের অনেকের হাতেই অত টাকা থাকে না, তাঁদের স্বামীরা ঘরজামাই, ভাইদের মতো ততটা সম্পন্ন নন। আর শরৎকুমারী, সৌদামিনীরা ধরে থাকেন বলেও কমদামি বেগমবাহার, বাগেরহাট বা ফরাসডাঙা কেনেন পারিবারিক তহবিল থেকে। নানারকম শাড়ির ঝলকানিতে রঙবেরঙের তন্তুজালে উঠোন আলো হয়ে যায়।

স্বর্ণর বর জানকী অবশ্য ভাল রোজগার করেন। ঘরজামাই হওয়ার গ্লানিও তিনি বহন করেননি কোনওদিন। বরং দেবেন ঠাকুরের আদরিণী কন্যাকে আদরে সম্পদে ভরিয়ে দিয়েছেন তিনিও।

কাদম্বরী একটি মভরঙের বালুচরী বেছে স্বর্ণকুমারীকে বললেন, তোমার

প্রথম উপন্যাসের প্রকাশ উপলক্ষে এটা আমার উপহার, অনুষ্ঠানের দিন এই শাড়িটা পরবে। স্বর্ণ আনন্দে নতুনবউঠানকে জড়িয়ে ধরেন। দু'-একদিন পরেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ হচ্ছে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্ব্বাণ', সেই নিয়ে নতুনবউঠানের উত্তেজনার স্পর্শে স্বর্ণও আবেগতাড়িত হলেন।

স্বর্ণ সাজগোজ করতেও ভালবাসেন। এই কিছুদিন আগে তিনি যখন মিস ক্রয়েডের ডাকা মেয়েদের মজলিশে গেলেন, অন্য সবাই হাঁ করে তাঁর সাজগোজ দেখতে থাকেন। চওড়া সাদা পাড়ের কালো বোম্বাই শাড়ি, ফ্রিল ও লেস লাগানো বারো আনা হাতার জ্যাকেট, সঙ্গে মুক্তোর সাতলহরী হার। সভায় এসেছিলেন কবি কামিনী রায়, তিনি তো স্বর্ণকে বলেছেন সাক্ষাৎ স্বর্গচ্যুত সরস্বতী। স্বর্ণ ঠিক করেছেন কামিনীর সঙ্গে সই পাতাবেন।

অনেক মেয়েরাই সেখানে এসেছিলেন, কিন্তু গিরীন্দ্রমোহিনী আসেননি। স্বর্ণর খুব ইচ্ছে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে বন্ধুত্ব পাতাবেন। চিঠিতে যোগাযোগ হয়েছে, তাতে সামনাসামনি সাক্ষাতের ইচ্ছে আরও বেড়েছে কিন্তু তাদের বাড়ির মেয়েদের এখনও বাইরে বেরোনোর নিয়ম নেই।

এখনও মেয়েরা এরকম বন্দি হয়ে থাকবে এটা অসহ্য লাগে, ঘরের কোণ থেকে মেয়েদের বাইরে নিয়ে আসার জন্য আন্দোলন করতে ইচ্ছে হয় স্বর্ণর। স্বদেশিভাব জাগানোর জন্য মেয়েদের মধ্যে সখ্য গড়ে তুলতে হবে, ফিমেল বন্ডিং। তাই তো স্বর্ণ একের পর এক লেখিকার সঙ্গে সই পাতান। লাহোরিণী শরৎকুমারী তাঁর বিহঙ্গিনী সই। গিরীন্দ্রমোহিনীকে পাতিয়েছেন মিলনসই। অথচ তাঁর সঙ্গেই মিলন হয়নি এখনও। তাই স্বর্ণ চিঠির পর চিঠি পাঠান তাঁর মিলনসইকে, কখনও কখনও বন্ধুত্বের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় গিরির উদ্দেশে লেখা কবিতা প্রায় প্রেমের কবিতার মতো শোনায়,

'বিরহে থাকে প্রেম মরমে মিশি,
তাই অদরশনে সুখ সাধে ভাসি,
বিরহে আঁখি জাগে সকলি জেগে থাকে,
আঁখিতে আঁখি হলে শুধু জাগে হাসি।'

পত্রকবিতা পেয়ে গিরিও উতলা হন, কিন্তু তাঁর উপায় নেই। তিনি গোঁড়া পরিবারের গৃহিণী, বাইরে বেরোনোর হুকুম নেই। লুকিয়ে চুরিয়ে লেখালিখি

শুরু করেছিলেন। স্বামী জানতে পেরে পরে অবশ্য অনুমতি দিয়েছেন। ঘরসংসার সামলে স্ত্রী যদি সাহিত্যচর্চা করেন, তাতে তাঁর আপত্তি নেই। এখন তো কত মেয়েরাই লিখছে 'ভারতী', 'বামাবোধিনী'র মতো পত্রপত্রিকায়। গিরিকে তিনি লেখা পাঠানোর উৎসাহ দেন। শিক্ষিত ভদ্রলোকের পক্ষে শিক্ষিত পত্নী অত্যন্ত গৌরবের। বাড়ি বসে যত ইচ্ছে লেখাপড়া করুক, কিন্তু পরদা ভেঙে স্ত্রীর বাইরে বেরোনোর কথা ভাবতে পারেন না দত্তমশায়। দীপনির্বাণের প্রকাশ উপলক্ষেও গিরিকে ডাক পাঠিয়েছেন স্বর্ণ, কিন্তু তিনি কি ছাড়া পাবেন! এবারেও স্বর্ণকে হতাশ করলেন গিরিন্দ্রমোহিনী। পৌষের এক শিরশিরে বিকেলে প্রকাশিত হল দীপনির্বাণ, আর বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া পড়ে গেল বাংলা বইয়ের বাজারে। আশ্চর্য ব্যাপার, বইটিতে লেখকের নাম ছাপা হয়নি। কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে ঠাকুরবাড়ির কোনও মেয়ের লেখা। এর আগেও দু'-চারজন মহিলা আখ্যান লেখার চেষ্টা করেছেন, সেগুলো কোনওটাই এর মতো পরিশীলিত হয়নি।

সাধারণী পত্রে সমালোচনায় সন্দেহের চোখে ব্যজস্তুতি লেখা হল, 'শুনিয়াছি এখানি কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলার লেখা। আহ্লাদের কথা। স্ত্রীলোকের এরূপ পড়াশোনা, এরূপ রচনা, সহৃদয়তা, এরূপ লেখার ভঙ্গী বঙ্গদেশ বলিয়া নয় অপর সভ্যতর দেশেও অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।'

কেন ছাপা হয়নি নাম? জ্যোতির মনে হয়েছিল আগে লোকের রিঅ্যাকশন দেখে তারপর নাম প্রকাশ করে সবাইকে চমকে দেওয়া হবে। তার ফল হল মজার, লোকেরা তো ভাবেইনি সত্যি সত্যি মেয়েরা এরকম লিখতে পারে, এমনকী কাছের লোকদের ধোঁকা লাগল। সবচেয়ে কৌতুকের ঘটনাটা ঘটালেন সত্যেন্দ্র। ডাকমারফত অনামিকা বইটি পেয়ে তিনি জ্যোতিকে চিঠিতে লিখলেন, 'জ্যোতির জ্যোতি কি প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?'

উপন্যাসটি যে সত্যিই স্বর্ণকুমারীর লেখা সে-কথা বিশ্বাস করতে পাঠকের সময় লাগল। কিন্তু ১৮৭৬ সালটি মেয়েদের লেখালিখির ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল শুধু দীপনির্বাণের জন্যই নয়, এই বছরে মহিলাদের আরও দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বেরিয়েছে। কুমিল্লার নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানি লিখে ফেলেছেন রূপজালাল নামে একটি দীর্ঘ প্রণয়কাব্য। পিছিয়ে থাকা মুসলমান সমাজের পক্ষে তা সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠেছে, অথচ নবাবকে চটানোও বিপজ্জনক। ফয়জুন্নেসা হয়ে উঠেছেন তাদের শাঁখের করাত।

অন্য আর-একটি গ্রন্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অন্তঃপুরবাসিনী জনৈক প্রৌঢ়া রাসসুন্দরী দেবীর নামে প্রকাশিত হয়েছে একটি আশ্চর্য আত্মজীবনী, 'আমার জীবন'। তাঁর রচনা থেকে গোঁড়া হিন্দুবাড়ির অন্দরের এমন সব ছবি পাওয়া যাচ্ছে যা ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের আলোকিত জীবনযাত্রা থেকে একদম আলাদা। মালিনীর কাছ থেকে বইটি হাতে পেয়ে পড়তে পড়তে রাসসুন্দরীর জীবনের প্রতি ছত্রে ছত্রে স্বর্ণ চমকে ওঠেন।

একদিন সকালে যখন পাকঘরে ছেলেমেয়েদের খেতে বসিয়ে রাসসুন্দরী পাশের ঘরে গেছেন, তখনই কত্তার ঘোড়াটি উঠোনে ধান খেতে এল। রাশিকৃত ধানের স্তূপ থেকে রোজই ধান খায় ঘোড়া কিন্তু তাকে দেখলে রাসসুন্দরীর বড় লজ্জা করে। তিনি পরদানশীন মহিলা, বুক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে চুপচাপ উদয়াস্ত ঘরের যাবতীয় কাজ সারেন। বিধবা ননদিনীদের সঙ্গে কথা বলতেও লজ্জা পান, বউমানুষের তো এমনই রীতি। ঘোড়া তো কর্ত্তার প্রতিভূ, তার সামনেও লজ্জায় বেরতে পারেন না। এখনও ঘোড়াকে দেখে ওপাশের ঘরে গিয়ে আটকে গেলেন রাসসুন্দরী, এদিকে বাচ্চারা মা মা করে ডাক শুরু করল পাকঘরে। কেউ কাঁদতে লাগল, ঘোড়াও ধান খেতে লাগল। যায় না।

রাসসুন্দরী এক-একবার এগোন আবার লজ্জায় পেছিয়ে যান। মনে মনে ভাবেন, 'কর্ত্তার ঘোড়ার সম্মুখে আমি কেমন করিয়া যাই, ঘোড়া যদি আমাকে দেখে, তবে বড় লজ্জার কথা।'

তখন তাঁর বড়ছেলে এসে মাকে অভয় দেয়, মা, ও ঘোড়া কিছু বলবে না, ও তো আমাদের জয়হরি ঘোড়া, ভয় কি?

ছেলের কথা শুনে মনে মনে নিজেকেই ধিক্কার দেন তিনি। ছি ছি আমি কি মানুষ! সবাই ভাবছে আমি ঘোড়া দেখে ভয় পাই, আসলে যে লজ্জায় পালাচ্ছি সেকথা শুনলে ওরা ভাববে পাগল। কেউ তো আমাকে শাসন করছে না, ঘরে নিজের মতো থাকতে ভয় পাই কেন নিজেই বুঝি না।

ছেলের হাত ধরে রাসসুন্দরী পাকঘরে আসেন। আর ঘোড়া দেখে লজ্জা করবেন না মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন। পাকঘরই তাঁর নিজের জায়গা। সারাদিন কেটে যায় পঁচিশ-তিরিশজন লোকের রান্নাবান্নায়, বারবাড়িতে আটটি দাসীচাকর অন্দরে কেউ নেই। আগে চাকরানিদের সঙ্গেও কথা বলতেন না, তিনি নিজেই লিখছেন যে ইদানীং তাদের নির্দেশ না দিলে তারা বড্ড কাজে ফাঁকি দেয়।

কাজ সারা হলে গোপনে পড়াশোনা করেন রাসু। জানতে পারলে লোকে ছি ছি করবে সে তাঁর সইবে না। কত যত্নে পাকঘরের খড়ির নীচে চৈতন্য ভাগবতের পাতা লুকিয়ে রেখে একটু একটু করে পড়তে শিখেছেন তিনি। এখন জীবনের না বলতে পারা কথা কিছু কিছু লিখেও রাখেন, সেই স্মৃতিচারণের তালপাতায় আজও দুটি নতুন পঙ্‌ক্তি লিখলেন—

'এখন কখন মনে পড়ে সেই দিন।
পিঞ্জরেতে পাখী বন্দী, জালে বন্দী মীন।'

ফরিদপুরের ভড় রামদিয়া গ্রামের সীতানাথ সরকারের সঙ্গে বারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল রাসসুন্দরীর। তখনও তিনি এক সরলা বালিকা। বিয়ের আগে বাপের বাড়ি খেলতে খেলতে শুনে এলেন তাঁকে নাকি পরের ঘরে যেতেই হবে।

ঘাটের ধারে একটি লোক তাঁকে দেখিয়ে বলেছিল, এ মেয়েটি বেশ সুন্দর। যার ঘরে যাবে সে খুব সৌভাগ্যশালী।

আরেকজন বললে, কতজন যেচে নিতে এসেছে, এর মা কাউকেই মেয়ে দিতে চাননি।

সেই প্রথম রাসুর মনে পরের ঘরে যাওয়ার ভয় ঢুকল। যখন চারদিকে গৌরীদানের বাড়বাড়ন্ত আট-ন' বছরের মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় তখনও এই বালিকা পরম নিশ্চিন্তে মায়ের কোলে মুখ ডুবিয়ে বসে ছিলেন। বলিপ্রদত্ত ছাগলছানার মতো নিরুদ্বেগ। খেলার সঙ্গিনীরা তাকে 'সোহাগের আরশি' বলে ঠাট্টা করলেও তিনি কেঁদে ভাসিয়ে দিতেন। সে যে সংসারের অনেক নিয়ম জানতে পারেননি তার একটা কারণ এই যে তাঁর মা তাঁকে একটু তুলে তুলে মানুষ করছিলেন। সঙ্গিনীদের দুষ্টুমি থেকে বাঁচাতে তার খেলা বারণ হল। তাঁদের বাড়িতেই বসত ছেলেদের বাংলা শেখার স্কুল। গ্রামে তখন মেয়েদের পড়াশোনা শুরু হয়নি। দাদারা রোজ সকালে তাঁকে কালো ঘাগরার ওপর ওড়নি পরিয়ে পাঠশালায় বসিয়ে রাখা শুরু করলেন। এক মেমসাহেব পড়াতে আসতেন। শুনে শুনে আর দেখে দেখে বালিকা সেখানেই কিছু বর্ণমালা শিখেছিলেন। পাঠশালায় চুপ করে বসে থাকলেও তার রূপের খ্যাতি ছড়াতে লাগল। লোকে তাকে দেখে যা যা বলত মনে করে গোপনে ছড়া বেঁধেছেন রাসসুন্দরী—

'বর্ণটি আছিল মোর অত্যন্ত উজ্জ্বল। উপযুক্ত তারি ছিল গঠন সকল ॥
সেই পরিমাণে ছিল হস্তপদগুলি। বলিত সকলে মোরে সোনার পুতুলী ॥'

ঘাট থেকে দৌড়ে গিয়ে মাকে জড়িয়ে এ হেন সরলা বালিকা সেদিন জানতে চেয়েছিলেন, মা, আমাকে যদি কেউ চায়, তুমি কি আমাকে অন্যের হাতে দিয়ে দেবে?

এ-কথা শুনে মা চোখের জল মুছে বললেন, ষাট ষাট, তোমাকে কেন দেব? কে এসব বলল তোমাকে?

মায়ের কান্না দেখে রাসু বোঝেন অন্যের ঘরে যেতেই হবে। শুনে ভয়ে তাঁর নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। পরে অবশ্য বিয়ের কথা উঠতে নতুন শাড়ি গয়না বাজনাবাদ্যির আবহে একটু একটু আনন্দও হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের পরে বর যেই তাঁকে পালকিতে তুলে রওনা দিলেন রাসু হাপুস নয়নে কেঁদে উঠলেন। নিজেকে বলির পাঁঠার মতো মনে হচ্ছিল।

সেদিন রাসসুন্দরীর মাথার ওপর থেকে মাতৃচ্ছায়া সরে গেল, তিনি মনে মনে ভগবানকে বললেন, 'লোকে যেমন আমোদ করিয়া পাখী পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া থাকে, আমার যেন সেই দশা ঘটিয়াছে। আমি ঐ পিঞ্জরে এ জন্মের মতো বন্দী হইলাম, আমার জীবদ্দশাতে আর মুক্তি নাই।'

প্রথম ছ'-সাত বছর শাশুড়ির কাছেও খুব যত্নে ছিলেন রাসু। সেই যে বিয়ের পর পালকি থেকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন শাশুড়ি, কোনও কাজই করতে দেননি। রাসুর দিন কাটত পাড়ার বালিকাদের সঙ্গে খেলাধুলো করে। সময় পেলে মাটি দিয়ে নানারকম পুতুল গড়তেন। একবার মাটির সাপ গড়ে রং করে পালঙ্কের নীচে রেখে দিয়েছেন, আর বাড়ির লোকেরা আসল সাপ ভেবে হইচই বাধিয়ে দিল। লাঠি নিয়ে এসে সাপ ভাঙার পর সবাই হেসে কুটোপাটি আর রাসু লজ্জায় অধোবদন। সেই থেকে আর মাটির পুতুল গড়েননি।

কিন্তু কিছু তো করতে হবে! তখন টাকাপয়সার চল হয়নি, কড়ি দিয়ে বেচাকেনা হত। রাসু কড়ি দিয়ে নানারকম জিনিস তৈরি শুরু করলেন, ঝাড়, আরশির গায়ে ঝোলানোর মালা, পদ্মফুল করে ঘরে ঘরে লটকে দেন। শাশুড়ি হাসিমুখে প্রশ্রয় দেন বালিকাবধূটিকে। কিন্তু এই সুখ বেশিদিন রইল না। চোখের দৃষ্টি হারিয়ে শাশুড়ি সান্নিপাতিকে শয্যাশায়ী হলেন আর সংসারের সব ভার এসে পড়ল রাসুর ওপর।

সেইসব ভয়াবহ দিনের কথা মনে করে রাসু তালপাতায় লিখতে থাকেন, 'ক্রমে ক্রমে ওই সকল কাজ আমার পক্ষে ঈশ্বরেচ্ছায় এমন সহজ হইল যে, আমি একাই দুবেলার পাক করিতে পারগ হইলাম, এবং সমুদায় কাজ করিয়া বসিয়া থাকিতাম। তখন মেয়েছেলেরা লেখাপড়া শিখিত না, সংসারে খাওয়াদাওয়ার কর্ম সারিয়া কিঞ্চিৎ অবকাশ থাকিত, তখন কর্ত্তাব্যক্তি যিনি থাকিতেন, তাহার নিকট নম্রভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে হইত। যেন মেয়েছেলের গৃহকর্ম বৈ আর কোন কর্মই নাই।'

রাসু এ-সব নিয়মই অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। উদয়াস্ত খাটনির পর প্রায়ই নিজে খাওয়ার সময় পান না। সকালে উঠেই আগে কর্তার ভাত রান্না করে খাওয়ান। তারপর গুষ্টির সবার ভাত ডাল মাছ তরকারি, আটটি বাচ্চাকে খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, পুজোআর্চার পর নিজের খাওয়া। কোনও কোনও দিন বাচ্চাদের ঘুম ভেঙে গেলে তাঁর আর খাওয়া হয় না। কর্তা ঘরে থাকলে কাজ সেরে ঘোমটা টেনে গলবস্ত্র হয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা। কর্তা মানুষটি ভাল, কিন্তু পত্নীর দিকে নজর দেওয়ার কথা তাঁর মাথায় আসে না।

ঘরে ঢুকেই তিনি হাঁক পাড়েন, কই গো, কোথায় গেলে, পা ধোয়ার জলটল দাও। যন্ত্রচালিত রোবটের মতো ছুটে এসে সেবা করেন রাসু। বুক পর্যন্ত ঘোমটার ফাঁক দিয়ে কোনওরকমে স্বামীর যে পাদুটি দেখতে পান জল ঢেলে ধুইয়ে দেন।

জলখাবার খেয়ে কোনও বই নিয়ে বসেন সীতানাথ। ছেলেদের সঙ্গে পড়া নিয়ে আলোচনা করলে কান খাড়া করে শোনেন রাসু। তাঁর খুব ইচ্ছে চৈতন্য ভাগবত পড়বেন। কিন্তু তিনি তো বইটাই চেনেন না।

রাসসুন্দরীর জীবনে একটা ম্যাজিক ঘটে গেল যেদিন মালিনীর সঙ্গে তাঁর হঠাৎই দেখা হয়ে যায় খিড়কির পুকুরঘাটে। তার কাছেই ধীরে ধীরে আঁক কষতে শেখেন রাসু। বিদ্যেসাগরের বর্ণপরিচয় কিনে মালিনীর কাছে বসে বসে অক্ষর শেখেন। সেদিনের কিশোরী বই-মালিনী রাসুর ভেতরে যে আগুন উসকে দিয়েছিল সে-খবর কেউ রাখেনি, কিন্তু তালপাতার পুঁথিতে যে লেখার শুরু তা যে আজ ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত, তাতেই বেজায় খুশি মালিনী। প্রথমেই একটি কপি নিয়ে দৌড়ে এসেছে স্বর্ণকুমারীর কাছে।

স্বর্ণ এতদিন ভাবতেন তাঁকেই লেখার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে অহরহ,

কিন্তু এই বই পড়ার পর তাঁর সেই প্রত্যয় নড়ে গেল। এই অবরোধে বন্দি প্রৌঢ়া লেখার জন্য তাঁর চেয়েও কত বেশি ঝুঁকি নিয়েছেন দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে স্বর্ণর।

পরের সপ্তাহে মালিনী এলে আবিষ্কারকের সম্মান দিয়ে স্বর্ণ তাকে জড়িয়ে ধরেন। তেতলার ঘরে মুড়ি, ফুলকপির বড়া ও নতুন বঙ্গদর্শন সহযোগে মজলিশ জমিয়ে তোলেন স্বর্ণ, মালিনী ও কাদম্বরী।

মালিনী জানতে চায়, নতুন সংখ্যাটি পড়ছ স্বর্ণদিদি? বঙ্কিমবাবু যে কী ভাল কাজ করছেন এই পত্রিকা বের করে, কত নতুন নতুন লেখা পড়া যাচ্ছে।

স্বর্ণ পালঙ্ক থেকে নেমে লেখার টেবিল থেকে বঙ্গদর্শনের একটি কপি নিয়ে আসেন, দেখো দেখো, আমি তো হাঁ করে বসে থাকি কবে নতুন সংখ্যাটি আসবে। প্রতিমাসে 'বিষবৃক্ষ' না পড়লে আমার ঘুম হয় না যেন।

খোঁপায় বেলকুঁড়ি লাগাতে লাগাতে কাদম্বরী বললেন, বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনীকে আমার খুব ভাল লেগেছে। নিঃসঙ্গ মেয়েটির দুঃখ আমার ঘুম কেড়ে নেয়। কেউ কি তাকে সত্যি ভালবাসবে না?

কুন্দ আর সূর্যমুখীর দ্বন্দ্বটাই তো গল্প জমিয়ে দিয়েছে, স্বর্ণ উত্তেজিত হয়ে পড়েন, বঙ্কিমবাবুর সাহস আছে বলতে হবে, বিধবার প্রেম দেখাচ্ছেন এত খোলাখুলি, পেটরোগা বাঙালির হজম হলে হয়।

কাদম্বরী উঠে এসে স্বর্ণকে জড়িয়ে ধরে বলেন, তুমি যে প্রতিকূলতাকে জয় করেছ নিজের চেষ্টায় সেটা কি কম বড় কথা হল! মেয়েদের লেখালেখিকে এখনও বিদ্বজ্জনরা গুরুত্ব দেন না, কিন্তু আমরা তো জানি কত অসম্ভবকে সম্ভব করতে হচ্ছে তোমাকে।

স্বর্ণ বললেন, দেখো না নতুনবউঠান, বাড়িতে সবাই আমার লেখার আদর করেন ঠিকই, কিন্তু বাইরের লোকেরা অনেকেই ভাবেন আমার নামে আসলে জ্যোতিদাদা লিখে দিচ্ছেন।

যাঃ, তাই আবার হয় নাকি? কাদম্বরী হেসে লুটিয়ে পড়েন, মানুষের কল্পনাশক্তি কত লম্বা দেখো!

শোনো মালিনী, এই লম্বা জল্পনাকল্পনা সব মেয়েদের বিরুদ্ধে তেড়ে আসছে, স্বর্ণ বিরক্ত হয়ে বললেন। আমার সই গিরীন্দ্রমোহিনী তো কোনওদিন কোনও সাহিত্যসভায় আসতেই পারেননি। কতদিন ধরে দু'জন দু'জনকে চিঠি লিখছি, পরস্পরের লেখা পড়ছি, সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হচ্ছি, কিন্তু

গিরিকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেয় না। এই তো মেয়েদের অবস্থা! রাসসুন্দরী দেবীর মুখ কি কোনওদিন দেখতে পাব আমরা?

সখীদের এই মিলনবাসরে হঠাৎ এসে পড়ে স্বর্ণর ছোট্ট মেয়ে ঊর্মিলা। কাদম্বরী হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নেন ফুটফুটে শিশুটিকে।

ঊর্মিলাও কাদম্বরীর কোলে উঠে মহা খুশিতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে। কিন্তু স্বর্ণর অত আহ্লাদ আসে না। কতদিন পরে এমন আসর বসেছে, আজ এই সৃজনশীল মজলিশে বাচ্চাকাচ্চার উৎপাতে সময় নষ্ট করতে তাঁর একটুও ইচ্ছে নেই।

দাসীকে চিৎকার করে ডেকে বলেন, ঊর্মিলাকে নিয়ে যাও, ও এখানে এল কী করে? তুমি কি ঘুমোচ্ছ নাকি?

দাসী কাঁচুমাচু হয়ে বলে, আমার দোষ নেই মাঠান, ওকে বসিয়ে রেখে পেচ্ছাপ করতে গেছিলাম, সেই ফাঁকে পালিয়ে এসছে।

দাসীর অমার্জিত শব্দ ব্যবহারে আরও খেপে যান স্বর্ণ, যাও বলছি, আমাকে আর বিরক্ত কোরো না, বেবিকে নিয়ে নীচে যাও।

কাদম্বরী আর চুপ করে থাকতে পারেন না, দাসীকে বলেন, তুই যা, আমি দেখছি। ঊর্মিলা আমার কাছেই থাকবে। স্বর্ণর দিকে ফিরে বলেন, ছোট্টসোনাটা থাকলে কোনও অসুবিধে হবে না, কী যে কর না তুমি!

তোমরা আবার বাচ্চাদের বড্ড মাথায় তোল বউঠান, স্বর্ণ নিজের মতে স্থির থাকেন, যেমন মেজোবউঠান তেমন তুমি। আমরা যেভাবে বড় হয়েছি, এ-বাড়ির হাওয়া বাতাসে ওরাও সেরকম বড় হয়ে যাবে। তার জন্য আমার অমূল্য সৃষ্টিশীল সময় নষ্ট করতে পারি না বাপু।

কাদম্বরীর চোখে জল আসে, তোমাদের কোল আলো করে দেবশিশুরা না চাইতে এসেছে বলে এমন অবহেলা করছ ঠাকুরঝি, আমার যে কোল খালি। ঊর্মিলাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সাহিত্য আলোচনা করার জোর আমার নেই।

মালিনী এবার কাদম্বরীর পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। স্বর্ণ বলেন, বউঠান, ঊর্মিলা তো তোমারই মেয়ে, আমার হলে কি আমি ঘর থেকে যেতে বলতাম! কাদম্বরী ও স্বর্ণ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেন প্রবল সখীত্বে। সেই মুহূর্তে বালিকা ঊর্মিলাকে ঘিরে রচিত হয় তিন নারীর সুরক্ষা বলয়।

১০

আনাবাই নলিনী

১৮৭৭-এর গ্রীষ্মকালের এক ফুরফুরে বিকেলে তিনটি শিশুকে নিয়ে অন্তঃসত্ত্বা জ্ঞানদা একা-একাই বিলেতের জাহাজে চেপে বসলেন। এ যাত্রায় সত্যেন তাঁদের সঙ্গী হতে পারলেন না, পরিচিত এক ইংরেজ দম্পতির সঙ্গে জ্ঞানদাকে পাঠিয়ে দিলেন লিভারপুলের উদ্দেশে। দেখাশোনার জন্য সঙ্গে গেল একটি গুজরাতি ও একটি মুসলমান চাকর। স্ত্রীর ওপর সত্যেনের অগাধ ভরসা। তিনি জানেন জ্ঞানদা সব সামলে নেবেন।

বোম্বাই বন্দরে তাঁকে সি অফ করতে এসেছেন পাণ্ডুরং পরিবারের গৃহিণী ও মেয়েরা। ওঁদের বড় মেয়ে আনা বেশ কিছুদিন বিলেতে কাটিয়ে এসেছেন অথচ ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়েও তাঁর আগ্রহ প্রবল। একা বিলেতযাত্রা নিয়ে জ্ঞানদার মনে একটু ইতস্তত ভাব ছিল। এই ক'দিনে আনা তাঁর সেই ভয় কাটিয়ে দিয়েছেন। লন্ডনের মহা মহা ব্যাপার সম্বন্ধে আনা তড়খড়ের বর্ণনা, উৎসাহ এবং তাঁর নব আহরিত বিলিতি দ্যুতিতে জ্ঞানদাও উৎসাহিত। প্রগতির যাত্রায় এই পরিবারের মেয়েদের কাছে তাঁর ঋণ বেড়ে চলেছে।

প্রসন্ন ঠাকুরের ছেলে জ্ঞানেন্দ্রমোহন খ্রিস্টধর্ম নিয়ে লন্ডনে বাস করছেন, বিলেতে তিনিই জ্ঞানদা ও ছেলেমেয়েদের স্থানীয় অভিভাবক হবেন। সত্যেনের মতে ইংরেজদেব আদবকায়দা শেখার জন্য জ্ঞানদার বিলেতে গিয়ে বসবাস করা অত্যন্ত জরুরি। সুরেন, বিবি ও চোবিকেও বিলিতি কেতায় দুরস্ত করে তোলা তাঁর উদ্দেশ্য। এরপর নিজে যখন যাবেন, বাবামশায়ের অনুমতি পেলে ঠিক করেছেন রবিকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন ব্যারিস্টারি পড়াতে।

জ্ঞানদা দুর্জয় সাহসিনী। তাঁর মতো আর কোনও বাঙালি মেয়েই কোনও পুরুষ সঙ্গী ছাড়া তিনটি বাচ্চা নিয়ে কালাপানি পেরোনোর কথা ভাবতে

পারেনি। তাঁর সাহস দেখে ঠাকুরবাড়ির অন্য মহিলাদের হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায়। তবু প্রথমদিন সন্ধের মুখে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে মনখারাপ লাগে জ্ঞানদার।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। দেশের ছবি মুছে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে। রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ বিলেতে গিয়ে আর দেশে ফিরতে পারেননি, তাই সকলেই কালাপানি পেরতে ভয় পায়। যখন জাহাজ জেটি ছাড়ল, হাত নাড়তে নাড়তে ক্রমশ ছোট হয়ে এল বন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা সত্যেন ও পাণ্ডুরং মেয়েদের অবয়ব, জ্ঞানদার বুক দুরুদুরু করে। কত দূরে চলে যাবেন, আর কোনওদিন ফেরা হবে কি না কে জানে!

জাহাজপথ অতি মনোহর। জ্ঞানদা বাচ্চাদের নিয়ে সমুদ্রযাত্রা পুরোমাত্রায় উপভোগ করছেন। মুসলমান চাকরটি খুব সেবাযত্ন করে, জাহাজ লিভারপুল পৌঁছলে সে অবশ্য বিলেতের তীর থেকে ফিরে আসবে। বিলেতে সঙ্গে থাকবে গুজরাতি রামা চাকর। এ-সব ব্যাপারে সত্যেনের ব্যবস্থা পাকা।

সমুদ্রের নীল জল ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসে। রাত্রি নামলে আলোয় ভরে যায় জাহাজটি। সুসজ্জিত ইংরেজ নারীপুরুষেরা জোড়ায় জোড়ায় ডেকে ভ্রমণ করছে। সুরেন, বিবিদের সুন্দর পোশাক পরানো হয়েছে, তারা এই অবারিত অভাবিত পরিসরে মনের আনন্দে খেলে বেড়াচ্ছে। ছোট্ট চোবি রামা চাকরের কোলে। মেমসাহেবরা দেবদূতের মতো শিশুটিকে দেখে আদিখ্যেতা করে গাল টিপে দিচ্ছে প্রায়ই। সন্ধে গভীর হলে সবাই ডাইনিং রুমের দিকে রওনা দিল।

বুক দুরুদুরু সংবরণ করে জ্ঞানদাও সুন্দর করে সাজলেন। যে শাড়ি পরে এসেছিলেন সেটি পালটে পরলেন গুজরাত থেকে আনা একটি ঘননীল বাঁধনি সিল্ক। এই বাঁধনি কাপড়গুলি ভারতের মেয়েদের হাতের অপূর্ব শিল্প। প্রথমে সাদা ক্যানভাসের মতো পুরো শাড়িটাতে বিন্দু বিন্দু করে সূক্ষ্ম সুতোর বাঁধন দিয়ে উজ্জ্বল কোনও রঙে চোবানো হয়। রং বসে গেলে শুকিয়ে নেওয়া হয় শাড়ি। পাড়টিও আলাদা বাঁধন দিয়ে আলাদা রং করা হয়। শুকনো শাড়ি থেকে সুতোর বাঁধন খুলে ফেললেই আসল ম্যাজিক, সারা শাড়িতে লাল, সবুজ, নীল রঙের ওপর বিন্দু বিন্দু সাদা নক্ষত্র ফুটে ওঠে। আমেদাবাদে থাকতে গুজরাতি গ্রামে গিয়ে নিজে এ-সব শাড়ি সংগ্রহ করেছেন জ্ঞানদা। আজকের গ্রে রঙের পাড় দেওয়া নীল শাড়িটিতে তাঁর চেহারার আভিজাত্য

যেন ঠিকরে উঠছে। ডাইনিং রুমে তিনিই একমাত্র ভারতীয় মহিলা, সবার চোখ ঘুরে ঘুরে আসছে তাঁর দিকে। কোণের টেবিলে সুরেন ও বিবিকে নিয়ে সঙ্গী ইংরেজ দম্পতির সঙ্গে বসেছেন জ্ঞানদা। ঘরে মোৎসার্টের সুর বাজছে হালকা চালে। কাঁটা-চামচ সহযোগে প্রতিটি খাবারের স্বাদ নিতে নিতে গল্প করছেন তাঁরা। হলঘরে দু'-একটি ইংরেজ মেয়ের কাঁধখোলা গাউন যেন একটু বেশিই উন্মুক্ত। পোশাকের শাসন না মেনে তাদের স্তনের আভাস উপচানো মাখনের মতো উঁকি মারছে। অধিকাংশ পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টি সেইদিকে। জ্ঞানদার একটু অস্বস্তি হয়।

সঙ্গিনী মিসেস মেরি ফিলিপের অনুরোধে একটু রেড ওয়াইন নিয়েছেন জ্ঞানদা। এর আগে স্বামীর সঙ্গে পার্টিতে পান করলেও এখন এত অচেনা লোকের সামনে একটু বাধোবাধো ঠেকে। সত্যেনের চাকরির সুবাদে একটু আধটু পান করতে হয় ঠিকই, কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবে ঠাকুরবাড়িতে এখন বইছে মদ্যপান বিরোধিতার হাওয়া। জ্যোতিদের সঞ্জীবনী সভাতেও মদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে। সারা কলকাতার বাবুরা যেভাবে সুরাসমুদ্রে গা ভাসিয়ে বাইজি চর্চায় মেতে আছেন তা দেখে ওঁরা শিউরে ওঠেন। এখন দেবেন ঠাকুরের পুত্রবধূকে ওয়াইন পান করতে দেখে কে কোথা থেকে খবরের কাগজে রিপোর্ট করে দেবে কে জানে! ওয়াইন যদিও মদ নয়, তবু জ্ঞানদা একটু সাবধান থাকতে চান। অনেক সাধ্যসাধনা করে বাবামশায়ের কাছ থেকে বিলেত যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেছে, তিনি আবার রুষ্ট না হন!

ডিনারের পর ডেকের ওপর শুরু হল বাজনার তালে তালে ইংরেজ নারীপুরুষের জোড়ায় জোড়ায় বলনৃত্য। এক সাহেব জ্ঞানদার হাত ধরে নাচের জন্য টানাটানি করতে থাকে। জ্ঞানদা এতে খুব একটা অনভ্যস্ত নন, বোম্বাই আমেদাবাদে থাকাকালীন ম্যাকগ্রেগরের পাল্লায় পড়ে অনেকবার নাচে অংশ নিতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু অপরিচিত কারও সঙ্গে নাচার প্রশ্ন ওঠে না, তিনি মৃদু হাসিতে প্রত্যাখ্যান করলেন। সুরেন আর বিবি দু'জন দু'জনের পার্টনার হয়ে ডান্স করছিল। বিবির পাকা হাবভাব দেখে জ্ঞানদার মজা লাগে, সেই রাত্রে অল্প ওয়াইন পান করতে করতে তিনি নাচগান উপভোগ করলেন। পরদিন সকাল থেকে শুরু হল জ্বর বমি মাথা ঘোরা। সত্যেন তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, তবু এত তাড়াতাড়ি সি সিকনেস দেখা দেবে তা বোঝেননি জ্ঞানদা। চাকরদুটো এ যাত্রায় খুব সেবা করল।

কলকাতার বাবুমহল অবশ্য ঘটনাটাকে বিশেষ সুনজরে দেখলেন না। স্ত্রী-স্বাধীনতার এহেন বাড়াবাড়ি করে সিভিলিয়ান সত্যেনবাবু নিজের বউকে মাথায় তুলছেন আর অন্য মেয়ে-বউদের গোল্লায় যাওয়ার পথ প্রশস্ত করছেন। ঘরকন্না না সামলে মেয়ে-বউরা সবাই এখন কালাপানি পেরতে চাইলে বাঙালির সংসার লাটে উঠবে। সমাচার চন্দ্রিকা তো স্পষ্টই সমালোচনার সুরে লিখেছে, 'আমাদেবাদের [আমেদাবাদের] সিবিল এবং সেসন জজ বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী নিজ পুত্র কন্যাদিগের সহিত লিবারপুলে পৌঁছিয়াছেন। সন্তানদিগকে বিলাতে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়াই গমনের উদ্দেশ্য।— কালেকালে কত কি হবে?'

ওই বছরে শীতে দেবেন ঠাকুর জামাই সারদাপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে চিনভ্রমণে গেলেন।

আর বর্ষায় জ্যোতি ও কাদম্বরী হাওয়া বদলাতে এলেন শ্রীরামপুরের গঙ্গার ধারে বাগান-বাড়িতে। অবধারিতভাবেই তাঁদের সঙ্গী হলেন রবি। জোড়াসাঁকোর দেওয়ালের বাইরে খোলা প্রকৃতির মাঝখানে গঙ্গাতীরে নতুনবউঠানের সঙ্গে দিন কাটাতে কাটাতে তাঁর মালতীপুঁথির পাতা ভরে উঠল। নৌকোর ওপর বসে লিখে ফেললেন, 'শৈশব সঙ্গীত'।

নতুন বর্ষার জলধারা রবির মনে আনন্দের স্রোত নামায়। স্রোতের ওপর ভেসে বেড়ানো মেঘের ছায়া রবির মনে তীব্র প্রণয়াকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। কিন্তু কার প্রতি? কাকে নিয়ে প্রেমের কবিতা লিখবেন রবি? চোখ বুজলেই সামনে ভেসে ওঠে এক অনিন্দ্যসুন্দর মুখ, সে মুখ হেকেটি ঠাকরুনের। এ কী সর্বনাশ হল তাঁর!

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গঙ্গার ধারে এসে বসেন রবি। বৃষ্টি পড়ছে। তাঁর শরীর আনচান, চোখ দিয়ে জলধারা গড়িয়ে নেমে আসে। গলা থেকে বেরিয়ে আসে বিদ্যাপতির পদ, ' এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর'...

সামনে জেলেনৌকোগুলির আবছা চলাচল। পেছনে বাগানে রান্নার তোড়জোড়। নতুনবউঠান আজ বাগানে রান্না করবেন, বেশ পিকনিকের মতো। রবি, রবি বলে তাঁর ডাক ভেসে আসছে বাগান থেকে। বোধহয় জলখাবারের আহ্বান। রবির হৃদয় চলকে ওঠে। আবার নিজেকে শাসন করেন তিনি। এটা ঠিক হচ্ছে না, হৃদয় সামলাতে না পারলে নতুনবউঠানের সামনে বড় লজ্জায় পড়তে হবে। আর জ্যোতিদাদাই বা কী ভাববেন? ওরা

তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করলেও সহ্য হবে না রবির। আবেগ লুকোনোর ঢাল হিসেবে সংগীতের জুড়ি নেই, রবি বিদ্যাপতির পদটি নিজের মতো গুনগুন করতে করতে বাগানে এসে বসলেন।

বকুলগাছতলায় ইটের উনোন জ্বলছে। চারদিকে হাতা, খুন্তি, মশলা, তরকারিপাতি ছড়ানো। দাসীরা জোগান দিচ্ছে, কুটনো কাটছে, হলুদ বাটছে বিরাট শিলনোড়ায়। টুলে বসে তদারকিতে ব্যস্ত কাদম্বরী।

একটু পাশেই পাতা হয়েছে বেতের চেয়ার টেবিল। সেখানে জলখাবারের ফল মিষ্টি সাজানো। একটি চেয়ারে সম্রাটের মতো বসে আছেন জ্যোতি, তাঁর গায়ে ঢোলা মলমল পাজামার ওপর লখনউ চিকনের লম্বা আকাশনীল চাপকান। কাঁধে একটি উড়নি পাট করে রাখা।

জ্যোতির রূপের খ্যাতি অনেকদিনের। ছাত্রবয়সে তিনি যখন গাড়ির অপেক্ষায় প্রেসিডেন্সি কলেজের সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতেন, তাঁকে দেখতে ভিড় জমে যেত। কয়েক বছরের ছোট রসরাজ অমৃতলাল গল্প করেন, হিন্দু স্কুলের ছাত্র হিসেবে তিনিও উলটোদিকে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতেন গ্রিক সৌন্দর্যের সেই প্রতিমূর্তির দিকে। রবির কাছেও সৌন্দর্য, সাহিত্য, সংগীতে জ্যোতিদাদাই আদর্শ।

রবি জানতে চান, কলকাতায় যাচ্ছ নাকি জ্যোতিদাদা? এত সকালে?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে জ্যোতি আঙুরের রসে চুমুক দেন। বলেন, কী গাইছিলি, জোর গলায় গা তো! চেনা চেনা লাগছিল সুরটা? আবার একটু অচেনা যেন? বিদ্যাপতি?

রবি চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, পদ বিদ্যাপতির, সুরটা আমার নিজের মতো করে নিয়েছি। তাই চিনতে পারছ না। রবি আবার গানটা ধরে।

মাথার ওপর চাঁদোয়া, বাইরে বৃষ্টি। বিদ্যাপতির পদে পরিবেশ হয়ে ওঠে মেঘমন্দ্রিত। রবির গানে গলা মেলালেন জ্যোতিরিন্দ্র আর আবেশে চোখ বন্ধ করে কাদম্বরী শুনতে থাকেন।

রবির ফলের রস খেতে ইচ্ছে করে না, এই ভরা বাদরে কফির পেয়ালার দিকে হাত বাড়ান তিনি। তাঁর চুলে বৃষ্টি লাগা, গায়ের মেরজাই আধভেজা। চোখে সর্বনাশ।

কাদম্বরী হাঁ হাঁ করে ওঠেন, আরে পাগল, আগে তো কিছু খাবার মুখে দাও।

খেতে ইচ্ছে করছে না বোঠান, রবির চোখের দিকে তাকিয়ে কাদম্বরীর মনে হয় যেন কালবৈশাখীর আভাস। কয়েকদিন ধরেই রবির মনের অশান্তভাব লক্ষ করেছেন তিনি। তাঁর বুক গুরুগুরু করে অজানা শঙ্কায়। কী হয়েছে ওর, সামলাতে পারবেন তো রবিকে!

মনের কথা বুঝতে না দিয়ে তিনি বলেন, এমন কিছু ভাল গাওনি। নেহাত বৃষ্টির দিন বলে তোমার জ্যোতিদাদার পছন্দ হয়েছে।

রবি বোঝে না কেন কিছুতেই খুশি হন না কাদম্বরী ঠাকরুন। বিশেষ করে রবির কোনও গুণ যেন ওঁর চোখে পড়ে না। ঝগড়ার সুরে রবি বললেন, জ্যোতিদাদা ভাল বললে তুমি আমাকে হিংসে করো বউঠান, তাই প্রশংসা করতে চাও না।

জ্যোতি হাসেন, আঃ, কী ছেলেমানুষের মতো ঝগড়া কর না তোমরা! আরেকটা গান কর রবি। তোর গান দিয়ে দিনটা শুরু করলাম আজ, দেখি রিহার্সালটা জমে কিনা।

নাটক নেমে গেছে, সবাই ভাল বলছে, তবু এত রিহার্সালে যাওয়ার কী দরকার তোমার? কাদম্বরী ঠোঁট ফোলান, এমন বাদলাদিনে জমিয়ে খিচুড়ি মাছভাজা আর গান হতে পারত। আজ না গেলেই নয়!

জ্যোতি বলেন, আমার না গেলে চলে না বউ, ওরা অপেক্ষা করবে। আমি তো ফিরে আসব তাড়াতাড়িই. গান আর খিচুড়ি রাতের জন্য তুলে রেখো, এখন রবির সঙ্গে গান কবিতা কর।

কে অপেক্ষা করবে, বিনোদিনী? কাদম্বরী নাছোড় জানতে চান। তীব্রচোখে তাকিয়ে থাকেন জ্যোতির দিকে।

তুমি বড় সন্দেহপ্রবণ, বিরক্ত জ্যোতি উঠে দাঁড়ান। আমাকে ন'টার স্টিমার ধরতে হবে, রবি তোর বউঠানকে দেখিস।

জ্যোতি চলে যান, কাদম্বরী মুখ গোমড়া করে বসে থাকেন। সেদিকে তাকিয়ে রবি ভাবেন এই নারীটি যে আমার সামনে বসে খাওয়ায়, ঝগড়া করে, স্বামীর জন্য অভিমান করে সে নতুনবউঠান। আর আমার মনের ভেতরে যিনি ঢুকে বসে জ্বালাচ্ছেন. কারও বউ নন, বউঠান নন, সেই রহস্যময়ীটি হেকেটি ঠাকরুন। তিনিই আমার কবিতার বিয়াত্রিচে।

হে আমার বিয়াত্রিচে, জ্যোতি যখন অস্তমিত, এই উদীয়মান ভানুর দিকে একটু মনোযোগ দাও, গোমড়ামুখো কাদম্বরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান রবি।

কাদম্বরী বলেন, সবসময় ইয়ারকি ভাল লাগে না রবি। দেখছ না তোমার নতুনদাদা কেমন রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীদের দিকে ধেয়ে চলেছেন। এমন বরষাদিনে আমাকে রেখে চলে গেলেন, তা হলে তো কলকাতাতেই থাকলে হত।

না বউঠান, এই নদীতীর তোমার মতো স্বামী-বিরহিণীর পক্ষেও মনোরম। রবি বলেন, উনি চলে গেলেন, কিন্তু তোমার নদী আছে, বাগান আছে, হরিণশিশু আছে, রূপকুমারী আছে আর ও দুটি চোখের একটু কৃপাদৃষ্টির আশায় পায়ের তলায় চাতকের মতো বসে আছি আমি।

কীসে আর কীসে, জ্বলন্ত কটাক্ষ করেন কাদম্বরী, তুমি কি নিজেকে তোমার নতুনদাদার সঙ্গে তুলনা কর? আমি তো তোমার কোনও রূপগুণ দেখি না এখনও। তুমি নিতান্ত একটি সতেরো বছরের শিশু।

রবির নবজাগ্রত পৌরুষে ঘা লাগে। চোখের কোনায় জল চিকচিক করে ওঠে। জ্যোতিদাদা আমার কতখানি জুড়ে আছেন সে আমিই জানি, কিন্তু তুমি যে আমার প্রিয়তর। তোমার কৃপাপ্রত্যাশী বলে এমন করে কি আঘাত দিতে হয়, হেকেটি ঠাকরুন!

দেখো, আবার কাঁদছ বাচ্চাদের মতো! আমি যখন রেগে থাকি তখন আমাকে বিরক্ত কোরো না তো রবি ঠাকুরপো! কাদম্বরী ঘরের দিকে উঠে যান।

বিষণ্ণ রবি বসে থাকেন। ভগ্নহৃদয়ের এই বেদনা কাকেই বা বলবেন। প্রায় সমবয়সি নতুনবউঠানের চোখে তিনি এখনও কিশোর, অথচ কিশোরের শরীর মন জেগে উঠছে সে-খবর তিনি রাখেন না। কেনই বা রাখবেন, তাঁর তো মন ছেয়ে আছেন পুরুষোত্তম জ্যোতি ঠাকুর। মুহ্যমান রবি খাতা কলম টেনে স্বগতোক্তির মতো দু'-চারটি লাইন নাড়াচাড়া করেন,

'জানিতেম ওগো সখী, কাঁদিলে মমতা পাব,
কাঁদিলে বিরক্ত হবে একি নিদারুণ?
চরণে ধরি গো সখী, একটু করিও দয়া
নহিলে নিভিবে কিসে বুকের আগুন?'

আবার যেদিন কাদম্বরীর মেজাজ ভাল থাকে সেদিন যেন স্বপ্নের মতো পরিবেশ রচিত হয়। সে-সব দিনে জ্যোৎস্নারাতে নদীর সামনে বসেন তিনজন।

জ্যোতির গানে রবির কবিতায় যেন গন্ধর্বরা নেমে আসেন। চাঁদপরির মতো দু'জনের মাঝখানে ঘুরে বেড়ান কাদম্বরী। এক-এক দিন কলকাতা থেকে চলে আসেন সস্ত্রীক অক্ষয়চন্দ্র। তাঁর স্ত্রী শরৎকুমারী কিছুদিন হল লাহোর থেকে এসেছেন। ঠাকুরবাড়িতেও একজন শরৎকুমারী আছেন, তাই রবি তাঁকে মজা করে ডাকেন লাহোরিণী।

একদিন অক্ষয়ের কাছে ইংরেজ বালক কবি চ্যাটারটনের গল্প শুনছিলেন রবি। চ্যাটারটন প্রাচীন কবিদের নকল করে এমন কবিতা লেখেন যে কেউ ধরতে পারেনি। অবশেষে ষোলো বছর বয়সে তিনি আত্মহত্যা করে বিখ্যাত হন। রবি শুনে রোমাঞ্চিত হয়ে ভাবলেন, তিনিও বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের নকলে কবিতা লিখবেন।

বাগানে বসে জলস্রোতের মতো লিখতে শুরু করলেন ভানুসিংহের কবিতা। বন্ধুদের বললেন, লাইব্রেরি থেকে বহু প্রাচীন এক কবির পুঁথি উদ্ধার করেছেন, কবির নাম ভানুসিংহ। বন্ধুরাও শুনে উত্তেজিত, এমন কবিতা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের হাত দিয়েও বেরোয়নি! পরে অবশ্য আসল কবির পরিচয় পেয়ে তারা ঢোক গিলতে বাধ্য হলেন।

জ্যোতি তখন অশ্রুমতী নাটকটি লিখছিলেন। ভানুসিংহের প্রথম পদটিই তাঁর এত পছন্দ হল যে মঞ্চাভিনয়ের সময় নাটকে এটি গান হিসেবে জুড়ে দেবেন ঠিক করলেন। পদটি ছিল—

'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে মৃদুল মধুর বংশী বাজে
বিসরি ত্রাস লোকলাজে সজনি, আও, আও লো।'

মোরান সাহেবের বাগানে কোনও কোনও নির্জন দুপুরে রবি আর কাদম্বরী তেঁতুলের আচার খেতে খেতে বাগানের দোলনায় আড্ডা দেন। কাদম্বরী সেদিন বেশ সেজেছেন, গায়ে হাল ফ্যাশানের লেস দেওয়া বহুবর্ণ জ্যাকেটের সঙ্গে নীলাম্বরী শাড়ি। কিন্তু ওই জ্যাকেট বস্তুটি কোনওদিন পছন্দ হয় না রবির।

তিনি বোঠানের গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধান, এটা কি একটা ড্রেস, না উমেশ দরজির সেলাই করা ঢাকনি? যত রাজ্যের জলের দরে কিনে আনা ঝড়তি পড়তি রেশমি ছিটকাপড় জুড়ে দরজিরা যা তৈরি করে দেয় তাই আদর

করে গায়ে তোল তোমরা, আবার নাম দেওয়া হয়েছে জ্যাকেট! এর চেয়ে সেকেলে সাদা কালোপেড়ে ঢাকাই শাড়ি পরলে ঢের বেশি মানাত!

আহা রে, তুমি ফ্যাশানের কী বোঝ হে বালক? কাদম্বরীও ছাড়বেন না, জানো আমি নিজে সব ডিজাইন এঁকে দরজি দিয়ে করিয়েছি? আর দেখো, জ্যাকেটের বর্ডারের এই এমব্রয়ডারিটাও আমার করা।

ওঃ, ভারী তো এমব্রয়ডারি, জ্যাকেটে নকশা তোলা তো ফাঁকিবাজি। রবি বলেন, জ্যোতিদাদাকে যেমন করে দিয়েছ, আমার আচকানে তেমনি এমব্রয়ডারি করে দেখাও, তো বুঝি!

ইস! কী আবদার! কাদম্বরী হাতের একটি এমব্রয়ডারির ফ্রেম দেখিয়ে বললেন, এই দেখো কী সেলাই করছি এটা। সাধের আসন।

সেটা আবার কী জিনিস, নিজের কোলে কবিতার খাতায় হিজিবিজি কাটতে কাটতে রবি জানতে চান।

কাদম্বরীর ঠোঁটে মোনালিসার হাসি, বলেন, এটা কবি বিহারীলালের জন্য আমার উপহার, তাঁর কবিতার চারটে পঙ্‌ক্তি এমব্রয়ডারি করে বুনে দিচ্ছি সাধের আসনে।

রবির ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনা দেন, যেদিন বিহারীলালের মতো কবিতা লিখতে পারবে, সেদিন তোমার পাওনা হবে এরকম উপহার।

রবি কাদম্বরীর কথায় কান না দেওয়ার জন্য কবিতার খাতায় মন দিলেন। জ্যোতি বাগানে এসে দেখলেন বকুলগাছে বাঁধা দোলনায় গুনগুন করতে করতে দোল খাচ্ছেন কাদম্বরী আর তাঁর পায়ের কাছে মাদুরের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে রবি লিখছেন নতুন কবিতা,

> ‘একদিন মনে পড়ে, যাহা-তাহা গাইতাম
> সকলি তোমারি সখি লাগিত গো ভাল
> নীরবে শুনিতে তুমি, সমুখে বহিত নদী
> মাথায় ঢালিত চাঁদ পূর্ণিমার আলো।
> সুখের স্বপনসম, সে দিন গেল গো চলি
> অভাগা অদৃষ্টে হায় এ জন্মের তরে
> আমার মনের গান মর্ম্মের রোদনধ্বনি
> স্পর্শও করে না আজ তোমার অন্তরে।

তবুও— তবুও সখি তোমারেই শুনাইব
তোমারেই দিব সখি যা আছে আমার।
দিনু যা মনের সাথে, তুলিয়া লও তা হাতে
ভগ্নহৃদয়ের এই প্রীতি উপহার।'

কবিতাটি লিখতে লিখতেই রবি ঠিক করে ফেলেন এটি হবে তাঁর আগামী বইয়ের উৎসর্গ কবিতা। এখনি পড়াতে হবে জ্যোতিদাদাকে আর দোলনায় দুলন্ত ওই নিষ্ঠুরা মানবীকেই তিনি সব লেখা উৎসর্গ করবেন। রবি ভাবেন, তবু কি নিভবে তাঁর বুকের আগুন?

রবির মনের এই টানাপোড়েনের মাঝখানেই সত্যেন বিলেত যাওয়ার সব ঠিকঠাক করে ফেললেন। জ্ঞানদা ইতিমধ্যে ছেলেমেয়েদের নিয়ে লন্ডনের পাশে সমুদ্রতীরের ব্রাইটন শহরে গুছিয়ে সংসার করছেন। কয়েকমাসের মধ্যেই রবিকে নিয়ে সেখানে যাবেন সত্যেন। রবির বিদ্যালয়-বিমুখ চঞ্চল মনকে বাগে আনতে হলে বিলেত ঘুরিয়ে আনা দরকার।

তার আগে ইংরেজি কেতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য রবিকে কিছুদিন সত্যেনের কর্মস্থল শাহীবাগ ও বোম্বাইয়ের পাণ্ডুরং পরিবারে থাকতে হল। ওই পরিবারের মধ্যে নাকি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আশ্চর্য মিলমিশ হয়েছে, দেশের মেয়েদের মধ্যে বিলেতের আদবকায়দা শেখার একটি পথ হবে ওদের সঙ্গে মেলামেশা। এ-সবই সত্যেনের সিদ্ধান্ত।

রবির মনে হয় তাঁকে যেন শিকড়সুদ্ধ উপড়ে আনা হয়েছে এক খেত থেকে অন্য খেতে। নতুন পরিবেশে সব কিছুতেই লজ্জা। অচেনা লোকের সঙ্গে আলাপ হলে কী বলবেন, কী করবেন ভেবে পান না। ইংরেজি বলার অভ্যেস নেই।

আনা কিন্তু সত্যিই অবাক করল রবিকে। অচেনাকে আপন করে নিতে তাঁর জুড়ি নেই। বয়সে ষোড়শী, ইতিমধ্যেই বিলেত থেকে ঘষেমেজে এনেছেন শিক্ষার পালিশ। সমবয়সি রবিকে আন্না কবি হিসেবে যেরকম আন্তরিক সমাদরে গ্রহণ করলেন তা আগে কেউ করেনি।

আনার মতো মেয়ে সত্যিই আগে দেখেননি রবি। বাঙালিঘরের রীতিনিয়মে মেয়েরা যেন জড়সড় হয়ে থাকে। এমনকী ঠাকুরবাড়ির আলোমাখা মেয়েরাও এত সহজে বাইরের পুরুষের সঙ্গে কথা বলেন না। স্মার্ট ছটফটে আনাকে

প্রথম প্রথম একটু গায়ে পড়া মনে করে সংকুচিত ছিলেন রবি। কিন্তু ক্রমশ আড় ভাঙল। আনার সপ্রতিভতার সামনে বড়াই করার মতো একটি গুণই ছিল রবির, সেই কবিতা লেখার ক্ষমতাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করাই ভাল মনে হল তাঁর। প্রতিদিন সকাল বিকেল আনার কাজ রবিকে ইংরেজি সাহিত্য পড়ানো। কিন্তু তার বদলে বেশিরভাগ দিন রবিই তাঁকে নিজের বাংলা কবিতা শোনান। আনাও সোৎসাহে রবির গা ঘেঁসে বসে কাব্যের মানে বুঝে নেন।

এত কাছে অনাত্মীয়া তরুণীটিকে পেয়ে বুক দুর দুর করে রবির। তাঁর শরীরের মাদক গন্ধের সঙ্গে ভেসে আসা পারফিউম রবিকে এলোমেলো করে দেয়।

আনা একদিন বললেন, তোমার মুখে কোনওদিন দাড়ি রাখতে পারবে না, আমাকে কথা দাও। এত সুপুরুষ মুখশ্রী নষ্ট কোরো না খবরদার।

রবির শিহরন হয়, এই প্রথম নিজের চেহারার তারিফ শুনলেন তিনি। এতদিন নতুনবউঠানের গঞ্জনা শুনে শুনে চেহারার সাধারণত্ব সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। এবার তিনি আনার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। বলেন, কেন আনা, দাড়ি খারাপ কীসে?

দাড়ি খারাপ না! হেসে লুটিয়ে পড়েন আনা, দাড়ি থাকলে মেয়েরা তোমাকে চুমু খেতে দেবে না। তোমার মুখের সীমানা যেন কোনওদিন দাড়িতে ঢাকা না পড়ে।

রবি দেখলেন, আনার মুখ কৌতুকে উজ্জ্বল, চোখে রহস্যের ইশারা। ও কেন চুমুর কথা বলল? এর কি কোনও মানে আছে? রবির কী করা উচিত? রবির বিহ্বল লাগে।

আনা আবার জানতে চান, তুমি কি কোনও মেয়েকে চুমু খেয়েছ? চুমু খেতে না শিখলে কবিতা লিখবে কী করে রবি? ও কী, ব্লাশ করছ কেন? কাম অন ইয়ং ম্যান, পুরুষ কি ব্লাশ করে?

অপ্রস্তুত রবি কবিতার খাতায় ফিরে যেতে চান।

আনা শুনতে চান প্রেমের গান। রবির হাত ধরে বললেন, কবি, তোমার গান আমাকে মৃত্যুশয্যা থেকে টেনে তুলতে পারে। কী অপূর্ব তোমার গান!

রবির মনে পড়ে তাঁর গান শুনে নতুনবউঠান কেমন তাচ্ছিল্য করেন। শুধু জ্যোতিদাদার উৎসাহে এতদিন গান গেয়ে চলছিলেন তিনি। আনা, তুমি আমার জ্যোতিদাদার গান শুনেছিলে?

আনা বলেন, হ্যাঁ, জ্যোতি ঠাকুরও খুব সুন্দর গাইতেন। কিন্তু তুমি যখন গান কর আমার শরীরে পদ্মকাঁটা ফুটে ওঠে।

রবির এবার বোল ফোটে, বলেন, আনা তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মেয়ে! তোমার দেহ সুন্দর, মন সুন্দর, ভাষা সুন্দর। তুমিই আমার গানকে সুন্দর করেছ আনা।

তুমি আমাকে একটা নাম দেবে কবি? রবির সামনে অঞ্জলি পেতে আনা বলেন, সবাই যে নামে ডাকে তুমি সেটায় ডাকবে না। তোমার গান থেকে, কবিতা থেকে একটা নাম দাও।

দেব, নিশ্চয় দেব, ফিসফিস করে রবি বললেন, কিন্তু আজ নয়! কাল ভোরে তুমি যখন ঘুমিয়ে থাকবে, তোমার জানলার কাছে গিয়ে নতুন নামে ডেকে ঘুম ভাঙাব আমি।

আনন্দে উচ্ছল হয়ে ঘুমোতে যান আনা। রবির চোখে ঘুম আসে না। যাঁকে ছেড়ে এসেও দিনরাত মনে পড়ে, তিনি রবির ব্যাকুলতাকে পাত্তা দেননি। আর এখন এই ব্যাকুল নবযুবতীকে নিয়ে রবি কী করবেন? কী নামে ডাকবেন তাকে? কীভাবে ভাঙাবেন তার ঘুম?

রবি আনার জন্য নাম ঠিক করলেন, 'নলিনী'। ওই নাম নিয়ে সারারাত ধরে গানটি রচনা করলেন। না ঘুমিয়ে ভোরবেলা সূর্যের আলো ফোটার আগে বাগানে চলে এলেন। হাতে একগুচ্ছ বকুলফুল কুড়িয়ে আনার জানলা দিয়ে ঘরে ছড়িয়ে দিয়ে গান ধরলেন,

'উঠ নলিনী, খোল গো আঁখি ঘুম এখনো ভাঙিল না কি'

ভোরবেলার এই গানের প্রতীক্ষায় আনাও জেগে ঘুমিয়ে ছিলেন সারাটি রাত। জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন রবির দিকে, আনার চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলি মিশে গেল রবির কম্পমান হাতে।

একমাস সময় বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে আসছে। রবি আনাকে গান শোনান, ভারতীর পৃষ্ঠা থেকে কবিকাহিনীর কবিতা শোনান আর আনা মুগ্ধ চোখে কাব্যসুরা পান করেন। কিছু একটা ঘটছে, রবি বুঝতে পারেন। কিন্তু কিছুতেই এগোতে পারেন না নিজে থেকে।

রবি যত ইংরেজি শিখলেন তার চেয়ে বেশি বাংলা শিখে ফেললেন আনা।

তিনি এখন ভারতী পড়তে পারেন। রবি ঠিক করলেন ভারতীর সংখ্যাগুলি এই পাঠিকাকেই উপহার দিয়ে যাবেন।

রবির মনখারাপ লাগছিল বাড়ির জন্য, বাড়ি বলতেই তাঁর মনে ভেসে ওঠে কাদম্বরীর মুখ। সেই গঙ্গাতীর তেমনি আছে, পাখিরা তেমনি ডাকছে, নতুনবউঠানের সাজা পান মুখে দিয়ে বিহারীলাল তেমনি খুশি হয়ে উঠছেন, শুধু রবি সেখানে অনুপস্থিত। ডানা থাকলে উঁকি দিয়ে দেখে আসতেন কী হচ্ছে সেখানে।

পেছন থেকে এসে চোখ টিপে ধরেন আনা। বলেন, কী এত ভাব আকাশপাতাল?

রবি ভাবেন আজ আবার কী কাণ্ড বাধাবেন আনা কে জানে? মনে নিশ্চয় কোনও মতলব আছে। এই চঞ্চলা মেয়েটিকে রবির ভাল লাগে আবার ভয়ও পান। চেনা জীবনের মাঝে কোনও অচেনা মহল থেকে উড়ে আসা আনাবাই যেন আপন মানুষের দূতী, হৃদয়ের সীমানা বাড়িয়ে দিচ্ছে ক্রমশই। যে-কোনও মেয়ের কাছ থেকে পাওয়া স্নেহ, প্রীতি, প্রেম যেন জীবনের ওপর ঝরে পড়া প্রসাদ। যাকে ফেভার বলা যায় ইংরেজিতে। মেয়েদের ভালবাসা তা যেরকমই হোক, রবির মনে যেন না-ফোটা ফুল ফুটিয়ে রাখে। সেই ফুল ঝরে গেলেও গন্ধ মেলায় না। এই যে নলিনী না ডাকতেই কাছে আসে, রবি ভাবেন, একদিন হয়তো ডেকেও পাওয়া যাবে না তাকে। তবু তার আহ্বানে সাড়া দিতে সাহস হয় না। ডুবতে ভয় পান রবি।

উত্তর না পেয়ে রবির গা ঘেঁসে নেয়ারের খাটে বসে পড়েন আনা। রবির হাত ধরে টেনে বললেন, আচ্ছা রবি, টানো তো আমার হাত ধরে, দেখি কে জেতে টাগ অফ ওয়ারে!

কেন যে এই খেলাটাই খেলতে হবে বোঝেন না রবি। খেলা শুরু হতে না হতেই শক্তি পরীক্ষায় হেরে গিয়ে আনা এসে পড়লেন রবির কোলে। তারপর শুরু হল রবির গলা জড়িয়ে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা। ঠোঁটের এত কাছে ঠোঁট নিয়ে আসেন আনা, তবু কি একবার চুমু খেতে পারে না রবি? আনা ভাবেন, হাঁদা একেবারে! কোনও রসকষ নেই! আনার একটু প্রসাদ পাওয়ার আশায় কত ছেলে পেছন পেছন ঘুরছে, আর এই কিশোর কবির কাছে তাঁর মোহিনীশক্তির কোনও মর্যাদাই নেই! রবি কি জানে না কবির হৃদয়েশ্বরী হওয়ার জন্য কত প্রণয়ীকে উপেক্ষা করছেন আনা! স্বয়মাগতা

নারীকে হেলায় ফিরিয়ে দিতে পারেন যিনি, তাঁকে জয় করতে আনা ব্যাকুল হয়ে ওঠেন! অথচ রবির ব্যাকুল মনে অন্য এক রহস্যময়ীর ছায়া।

শেষে একদিন মরিয়া হয়ে আনা বললেন, জানো কোনও মেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে যদি কেউ তার দস্তানা চুরি করতে পারে তো কী হয়? সাদা মহার্ঘ লেসের বিলিতি গাউন পরা আনাকে এঞ্জেলের মতো পবিত্র দেখায়। অথচ মুখ দুষ্টু হাসিতে ভরপুর।

রবি তো কিছুই বোঝেন না, কখন যে কী বলে মেয়েটা। এই প্যাচপেচে ভাদ্রের গরমে দস্তানার কথা আসেই বা কেন! অবাক হয়ে জানতে চান, কী হয়? কী আবার হবে দস্তানা চুরি করলে? চোর ধরা পড়লে মেয়ের বাবার হাতে পিট্টি খাবে।

ধুর বোকা, আনা রবির গালে টোকা দিয়ে কানে কানে বলেন, ঘুম ভাঙিয়ে মেয়েটিকে চুমু খাওয়ার অধিকার জন্মায় তার। আনার প্রগলভ উসকানিতে কান গরম হয়ে ওঠে রবির।

এমন আজব নিয়ম কোন শাস্ত্রেই বা লেখা আছে, আর কেনই বা এমন করে তাঁকে চোরা ঘূর্ণিতে টানছে আনা? রবি অন্য গল্প শোনান, গ্যেটের গল্পটা জানো তো নলিনী, য়ুরোপে একরকম তাস খেলায় মহিলাদের কাছে পুরুষ হেরে গেলে চুম্বন দণ্ড দিতে হয়। গ্যেটে এই খেলাটা খেলতেন কিন্তু হেরে গেলে চুম্বনের পরিবর্তে মহিলাদের কবিতা উপহার দিতেন। তুমি বলো, চুম্বনের চেয়ে কবির কবিতা কি অনেক লোভনীয় উপহার না?

আনার মোটেই পছন্দ হয় না গল্পটা। তিনি দৃঢ়ভাবে জানান, চুম্বন ছাড়া কবিতা লেখা যায় না। কিন্তু কবিতা না থাকলেও চুম্বন থাকবে। বলেই আনা টুপ করে রবির বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুমন্ত আনার দিকে তাকিয়ে থাকেন বিস্মিত রবি। পাশেই পড়ে আছে খুলে রাখা আনার দস্তানা। ভাবেন, তাঁর কী করণীয়? আনা কিছু কি ইঙ্গিত করছে? কিন্তু রবির দ্বিধা কাটে না, দস্তানার দিকে হাত বাড়িয়েও আবার গুটিয়ে নেন। না, রবি কিছুতেই পারবেন না আনাকে চুমু খেতে। অনিবার্য নিয়তির মতো তাঁর মনে পড়ে যাচ্ছে কাদম্বরীর মুখ।

ঘুমপরিকে ফেলে রেখে চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে যান রবি। চুম্বন নয়, আনার জন্য তাঁর মাথায় ভেসে বেড়ায় কবিতার লাইন,

'শুনেছি শুনেছি কি নাম তাহার
শুনেছি শুনেছি তাহা
নলিনী নলিনী নলিনী নলিনী
কেমন মধুর আহা!'

ভারতবর্ষের সমুদ্রসীমা ও আনার দুরন্ত অভিমানকে পেছনে ফেলে ১৮৭৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর সত্যেনের সঙ্গে বিলেতের জাহাজে চাপলেন রবি। জাহাজে তাঁর প্রধান কাজ দেখা আর লেখা। কখনও কবিতা লিখছেন, কখনও চিঠি। সাতদিন ধরে সবচেয়ে বড় চিঠিটিই লিখলেন নতুনবউঠানকে—

'বিশে সেপ্টেম্বরে আমরা 'পুনা' স্টীমারে উঠলেম। পাঁচটার সময় জাহাজ ছেড়ে দিলে। আমরা তখন জাহাজের ছাতে দাঁড়িয়ে। আস্তে আস্তে আমাদের চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ তটরেখা মিলিয়ে গেল। চারি দিকের লোকের কোলাহল সইতে না পেরে আমি আমার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেম। গোপন করবার বিশেষ প্রয়োজন দেখছি নে, আমার মনটা কেমন নির্জীব, অবসন্ন, ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল, কিন্তু দূর হোক গে— ও-সব করুণরসাত্মক কথা লেখবার অবসরও নেই ইচ্ছেও নেই; আর লিখলেও, হয় তোমার চোখের জল থাকবে না, নয় তোমার ধৈর্য থাকবে না।

সমুদ্রের পায়ে দণ্ডবৎ। ২০শে থেকে ২৬শে পর্যন্ত যে করে কাটিয়েছি তা আমিই জানি। সমুদ্রপীড়া কাকে বলে অবিশ্যি জান কিন্তু কী রকম তা জান না। আমি সেই ব্যামোয় পড়েছিলেম, সে কথা বিস্তারিত করে লিখলে পাষাণেরও চোখে জল আসবে। ছটা দিন, মশায়, শয্যা থেকে উঠি নি। যে ঘরে থাকতেম, সেটা অতি অন্ধকার, ছোটো, পাছে সমুদ্রের জল ভিতরে আসে তাই চার দিকের জানলা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। অসূর্যম্পশ্যরূপ ও অবায়ুস্পর্শ্যদেহ হয়ে ছয়টা দিন কেবল বেঁচে ছিলেম মাত্র। প্রথম দিন সন্ধেবেলায় আমাদের একজন সহযাত্রী আমাকে জোর করে বিছানা থেকে উঠিয়ে খাবার টেবিলে নিয়ে গেলেন। যখন উঠে দাঁড়ালেম তখন আমার মাথার ভিতর যা-কিছু আছে সবাই মিলে যেন মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ করে দিলে, চোখে দেখতে পাই নে, পা চলে না, সর্বাঙ্গ টলমল করে! দু-পা গিয়েই একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসে পড়লেম। আমার সহযাত্রীটি আমাকে ধরাধরি করে জাহাজের ডেক-এ নিয়ে গেলেন। একটা রেলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেম। তখন অন্ধকার রাত।

আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। আমাদের প্রতিকূলে বাতাস বইছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে সেই নিরাশ্রয় অকূল সমুদ্রে দুই দিকে অগ্নি উৎক্ষিপ্ত করতে করতে আমাদের জাহাজ একলা চলেছে; যেখানে চাই সেইদিকেই অন্ধকার, সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠছে— সে এক মহা গম্ভীর দৃশ্য।...

...আমি যখন ঘর থেকে বেরোতে আরম্ভ করলেম, তখন জাহাজের যাত্রীদের উপর আমার নজর পড়ল ও আমার উপর জাহাজের যাত্রীদের নজর পড়ল। আমি স্বভাবতই 'লেডি' জাতিকে বড়ো ডরাই। তাঁদের কাছে ঘেঁষতে গেলে এত প্রকার বিপদের সম্ভাবনা যে, চাণক্য পণ্ডিত থাকলে লেডিদের কাছ থেকে দশ সহস্র হস্ত দূরে থাকতে পরামর্শ দিতেন। এক তো মনোরাজ্যে নানাপ্রকার শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা— তা ছাড়া সর্বদাই ভয় হয় পাছে কী কথা বলতে কী কথা বলে ফেলি, আর আমাদের অসহিষ্ণু লেডি তাঁদের আদবকায়দার তিলমাত্র ব্যতিক্রম সইতে না পেরে দারুণ ঘৃণায় ও লজ্জায় একেবারে অভিভূত হন। পাছে তাঁদের গাউনের অরণ্যের মধ্যে ভ্যাবাচেকা খেয়ে যাই, পাছে আহারের সময় তাঁদের মাংস কেটে দিতে হয়, পাছে মুরগির মাংস কাটতে গিয়ে নিজের আঙুল কেটে বসি— এইরকম সাত-পাঁচ ভেবে আমি জাহাজের লেডিদের কাছ থেকে অতি দূরে থাকতেম। আমাদের জাহাজে লেডির অভাব ছিল না, কিন্তু জেন্টলম্যানেরা সর্বদা খুঁত খুঁত করতেন যে, তার মধ্যে অল্পবয়স্কা বা সুশ্রী এক জনও ছিল না।...

...প্রত্যহ খাবার সময় ঠিক আমার পাশেই B—বসতেন। তিনি একটি ইয়ুরাশীয়। কিন্তু তিনি ইংরেজের মতো শিস দিতে, পকেটে হাত দিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়াতে সম্পূর্ণরূপে শিখেছেন। তিনি আমাকে বড়োই অনুগ্রহের চোখে দেখতেন। একদিন এসে মহাগম্ভীর স্বরে বললেন, 'ইয়ংম্যান্, তুমি অক্সফোর্ডে যাচ্ছ? অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি বড়ো ভালো বিদ্যালয়।' আমি একদিন ট্রেঞ্চ সাহেবের 'Proverbs and their lessons' বইখানি পড়ছিলেম, তিনি এসে বইটি নিয়ে শিস দিতে দিতে দু-চার পাত উল্টিয়ে পাল্টিয়ে বললেন, 'হাঁ, ভালো বই বটে।'

এডেন থেকে সুয়েজে যেতে দিন-পাঁচেক লেগেছিল। যারা ব্রিন্দিসি-পথ দিয়ে ইংলন্ডে যায় তাদের জাহাজ থেকে নেবে সুয়েজে রেলওয়ের গাড়িতে উঠে আলেকজান্দ্রিয়াতে যেতে হয়— আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরে তাদের জন্যে একটা স্টীমার অপেক্ষা করে— সেই স্টীমারে চড়ে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে ইটালিতে

পৌঁছতে হয়। আমরা overland ডাঙা-পেরোনো যাত্রী, সুতরাং আমাদের সুয়েজে নাবতে হল। আমরা তিনজন বাঙালি ও একজন ইংরেজ একখানি আরব নৌকা ভাড়া করলেম। মানুষের 'divine' মুখশ্রী কতদূর পশুত্বের দিকে নাবতে পারে, তা সেই নৌকোর মাঝিটার মুখ দেখলে জানতে পারতে। তার চোখ দুটো যেন বাঘের মতো, কালো কুচকুচে রঙ, কপাল নিচু, ঠোঁট পুরু, সবসুদ্ধ মুখের ভাব অতি ভয়ানক। অন্যান্য নৌকোর সঙ্গে দরে বনল না, সে একটু কম দামে নিয়ে যেতে রাজি হল। ব— মহাশয় তো সে নৌকোয় বড়ো সহজে যেতে রাজি নন— তিনি বললেন আরবদের বিশ্বাস করতে নেই— ওরা অনায়াসে গলায় ছুরি দিতে পারে। তিনি সুয়েজের দুই-একটা ভয়ানক ভয়ানক অরাজকতার গল্প করলেন। কিন্তু যা হোক, আমরা সেই নৌকোয় তো উঠলেম। মাঝিরা ভাঙা ভাঙা ইংরেজি কয়, ও অল্পস্বল্প ইংরেজি বুঝতে পারে। আমরা তো কতক দূর নির্বিবাদে গেলেম। আমাদের ইংরেজ যাত্রীটির সুয়েজের পোস্ট আপিসে নাববার দরকার ছিল। পোস্ট আপিস অনেক দূর এবং যেতে অনেক বিলম্ব হবে, তাই মাঝি একটু আপত্তি করলে; কিন্তু শীঘ্রই সে আপত্তি ভঞ্জন হল। তার পরে আবার কিছু দূরে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে 'পোস্ট আপিসে যেতে হবে কি? সে দুই-এক ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া অসম্ভব।' আমাদের রুক্ষস্বভাব সাহেবটি মহাক্ষাপা হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'Your grandmother!' এই তো আমাদের মাঝি রুখে উঠলেন, 'What? mother? mother? what mother, don't say mother!' আমরা মনে করলুম সাহেবটাকে ধরে বুঝি জলে ফেলে দিলে, আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'What did say? (কী বললি?)' সাহেব তাঁর রোখ ছাড়লেন না। আবার বললেন, 'Your grandmother'। এই তো আর রক্ষা নেই, মাঝিটা মহা তেড়ে উঠল। সাহেব গতিক ভালো নয় দেখে নরম হয়ে বললেন, 'You don't seem to understand what I say!' অর্থাৎ তিনি তখন grandmother বলাটা যে গালি নয় তাই প্রমাণ করতে ব্যস্ত। তখন সে মাঝিটা ইংরেজি ভাষা ছেড়ে ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল 'বস—চুপ'। সাহেব থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন, আর তাঁর বাক্যস্ফূর্তি হল না। আবার খানিক দূর গিয়ে সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন 'কতদূর বাকি আছে?' মাঝি অগ্নিশর্মা হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'Two shilling give, ask what distance!' আমরা এইরকম বুঝে গেলেম যে, দু-শিলিং ভাড়া দিলে সুয়েজ-রাজ্যে এইরকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আইনে নেই! মাঝিটা যখন আমাদের এইরকম ধমক দিচ্ছে তখন অন্য অন্য দাঁড়িদের ভারি আমোদ বোধ হচ্ছে, তারা তো পরস্পর মুখচাওয়াচাওয়ি

করে মুচকি মুচকি হাসি আরম্ভ করলে। মাঝিমহাশয়ের বিষম বদমেজাজ দেখে তাদের হাসি সামলানো দায় হয়ে উঠেছিল। একদিকে মাঝি ধমকাচ্ছে, একদিকে দাঁড়িগুলো হাসি জুড়ে দিয়েছে, মাঝিটির উপর প্রতিহিংসা তোলবার আর কোনো উপায় না দেখে আমরাও তিনজনে মিলে হাসি জুড়ে দিলেম—...

...আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে আমাদের জন্য 'মঙ্গোলিয়া' স্টীমার অপেক্ষা করছিল। এইবার আমরা ভূমধ্যসাগরের বক্ষে আরোহণ করলেম। আমার একটু শীত-শীত করতে লাগল। জাহাজে গিয়ে খুব ভালো করে স্নান করলেম, আমার তো হাড়ে হাড়ে ধুলো প্রবেশ করেছিল। স্নান করার পর আলেকজান্দ্রিয়া শহর দেখতে গেলেম। জাহাজ থেকে ডাঙা পর্যন্ত যাবার জন্যে একটা নৌকো ভাড়া হল। এখানকার এক-একটা মাঝি সার উইলিয়ম জোন্‌সের দ্বিতীয় সংস্করণ বললেই হয়। তারা গ্রীক ইটালিয়ান ফ্রেঞ্চ ইংরেজি প্রভৃতি অনেক ভাষায় চলনসই রকম কথা কইতে পারে।...

...চার-পাঁচ দিনে আমরা ইটালিতে গিয়ে পৌঁছলেম। তখন রাত্রি একটা-দুটো হবে। গরম বিছানা ত্যাগ করে জিনিসপত্র নিয়ে আমরা জাহাজের ছাতে গিয়ে উঠলেম। জ্যোৎস্নারাত্রি, খুব শীত; আমার গায়ে বড়ো একটা গরম কাপড় ছিল না, তাই ভারি শীত করছিল। আমাদের সুমুখে নিস্তব্ধ শহর, বাড়িগুলির জানলা দরজা সমস্ত বন্ধ— সমস্ত নিদ্রামগ্ন। আমাদের যাত্রীদের মধ্যে ভারি গোল পড়ে গেল, কখনো শুনি ট্রেন পাওয়া যাবে, কখনো শুনি পাওয়া যাবে না। জিনিসপত্রগুলো নিয়ে কী করা যাবে ভেবে পাওয়া যায় না, জাহাজে থাকব কি বেরোব কিছুই স্থির নেই। একজন ইটালিয়ান অফিসার এসে আমাদের গুনতে আরম্ভ করলে— কিন্তু কেন গুনতে আরম্ভ করলে তা ভেবে পাওয়া গেল না। জাহাজের মধ্যে এইরকম একটা অস্ফুট জনশ্রুতি প্রচারিত হল যে, এই গণনার সঙ্গে আমাদের ট্রেনে চড়ার একটা বিশেষ যোগ আছে। কিন্তু সে-রাত্রে মূলেই ট্রেন পাওয়া গেল না। শোনা গেল, তার পরদিন বেলা তিনটের আগে ট্রেন পাওয়া যাবে না। যাত্রীরা মহা বিরক্ত হয়ে উঠল। অবশেষে সে-রাত্রে ব্রিন্দিসির হোটেলে আশ্রয় নিতে হল।

এই তো প্রথম য়ুরোপের মাটিতে আমার পা পড়ল। কোনো নূতন দেশে আসবার আগে আমি তাকে এমন নূতনতর মনে করে রাখি যে, এসে আর তা নূতন বলে মনেই হয় না। য়ুরোপ আমার তেমন নূতন মনে হয় নি শুনে সকলেই অবাক।

...প্যারিসে পৌঁছিয়েই আমরা একটা 'টার্কিশ-বাথে' গেলেম। প্রথমত একটা খুব গরম ঘরে গিয়ে বসলেম, সে-ঘরে অনেকক্ষণ থাকতে থাকতে কারও কারও ঘাম বেরতে লাগল, কিন্তু আমার তো বেরল না, আমাকে তার চেয়ে আর একটা গরম ঘরে নিয়ে গেল, সে ঘরটা আগুনের মতো, চোখ মেলে থাকলে চোখ জ্বালা করতে থাকে, মিনিট কতক থেকে সেখানে আর থাকতে পারলেম না, সেখান থেকে বেরিয়ে খুব ঘাম হতে লাগল। তার পরে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে আমাকে শুইয়ে দিলে। ভীমকায় এক ব্যক্তি এসে আমার সর্বাঙ্গ ডলতে লাগল। তার সর্বাঙ্গ খোলা, এমন মাংসপেশল চমৎকার শরীর কখনো দেখি নি। 'ব্যূঢোরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।' মনে মনে ভাবলেম ক্ষীণকায় এই মশকটিকে দলন করার জন্যে এমন প্রকাণ্ড কামানের কোনো আবশ্যক ছিল না। সে আমাকে দেখে বললে, আমার শরীর বেশ লম্বা আছে, এখন পাশের দিকে বাড়লে আমি একজন সুপুরুষের মধ্যে গণ্য হব; আধ ঘণ্টা ধরে সে আমার সর্বাঙ্গ অবিশ্রান্ত দলন করলে, ভূমিষ্ঠকাল থেকে যত ধুলো মেখেছি, শরীর থেকে সব যেন উঠে গেল। যথেষ্টরূপে দলিত করে আমাকে আর-একটি ঘরে নিয়ে গেল, সেখানে গরম জল দিয়ে, সাবান দিয়ে, স্পঞ্জ দিয়ে শরীরটা বিলক্ষণ করে পরিষ্কার করলে। পরিষ্করণ-পর্ব শেষ হলে আর-একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে একটা বড়ো পিচকিরি করে গায়ে গরম জল ঢালতে লাগল, হঠাৎ গরম জল দেওয়া বন্ধ করে বরফের মতো ঠাণ্ডা জল বর্ষণ করতে লাগল— এইরকম কখনো গরম কখনো ঠাণ্ডা জলে স্নান করে একটা জলযন্ত্রের মধ্যে গেলেম, তার উপর থেকে নীচে থেকে চার পাশ থেকে বাণের মতো জল গায়ে বিঁধতে থাকে। সেই বরফের মতো ঠাণ্ডা বরুণ-বাণ-বর্ষণের মধ্যে খানিকক্ষণ থেকে আমার বুকের রক্ত পর্যন্ত যেন জমাট হয়ে গেল— রণে ভঙ্গ দিতে হল, হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এলেম। তার পরে এক জায়গায় পুকুরের মতো আছে, আমি সাঁতার দিতে রাজি আছি কি না জিজ্ঞাসা করলে। আমি সাঁতার দিলেম না, আমার সঙ্গী সাঁতার দিলেন। তাঁর সাঁতার দেওয়া দেখে তারা বলাবলি করতে লাগল, 'দেখো দেখো, এরা কী অদ্ভুত রকম করে সাঁতার দেয়, ঠিক কুকুরের মতো।' এতক্ষণে স্নান শেষ হল। আমি দেখলেম টার্কিশ-বাথে স্নান করা আর শরীরটাকে ধোপার বাড়ি দেওয়া এক কথা।"

কাদম্বরী রবির এ-সব চিঠি পড়ে নিজের মনেই হেসে কুটোপাটি হতে থাকেন।

১১

বসন্তবিলাপ

জোড়াসাঁকোর তেতলার বারান্দার আড্ডায় সেদিন সংস্কৃত নাটক পাঠ করছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। বসন্ত উৎসবের বর্ণনা পড়তে পড়তে তাঁর মনে হল কী সুন্দর ছিল সেকালের বসন্ত উৎসব, যেন হৃদয়ের হোরিখেলা। তিনি সবাইকে বলেন, দেখো আমরা এমন প্রাণ খুলে আবির মাখতে পারি না কেন? দিশি রীতির এই রঙের উৎসবকে কি ফিরিয়ে আনা যায় না?

কাদম্বরীও উৎসাহে মেতে উঠলেন, কেন পারব না, আমাদের উঠোনেই বসন্ত উৎসব করলে হয়, কিংবা পাশের বৈঠকখানা বাড়ির আঙিনায়।

তা হলে গুণোদাদাকে খবর পাঠানো হোক, স্বর্ণ বললেন, দু'বাড়ির ভাইবোনেরা মিলে দারুণ মজার বসন্তখেলা হবে।

এ-সব ব্যাপারে গুণেন্দ্রনাথের বরাবর খুব উৎসাহ। দু'বাড়ির ছেলেমেয়েদের নিয়ে আগেও তিনি হিন্দুমেলা বা নবনাটকের আয়োজনে মেতে উঠেছেন। যদিও এরমধ্যে বৈঠকখানা বাড়ির ভাগ নিয়ে বিধবা ভাই-বউ ত্রিপুরাসুন্দরীর বিরুদ্ধে মামলা ঠুকেছেন দেবেন ঠাকুর। নিঃসন্তান ত্রিপুরাসুন্দরী দত্তক নিতে চেয়েছিলেন মেজোবউ যোগমায়ার ছোটছেলে গুণেনকে। তাতে দ্বারকানাথের সম্পত্তির অনেকটা অংশই গুণেনের ভাগে পড়ত। দেবেন ঠাকুর সেই আশঙ্কায় সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে দাবি করলেন বিধবার দত্তক নেওয়ার অধিকার নেই। রায় দেবেনের পক্ষে গেল, ফলে ছোটভাই নগেনের ভাগের সম্পত্তির অনেকটাই অর্জন করলেন তিনি। গুণেন বঞ্চিত হলেন, ত্রিপুরাসুন্দরী ক্ষুব্ধ হয়ে থাকলেন। তবু সে-সব গায়ে না মেখে গুণেন্দ্র এবারেও মহানন্দে বসতবাড়ির ভাইবোনেদের সঙ্গে উৎসবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

ধর্ম নিয়ে দু'বাড়ির বিভেদ হলেও ছেলেমেয়েদের মনের টান রয়ে গেছে। ৬ নম্বরের ব্রাহ্ম বিয়েতে ৫ নম্বরের হিন্দু আত্মীয়রা আসেন না, আবার ৫ নম্বরের বিয়েতে ৬ নম্বর বাড়ির আসেন না। কিন্তু প্রতিটি বিয়ে উপলক্ষেই থিয়েটার বা গানের আসর বসানো হয়, যেখানে ৫ এবং ৬ মিলেমিশে আনন্দ করে। এইসব আয়োজনে গুণেন খুব উৎসাহী। গোপাল উড়ের যাত্রা দেখে উৎসাহিত হয়ে গুণেন আর জ্যোতি মিলে বাড়িতে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা তৈরি করেছেন। নবনাটক সেখানেই অভিনীত হয়েছিল, বসন্ত উৎসবের নাচগানও সেই মঞ্চে। আপন ঔদার্যে সকলকে জড়িয়ে নিয়ে উৎসবে মেতে উঠতে গুণেনের জুড়ি নেই।

সুতরাং এক বসন্তসন্ধ্যায় রঙিন আলোয় আর আবিরে বৈঠকখানা-বাড়ির বাগান হয়ে উঠল নন্দনকানন। পিচকারিতে রংখেলাও বাদ রইল না।

বসন্ত উৎসবে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও আমন্ত্রিত। অক্ষয় ও শরৎকুমারী এমন সমাবেশে পুলকিত হয়ে নিজেরা পরস্পর রং মাখাচ্ছেন।

কাদম্বরী সেজেছেন সেকালিনীর মতো। বেলফুলের মালা জড়ানো কবরীতে পিন করা জর্জেটের ওড়না, হাতে মাধবীলতার কঙ্কণ, গলায় মাধবীমালা, কানেও ঝুমকোর মতো একগুচ্ছ মাধবীফুল। তাঁকে দেখে জ্যোতিও মুগ্ধ হয়ে দু'হাত বাড়িয়ে ডাক দিলেন, অয়ি মাধবিকা কুসুমনন্দিতা!

কাদম্বরীও হাত বাড়িয়ে জ্যোতির সাদা জামায় আবির ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, ওহে আবিরলাঞ্ছিত যুবা, এসো আমরা বসন্তের আবাহন করি।

কন্দর্পনিন্দিত জ্যোতিরিন্দ্র ও অপরূপা কাদম্বরীর এই কৌতুকনাট্য সকলেই মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকেন, তাঁরা যেন এই লৌকিকস্তর থেকে ঊর্ধ্বে কোনও মায়াজাল রচনা করেছেন বাগানে।

একটু পরেই আবার সে-দৃশ্য ভেঙে আর-একটি দৃশ্যের জন্ম হয়। যেন নাটকের পালাবদলের মতো এক-এক টুকরো কথা, সংলাপ, ভঙ্গি, দৃশ্য ছড়িয়ে পড়তে থাকে বসন্তের বাগানে।

একসময় বিহারীলাল অঞ্জলিভরা আবির নিয়ে এগিয়ে আসেন কাদম্বরীর দিকে। আঙুলে করে গুঁড়ো গুঁড়ো লাল, সবুজ, গোলাপি বৃষ্টির মতো ছড়িয়ে দিতে থাকেন কাদম্বরীর মাথায়, গায়ে, সারা শরীরে। কাদম্বরীও কিশোরীর উচ্ছ্বাসে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে ভিজতে থাকেন সেই আবিরবর্ষণে।

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎই কাদম্বরীর চোখ পড়ে রূপার দিকে, এক গোরাসাহেব

রূপাকে আচ্ছা করে আবির মাখাচ্ছে আর রূপা বেহায়ার মতো খিলখিল হাসিতে লুটিয়ে পড়ছে। এর সঙ্গেই তো রূপার খুব মাখামাখি শোনা যাচ্ছে! কাদম্বরীর মেজাজ খারাপ হয়ে যায় রূপার বেহায়াপনায়।

রূপা সাহেব যুবকটির হাত ধরে টানতে টানতে কাদম্বরীর কাছে নিয়ে আসে, দেখো নতুনবোঠান, তোমাকে দেখে পরি ভেবেছে হরিসাহেব, তোমাকে বলছে এঞ্জেল। আমি আলাপ করতে ধরে এনেছি।

কাদম্বরী তার হাত ধরে দূরে টেনে নিয়ে এসে বলেন, তোর কি কোনওদিন বোধবুদ্ধি হবে না রূপা? কোথাকার একটা ফিরিঙ্গি সাহেবকে হাত ধরে টানছিস, পরপুরুষের গায়ে হাত দিতে নেই জানিস না? আর আমি কি অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলি কোনওদিন?

রূপা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, বা রে, তুমি যে বিহারীবাবুর সঙ্গে আবির খেলছ, তার বেলা? হরিসাহেব তো জ্যোতিদাদার বন্ধু, তিনিই নেমন্তন্ন করেছেন, তার হাত ধরলে কী হয়?

রূপার সাহস দেখে স্তম্ভিত কাদম্বরী বললেন, শোন রূপা, আমি কোনওদিন বিহারীলালবাবুর হাত ধরে কথা বলিনি, আমাদের বাড়ির মেয়েরা শিক্ষিত হলেও পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলে না, কারণ তাতে বাড়ির মর্যাদা নষ্ট হয়। আমি শুধু বিশেষ দু'-চারজনের সঙ্গেই কথা বলি যাঁরা সজ্জন, প্রতিভাবান এবং আমার স্বামীর বিশেষ বন্ধু। তোর এতবড় সাহস যে আমার সঙ্গে নিজের তুলনা করিস?

রূপা গোঁজ হয়ে বলে, কিন্তু, হরিসাহেব আমার বন্ধু। আসলে ওর নাম হ্যারি শেফার্ড। আমি ওই নামে ডাকি আর ওর সঙ্গে গল্প করতে আমার ভাল লাগে। কত অন্যরকম গল্প বলে। শুধু মেয়েমহলে আটকে থাকতে আমার ভাল লাগে না। থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়।

ওর সঙ্গে তোর আলাপ হল কী করে? রাগত স্বরে জানতে চান কাদম্বরী। রাগলে তাঁকে আরও সুন্দর দেখায়। কাদম্বরী বোঝেন, হরিসাহেব হাঁ করে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে, অন্যরাও দেখছে। রূপার ওপর আরও রাগ হয়।

রূপকুমারী বলে, আলাপ তো তোমাদের বিদ্বজ্জন সভায়। ওকে আমার ভাল লাগে। রাগ কোরো না, নতুন বোঠান, পায়ে পড়ি রাগ কোরো না।

দাঁড়া তোর ব্যবস্থা করছি, ক্রুদ্ধ কাদম্বরী রূপার হাত ধরতে যান, তাঁর মাধবীকঙ্কণ খুলে পড়ে মাটিতে। সেই ফাঁকে তাঁর হাতের নাগাল ছাড়িয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায় রূপা।

হ্যারি দূরের গাছতলায় গিয়ে বসেছে, রূপা তার পাশে বসে পড়ে বলে, ধুর, কিছু ভাল লাগে না আমার। সবাই সবসময় যেন আটকে রাখতে চায়। এটা করবে না, ওটা করবে না, ওখানে যাবে না, ওর সঙ্গে মিশবে না। আমার নিজের কি কোনও ইচ্ছে থাকতে নেই?

হ্যারি ওর কাঁধে হাত রেখে বলেন, তোমার অস্থিরতা আমি বুঝতে পারি। একসময় আমাদের দেশের মেয়েদেরও এরকম আটকে রাখা হত, কিন্তু এখন সব পালটে গেছে। এখন মহিলারা ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলন করতে রাস্তায় নেমেছে। ইউরোপের মেয়েরা অনেক লড়াই করে স্বাধীন হয়েছে।

কতটা স্বাধীন? রূপা জানতে চায়, ওরা একা একা জাহাজে চেপে বিদেশ যেতে পারে? যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে? আমার খুব ইচ্ছে করে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াই।

হ্যারি বললেন, আমাদের দেশে পুরুষরাও ইকোয়াল রাইটস নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবছে। মেয়েরাও খুব উৎসাহিত।

রূপা নিজের আবিরমাখা চুলের গুচ্ছ নিয়ে খেলা করতে করতে বলে, তোমাদের দেশের মেয়েরা এত লড়াকু, তা হলে কোনও মেয়ে বুঝি কিছু লেখেনি?

না না, মহিলারা না বললে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রয়োজনটা কোনওদিন খেয়াল করতামই না আমরা পুরুষেরা। রূপার জিজ্ঞাসু মুখের দিকে তাকিয়ে হ্যারি জানালেন, আরও একশো বছর আগেই মারি উলস্টোনক্রাফট নামে একজন মহিলা মেয়েদের অধিকার নিয়ে একটা সাংঘাতিক বই লিখেছিলেন, তিনিই প্রশ্ন তোলেন, পুরুষের মনোমতো পুতুল হয়ে মেয়েদের বেঁচে থাকতে হবে কেন? মেয়েরা সহযোগী হয়ে পুরুষকে ভালবাসবে কিন্তু তার শাসনদণ্ড মেনে নেবে কেন? এ-সব প্রশ্ন তুলে তাঁকে অবশ্য অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল তখন। এখন তাঁর বই মাথায় তুলে নিয়েছে স্যাফ্রোজিস্টরা।

কী, কী বললে? রূপা বুঝতে পারে না কথাটা। হ্যারি হেসে রূপার থুতনি নেড়ে দিয়ে বলেন, স্যাফ্রোজিস্ট মানে যে মেয়েরা ভোটাধিকারের লড়াই করছে রাস্তায় নেমে। বুঝেছ?

ইস, আমিও যদি ওদের সঙ্গে রাস্তায় নেমে লড়াই করতে পারতাম! রূপা বলে, স্বর্ণদিদিকে বলতে হবে এ-সব গল্প। স্বর্ণদিদি রাজি হলে আমরা দু'জনে মিলে স্যাফ্রোজিস্ট দলে নাম লেখাতে পারি।

আমার সঙ্গে যাবে? রূপার চোখে চোখ রেখে হঠাৎ গাঢ় স্বরে জানতে চান হ্যারি। চলো দূরে কোথাও চলে যাই, যেখানে কোনও বাধানিষেধ নেই, যাবে?

রূপা উত্তেজনায় হ্যারির হাত চেপে ধরে, যেতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে জানো! কিন্তু জানতে পারলে সবাই হাঁ হাঁ করে উঠবে। নতুনবউঠানকে না বলে আমি যেতে পারব না।

হ্যারি দুষ্টু হেসে বলেন, তা হলে আর তোমার স্বাধীন হওয়া হল না। এই বিরাট পৃথিবী তোমাকে ডাকছে। আর তুমি তুচ্ছ চৌকাঠে আটকে আছ।

না না, স্বাধীন আমাকে হতেই হবে। চৌকাঠে আটকে আমার জীবন কেটে যাবে তা হবে না। রূপার গলায় প্রত্যয় ফোটে।

তুমি পারবে না, হ্যারি হাসেন। রূপা রেগে ওঠে, কেন পারব না, বলো কী করতে হবে?

আমাকে চুম্বন করতে পারবে? হ্যারির ঠোঁটে রহস্যময় হাসি।

এই প্রস্তাবে রূপার সরলতা কেঁপে ওঠে, কিন্তু তার সঙ্গে স্বাধীনতার কী সম্পর্ক?

আমাদের দেশে ডেটিং না করলে কেউ প্রাপ্তবয়স্ক হয় না। হ্যারি বলেন, ডেটিংয়ের একটা প্রধান অংশ চুম্বন। তুমি যদি আমাকে চুম্বন না করো তা হলে তুমি আমাকে ভালবাসো কি না কী করে বুঝব? তোমাকে নিয়ে এ-বাড়ির উঠোন থেকে পালাতে হলে আগে এই চুম্বন পরীক্ষায় পাশ করতে হবে।

যাঃ, রূপা লজ্জায় ভোরের আকাশের মতো লাল হয়ে যায়। হ্যারি নিজের দু' হাতের মধ্যে রূপার মুখটি তুলে ধরে, দুটি ঠোঁট পরস্পরের দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকে। তখনই দূর থেকে কে যেন রূপার নাম ধরে ডেকে ওঠে, চকিতে হ্যারির স্পর্শ ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়ায় রূপা। চুম্বনটি অর্ধসমাপ্ত থেকে যায়।

সরলা গানের জন্য রূপাকে ডাকাডাকি করছিল। ওদিকে জ্যোতি ঠাকুর তখন গলা খুলে গান শুরু করেছেন, প্রতিভা, সরলা ইত্যাদি বালিকারাও রংখেলা ফেলে যোগ দিয়েছে গানের কোরাসে। গানবাজনার আসর জমাতে রঙে চুপচুপে গুণেন্দ্র তবল। বাজাতে বসে গেলেন।

স্বর্ণকুমারী যত-না রং খেলছেন তার চেয়ে বেশি দু'চোখ ভরে দেখছেন সব।

যেন সেকালের বসন্ত উৎসবের একটা টুকরো হঠাৎ খসে পড়েছে জোড়াসাঁকোর বাগানে। দেখতে দেখতেই তাঁর মাথায় আসে একটি গীতিনাট্যের পরিকল্পনা।

কিছুদিনের মধ্যেই 'বসন্ত উৎসব' গীতিনাট্যটি লিখেও ফেললেন স্বর্ণ। জ্যোতি খুব খুশি হয়ে বাড়ির ছেলেমেয়েদের নিয়ে অভিনয়ের তোড়জোড় শুরু করলেন। সংগীতের মহাহিল্লোলে মুখরিত হয়ে উঠল সারা বাড়ি। সবাইকে জড়ো করে কাজ করতে জ্যোতির জুড়ি নেই। রিহার্সাল চলছে আর সবার মনে মনে ভাসছে সুর। বালিকা সরলা সারাদিন গুনগুন করছে মায়ের লেখা গান, 'চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য মেঘান্ধ নিশীথ চেয়ে/দুর্ভেদ্য অন্ধকারে হৃদয় রয়েছে ছেয়ে'।

নাটকে গানটি গাইলেন অবশ্য কাদম্বরী। তাঁর বড় বড় চোখে, ঢলঢল খোলা চুলের রাশিতে এই শোকসংগীত যেন অপার্থিব সুরের মায়ায় ভাসিয়ে দিল সবাইকে।

রূপার গানের গলাটিও সুন্দর হয়েছে, তাকে কোরাসে গলা মেলানোর জন্য ডাক দিলেন জ্যোতি ঠাকুর। কিন্তু কাদম্বরী লক্ষ করেছেন, মহড়ায় ঘনিষ্ঠ দু'-এক জন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে হরিসাহেবও এসে বসে থাকেন। বাঙালিদের গানবাজনায় তাঁর খুব আগ্রহ। বাউলদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বাউল সংগীত শিখেছেন কিছু এখন আবার ঠাকুরবাড়ির গানে অন্যরকম মজা পাচ্ছেন। কিন্তু রূপার সঙ্গে ফুসফুস কথা বলা দেখলেই মাথা গরম হয়ে যায় কাদম্বরীর, কী করে যে সামলাবেন এই দস্যি মেয়েকে! একচুল এদিক ওদিক হলে তো বাড়ির মেয়েমহল তাঁকেই কথা শোনাবে। এমনকী বিলেত থেকেও জ্ঞানদানন্দিনী চিঠিপত্রে সব খোঁজখবর নেন, রূপার চালচলন সম্বন্ধে ওখান থেকেও তাঁর নজরদারি অব্যাহত।

রূপাকে নিয়ে স্বর্ণ একদিন এলেন অ্যানেট এক্রয়েডের কাছে। কিছুদিন হল কলকাতায় আছেন অ্যানেট, এখানকার মেয়েদের শিক্ষিত করতে তিনি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রেরণা মেরি কার্পেন্টার, যিনি এর আগে দু'-তিনবার ভারতে আসা-যাওয়া করে ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যে মেয়েদের স্কুল শুরু করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অ্যানেট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রায়ই বন্ধুস্থানীয় ব্রাহ্মদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন, এবারেও সবাইকে ডাক পাঠিয়েছেন।

ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশব সেনকে নিয়ে একটু সমস্যা হচ্ছে অ্যানেটের। সমস্যাটা শুরু হয়েছিল দু'বছর আগে, যখন নারীশিক্ষা নিয়ে অ্যানেট এক্রয়েডের সঙ্গে তর্ক বাধিয়েছিলেন কেশব। তখন উদারপন্থী ব্রাহ্মদের অনেকেরই ভুরু কুঁচকেছিল।

ইউরোপে থাকতেই ব্রাহ্ম মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে বন্ধুত্ব অ্যানেটের। মনোমোহন ও তাঁর স্ত্রী কিছুটা বিলিতি কেতায় অভ্যস্ত বলেই হয়তো বন্ধুত্বটা তাড়াতাড়িই গাঢ় হয়ে উঠেছে। নারীশিক্ষায় ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগের কথা লন্ডনে বসেই জেনেছিলেন অ্যানেট। সেখানে ব্রাহ্মনেতা কেশবের সঙ্গে আলাপ করে তাঁকে নারীস্বাধীনতার প্রবক্তা বলেই মনে হয়েছিল অ্যানেটের।

কিন্তু কলকাতায় এসে দেখলেন শিক্ষানীতির প্রশ্নে কেশবের সঙ্গে একমত হওয়া সম্ভব না। রক্ষণশীল কেশবের ধারণা, শিক্ষার নামে অঙ্ক ও বিজ্ঞান শিখিয়ে বাঙালিনিদের মেমসাহেব তৈরি করার চেষ্টা চলছে, তাদের এ-সবের কোনও প্রয়োজন নেই। মেয়েদের এমন কিছুই শেখানো উচিত নয় যাতে তারা ঘরকন্না ফেলে অন্যদিকে মন দেয়। মেয়েদের স্কুলে তিনি শুধু সাহিত্য ও কলাশাস্ত্র পাঠের ব্যবস্থা করেছেন।

অ্যানেট এক্রয়েড এটা একেবারেই মানতে পারেন না। তিনি মনোমোহন ঘোষের বাড়িতে একটি সভা ডেকেছেন। তিনি সভার কাছে প্রথমেই জানতে চান, আপনারা কি সত্যি ফিমেল এডুকেশন চান, তা হলে কেশববাবুর অন্যায়ের প্রতিবাদ করুন।

শিবনাথ শাস্ত্রী সেখানে উপস্থিত, তাঁর মতে কেশবচন্দ্র রক্ষণশীল হয়ে পড়েছেন। এখন মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার সময়। ইউরোপের মহিলারা যা পারে আমাদের মেয়েরাও পারবে।

মনোমোহন ঘোষ, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি প্রমুখ কয়েকজন উদার বাঙালি ভদ্রলোকও বিজ্ঞান শেখানোর ব্যাপারে মিস এক্রয়েডের সঙ্গে একমত হলেন।

ঠাকুরবাড়ির স্বর্ণকুমারীকে তিনি ডেকে এনেছেন এই সভায়। অ্যানেট তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন, শুধু পুরুষেরাই সবকিছু ঠিক করে দেবে তা হতে পারে না। তুমি বলো, তোমার কী মত?

এর আগেও বেশ কয়েকবার অ্যানেটের আমন্ত্রণে এসেছেন স্বর্ণ, সে

অবশ্য সাহিত্যবাসরে। মাঝে মাঝেই মেয়েদের নিয়ে আসর বসান অ্যানেট। মনোমোহনের বাড়িতেই আসর বসে কারণ অ্যানেট সেখানেই আতিথ্য নিয়েছেন। এ ব্যাপারে গৃহিণীও তাঁকে খুব সাহায্য করেন।

অ্যানেটের প্রশ্নে স্বর্ণ বললেন, আমরা ছেলেবেলা থেকেই বাবামশায়ের কাছে বিজ্ঞানের পাঠ নিয়েছি। বাড়ি থাকলে তিনি মাঝে মাঝেই ছেলেমেয়েদের আকাশের নক্ষত্র চেনান, বিজ্ঞানের পাঠ দেন। সেজন্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান দুটি দিকেই আমার অন্তরের টান। আমার মতে মেয়েদের অবশ্যই গণিত ও বিজ্ঞানের পাঠ দেওয়া উচিত। বিজ্ঞানমনস্কতা না এলে মেয়েদের মনের কুসংস্কার কাটবে না।

অ্যানেট স্বর্ণকে জড়িয়ে ধরেন। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, কেশববাবুর এসে দেখে যাওয়া উচিত বাঙালি মেয়েরা কী বলছে!

আমন্ত্রিতদের মধ্যে হ্যারি শেফার্ডও বসে ছিলেন, অ্যানেটের নানা কাজের সঙ্গী তিনি। রূপকুমারী তাঁর পাশে বসেছে দেখে অনেকেই ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছেন। স্বর্ণ সেটা লক্ষ করে রূপাকে ডেকে বললেন, আমার পাশে এসে বোস না রূপা।

হ্যারি হঠাৎ বলে ওঠেন, আপনারা বাঙালি মেয়েদের এডুকেশন দিতে চান, বিজ্ঞান পড়াতে চান, অথচ পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে দেন না, এটা কীরকম?

উপস্থিত সকলেই একটু বিব্রত হলেন। বিরক্তও। শিবনাথ বললেন, আমরা মেয়েদের বাঙালিয়ানা বজায় রেখেই পশ্চিমি শিক্ষা দিতে চাই, বাইরের অনাত্মীয় পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা না করলেও শিক্ষিত হওয়া যায় হ্যারি।

কিন্তু নারীপুরুষ মেলামেশা না করলে মনের প্রসারতা বাড়বে কী করে? অ্যানেট হ্যারিকে সমর্থন করেন, আমাদের দেশের মেয়েরা স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করে বলেই সমকক্ষতার দাবি করতে পারছে। স্বর্ণ, তুমি এত প্রগতিশীল হয়েও এখনও যে বাইরে বেরোলে ভেইল ব্যবহার করো এটার কী প্রয়োজন?

স্বর্ণকুমারী শাড়ির সঙ্গে একটা আলাদা কাপড়ের ঘোমটা লাগিয়েছেন মাথায়, তার ওপর একটা ছোট্ট টুপি। তিনি এই প্রশ্নে বিরক্ত হন, এ আমাদের দেশাচার অ্যানেট, ঘোমটা পরা-না-পরার সঙ্গে প্রগতির কোনও সম্পর্ক নেই। আর আমাদের মেয়েরা অনেক যুগের পর বাইরে বেরচ্ছে, তাদের একটু

বেচাল দেখলে লোকে ছি ছি করে, পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রে একটু সাবধানে চলাই ভাল।

হ্যারির রাগ হয় রূপাকে তার পাশ থেকে উঠিয়ে নেওয়া হল বলে। বলেন, ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা খুব অগ্রসর, অথচ আমি শুনেছি তাঁরা বাইরের পুরুষদের সঙ্গে কথা বলেন না। তার মানে তো এখনও তাঁরা পরদাপ্রথা বাঁচিয়ে রাখছেন। কেন আমরা পুরুষেরা কি খুব খারাপ লোক?

রাগে স্বর্ণর ফরসা গালদুটি লাল হয়ে ওঠে। অগ্নিদৃষ্টিতে রূপার দিকে তাকান তিনি। তারপর বলেন, আমি মনে করি বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে নয়, আমাদের স্ত্রীস্বাধীনতা আসবে সম্মতির পথে। হঠাৎ করে ঘোমটা খুলে সমাজকে আঘাত দিলেই স্ত্রীস্বাধীনতা স্বর্গ থেকে খসে পড়বে না।

এ-সব আলোচনার মধ্য দিয়েই সেদিনের সভায় বিক্ষুব্ধ ব্রাহ্মরা অ্যানেট এক্রয়েডের উদ্যোগে নতুন মহিলা বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁদের উদ্যোগেই তৈরি হল হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়, যেখানে পরিণত মেয়েদের কলা ও বিজ্ঞান শেখানো শুরু হল। অ্যানেট অনেকদিন পর্যন্ত এই স্কুলের দায়িত্বে ছিলেন। অ্যানেটের বিয়ের পর নানা কারণে এই স্কুলটি বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় নামে কিছুদিন চলার পর বেথুন কলেজের সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু কেশবের সঙ্গে তখন থেকেই প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের দূরত্ব তৈরি হয়ে গেল।

ব্রাহ্মসমাজের ভেতরে আর-একটি বিষয় নিয়েও গোলমাল বেধে গেছে, আর তার মূলেও আছেন কেশবচন্দ্র। ব্রাহ্মরাই অনেকদিন মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়ানোর আন্দোলন করে ব্রিটিশরাজকে দিয়ে আইন চালু করালেন। কিন্তু তাঁদের নেতা কেশব সেনের চোদ্দো বছরের কিশোরী কন্যা সুনীতি কোচবিহারের মহারাজা দীপেন্দ্রনারায়ণের প্রেমে পড়লেন। কেশব সেই বিয়েতে সম্মতি দিতেই ব্রাহ্মসমাজে শোরগোল শুরু হল। ব্রাহ্ম তরুণদের চোখে কেশবের ভাবমূর্তি ছোট হয়ে গেল, তাঁর কাছে এরকম ভণ্ডামি তারা আশা করেনি।

কেশবের যুক্তি হল ওরা এখন শুধু বিয়েটাই করবে, একসঙ্গে বসবাস করবে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর। দীপেন্দ্রনারায়ণ বিয়ের পরপরই দীর্ঘদিনের জন্য বিদেশ ভ্রমণে যাবেন, আর সুনীতি থাকবেন বাপের বাড়িতে। কিন্তু এই যুক্তিতে বিদ্রোহ আটকানো গেল না। কেশব মেয়ের সাধাসাধিতে

নাবালিকা বয়সে সুনীতির বিয়ে দিলেন, আর ব্রাহ্মসমাজ ভেঙে দু' টুকরো হয়ে গেল।

এই বিয়ে নিয়ে ঠাকুরবাড়ির মেয়েরাও উত্তেজিত। কেশব সেনের পরিবারের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ বহুদিনের। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় কেশবের বাবা তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন। উচ্চবর্ণের হিন্দু যুবকদের কেউ কেউ ব্রাহ্ম হয়ে যাচ্ছিলেন বলে সেইসময় হিন্দুসমাজে অশান্তি ছিলই। কেশব ঠিক করলেন গৃহত্যাগ করবেন। মহর্ষি দেবেন ঠাকুর তাঁর আদর্শ, তিনিই হয়ে উঠলেন আক্ষরিক অর্থে তাঁর আশ্রয়দাতা। কেশব সস্ত্রীক ঠাকুরবাড়িতে আশ্রয় নিলেন কিছুদিনের জন্য। জ্যোতি, রবি, স্বর্ণকুমারীরা তখন বালক বালিকা, কেশবের চেয়েও তাঁদের বেশি ভাব হল তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। একসঙ্গে বসবাসের পাট মিটে গেলেও তাঁদের যোগাযোগটা থেকে গিয়েছে। এমনকী দেবেনের সঙ্গে কেশবের মনোমালিন্য ও বিচ্ছেদের পরেও পারস্পরিক আগ্রহটা কমেনি।

তেতলার ঘরে কাদম্বরীকে স্বর্ণ বলছিলেন, সুনীতির বিয়ে নিয়ে কী হইচই না হচ্ছে বউঠান, কেশবদাদার ওপর সবাই রেগে যাচ্ছেন সুনীতির জন্য।

কাদম্বরী তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বিছানায় বসে কালো ভেলভেটের ওপর জরির নকশা তুলছিলেন, ছুঁচে সুতো পরাতে পরাতে চোখ তুলে বললেন, যাই বলো ঠাকুরঝি, সুনীতির সাহস আছে। বাবার পছন্দের পাত্রকে বাতিল করে নিজে প্রেম করল রাজকুমারের সঙ্গে! আবার বাবাকে দিয়ে সেই সম্পর্ক মানিয়েও নিল।

স্বর্ণ বলেন, শুধু মানিয়ে? মেয়ের আবদার মানতে গিয়ে বাবা এমন নাকানি চোবানি খাচ্ছেন নিজের বন্ধুবান্ধবদের কাছে, ভাবা যায়! কোনও বাঙালি মেয়ের ভাগ্যে এমন পিতৃস্নেহ আগে কখনও জোটেনি। নিজের পছন্দে বিয়ে করার মজাটা আমরা পাইনি, সুনীতি করে দেখাল।

আমিও করব, নিজের পছন্দমতো বিয়ে, হঠাৎ পাশ থেকে বলে ওঠে রূপা। সে কখন এসে বসেছে ওঁদের পেছনে লক্ষ করেননি স্বর্ণ বা কাদম্বরী। রূপার কথা শুনে চমকে উঠে কাদম্বরী তাকে ধমক দেন, তুই বেশি পাকা হয়ে গেছিস না রূপা!

বা রে, রূপা অভিমান করে ঠোঁট ফোলায়, এই তো তোমরা কেমন সুনীতির প্রেমের বিয়ের তারিফ করছিলে, আমি করলেই দোষ?

তোর কি অমন স্নেহশীল বাবা আছে? কাদম্বরী বললেন, তুই কিছু বেফাঁস

কাজ করলে সবাই আমাকেই দুষবে। তোর জন্য এত কথা শুনতে হয়, আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি। রূপা, তুই কি আমাকে আরও বিপদে ফেলবি?

রূপা কাদম্বরীর কোলে মুখ গুঁজে বলতে থাকে, আমার এ-সব থোড় বড়ি খাড়া জীবন ভাল লাগে না নতুনবউঠান। আমি মুক্তি চাই, বিরাট পৃথিবীতে আমি পাখির মতো উড়ে বেড়াতে চাই।

স্বর্ণ এবার বিরক্ত হয়ে বলেন, সে তো সবাই চায় রূপা। অমন স্বপ্ন সবাই দেখে, তাই বলে বাস্তবে সেটা করা যায় না। বাচ্চাদের মতো কথা বলছিস, আর কবে তোর বুদ্ধি হবে?

রূপা বলে, চাইলে স্বপ্নকে সফল করা যায়, তোমরা তেমন করে চাও না তাই। চলো না আমরা তিনজনে পাহাড় সমুদ্র দেখতে বেরিয়ে পড়ি, শুধু আমরা তিনজন, আর কেউ না।

কাদম্বরী হাসতে থাকেন। রূপা তাঁর সেলাই ধরে টানে, কার জন্য সেলাই করছ? জ্যোতিদাদার জন্য আর কত নকশা তুলবে? যত সুন্দর সুন্দর জামা জুতো করে দেবে তত তাঁকে দেখে পাগল হবে স্টেজের নটীরা। তখন তো তুমি কাঁদতে বসবে!

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় পরিবেশ। কাদম্বরীর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে স্বর্ণ রূপাকে ধমক লাগান, নতুনবউঠানের প্রশ্রয়ে তুই যা নয় তাই বলছিস রূপা, দেখ তাঁকেই আঘাত দিয়ে বসেছিস! তোর কি কোনওদিন আক্কেল হবে না?

কাদম্বরী হাত তুলে থামতে বলেন স্বর্ণকে, ও তো ভুল কিছু বলেনি ঠাকুরঝি। যে-কথা তোমরা উচ্চারণ করো না, ও বোকা বলে সেটাই বলে ফেলেছে। সত্যিই আজকাল আমি কান্নাকাটি করি, তোমার নতুনদাকে ঘিরে এখন অনেক অপ্সরী কিন্নরীর মেলা। তবে এটা তাঁর জন্য নয়। রবির জন্য একটা নকশাতোলা জুতো সেলাই করছি, দূরে চলে গেছে বলে তার কথা বড্ড মনে পড়ে।

স্বর্ণ বলেন, এটা তুমি নতুনদার ওপর অন্যায় রাগ করছ নতুনবউঠান। তিনি রূপবান গুণবান পুরুষ, অভিজাত রমণীরাই তাঁকে দেখে মুগ্ধ হন তো পাঁচপেঁচি বারাঙ্গনা নটীরা তো পাগল হবেই। তাতে নতুনদার কী দোষ হল। তিনি কি নাটক করানো বন্ধ করে দেবেন?

তা কেন? কাদম্বরী বলেন, নাটক করাতে হলে বারাঙ্গনাদের দিয়েই

অভিনয় করাতে হবে এমন তো কোনও কথা নেই? তাদের বাদ দিয়ে এতদিন নাটক হয়েছে, এখন কেন হবে না।

এ তো তুমি রক্ষণশীল দলের মতো কথা বলছ বউঠান। স্বর্ণ বললেন, মাইকেল মধুসূদন দত্তের উৎসাহে বেঙ্গল থিয়েটারে যখন প্রথম 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে মহিলাদের অভিনয় শুরু হল, লোকে রে রে করে উঠেছিল। এমনকী বেঙ্গল থিয়েটারের অন্যতম উদ্যোক্তা বিদ্যাসাগরও মেয়েদের স্টেজে টেনে আনা মানতে পারলেন না, প্রতিবাদে সরে গেলেন। এখনও এ নিয়ে তর্ক চলছে। কিন্তু মেয়েদের অভিনয়ও চলছে। তারা তো অ্যাকটিং করতে পারে সেটা প্রমাণ করেছে, তবে সেটা খারাপ বলব কোন যুক্তিতে?

কাদম্বরী মানেন না. তিনি বললেন, খারাপ এজন্য যে মহিলা দিয়ে অভিনয় করাতে হলে খারাপ মেয়েদের আনতে হচ্ছে, তাতে আমাদের পুরুষদের চরিত্র নষ্ট হচ্ছে। এটা কি ভেবে দেখার দরকার নেই স্বর্ণ ঠাকুরঝি?

বা রে, স্বর্ণ বলেন, তোমার ঘরের লোকটি নষ্ট হয়ে যাবে বলে তুমি ভয় পাচ্ছ, আর সেজন্য ওই পতিতা মেয়েগুলোর উদ্ধারের এমন সুযোগ নষ্ট হবে? নাটকের মধ্যেই তো ওদের মুক্তির সম্ভাবনা। আমরা যখন বাড়িতে নাটক করি, তাতেও তো চরিত্র নষ্ট হতে পারে, সেটা তো ভাবছ না?

তোমার সঙ্গে তর্ক করে জিততে পারব না, কিন্তু আমার ভয় করে, ভাল লাগে না, সেটাও কি তোমার কাছে বলতে পারব না ঠাকুরঝি? স্বর্ণর কাছে সমর্থন না পেয়ে কাদম্বরী ভেঙে পড়েন একটু।

স্বর্ণ কথা ঘোরাতে চান, যখন মেজদাদার কাছে ছিলাম, বোম্বাইতে হ্যামলেট ও ওথেলোর মারাঠি অভিনয় দেখে খুব ভাল লাগেছিল, বেশ দেশজ ছাপ, ওথেলোর মারাঠি চেহারার সঙ্গে ডেসডিমোনার নাকে নথও বেশ মানিয়ে গেছিল, কিন্তু মেয়েদের পার্ট করেছিল পুরুষরাই। ওদের মেয়েরা আমাদের থেকে অনেক বিষয়ে এগিয়ে, কিন্তু এ ব্যাপারে বঙ্গরঙ্গমঞ্চ যে ওদের টেক্কা দিচ্ছে এটা ভাবতেই ভাল লাগে।

যাক গে, কাদম্বরী গুছিয়ে বসে বলেন. নতুন কী লিখেছ এবার শোনাও দেখি ঠাকুরঝি। রূপাও তার গায়ে গা এলিয়ে জমিয়ে গল্প শুনতে বসল। মেয়েদের ছোট ছোট সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার অনুরণনে ভরপুর হয়ে উঠল অন্দরের এই সাহিত্যবাসর।

১২

জ্ঞানদানন্দিনীর বিলেতবাস

ব্রাইটনে প্রথম খ্রিসমাসের সন্ধ্যাটা বেশ আনন্দে কাটল জ্ঞানদার। অনেকদিন বাড়িছাড়া। কাছের লোকেরা কেউ নেই। তবু দীর্ঘ রোগভোগ ও সন্তানশোকের কালো দিনগুলো পেরিয়ে অনেকদিন পর ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে হাসলেন জ্ঞানদা। যাঁর চিকিৎসায় সেরে উঠলেন সেই ডক্টর জোসেফ লিস্টারকে কৃতজ্ঞতা জানাতেই নিজের ভাড়াবাড়িতে ছোট্ট পার্টি ডেকেছেন তিনি। অতিথিদের মধ্যে আর আছেন পাশের বাড়ির মিসেস ডনকিনস, বিলেতবাসী জ্ঞানেন্দ্র ঠাকুর ও তাঁর মেয়েরা। বিলেতের প্রবাস জীবনে এঁরা কয়েকজনই তাঁর কাছের মানুষ।

সমুদ্রতীরে নিরালা একটি জায়গায় সার সার কতগুলো বাড়ির নাম মেদিনা ভিলা, তারই একটিতে বাচ্চাদের নিয়ে সংসার পেতেছেন জ্ঞানদানন্দিনী। ভিলা অবশ্য নামেই, ছোট ছোট বাড়ি, সামনের বাগানে দু'-চারটি গাছগাছালি। দেশের তুলনায় ঘরগুলো ছোট ছোট, ছাদ নিচু, চারদিকে জানলা বন্ধ করে রাখা শীতের ভয়ে। একটু বাতাস আসার ফাঁক নেই, শুধু জানলাগুলো কাচের বলে আলো আসতে বাধা নেই। নিজস্ব গৃহিণীপনায় ছোট ছোট ঘরগুলোকেই চমৎকার বিলিতি কায়দায় সাজিয়ে নিয়েছেন জ্ঞানদা।

তবে এ-সব সাজানো-গোছানো তো বাইরের ঠাঁট বজায় রাখার জন্য। মন ভাল রাখতেও এ-সব নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন জ্ঞানদা। কিন্তু আসলে তিনি মোটেই ভাল নেই। তিনটি শিশুকে নিয়ে বিদেশ বিভুঁইয়ে একা বসবাস করতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন। উপরন্তু তিনি এখন অন্তঃসত্ত্বা। জ্ঞানদার মাঝে মাঝে রাগ হয় সত্যেনের ওপর, এরকমভাবে কেউ নির্বাসনে পাঠায়? মাঝে মাঝে তাঁর কান্না পায়, কেন যে সত্যেনের কথা শুনে এখানে চলে এলেন!

সত্যেন ভাবুক মানুষ, সংসার সম্বন্ধে তাঁর কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। বউ যে এখানে অথই জলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, সে বোধটাও তাঁর নেই।

ভরসা বলতে রামা চাকর আর দু'-একজন প্রতিবেশিনী মেমসাহেব। ব্রাইটনে আসার আগে আরও দু'-চারবার বাড়ি বদল করতে হয়েছে তাঁকে। জাহাজ থেকে নেমে প্রথমে উঠেছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ত্যাজ্যছেলে জ্ঞানেন্দ্রর বাড়িতে। জ্ঞানেন্দ্র খ্রিস্টান হয়ে রেভারেন্ড কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়েকে বিয়ে করে বাপের বিরাগভাজন হয়েছেন। সেই থেকে বিলেতেই বাসা বেঁধেছেন সপরিবারে। জাহাজ থেকে বাচ্চাকাচ্চাসহ জ্ঞানদাকে একা নামতে দেখে তিনিও চমকে উঠে ভেবেছিলেন, এটা সত্যেন কী করল!

জ্ঞানেন্দ্র কিছুদিন পর অন্য বাড়ি ভাড়া করে জ্ঞানদার থাকার ব্যবস্থা করলেন। জ্ঞানেন্দ্রর দুই তরুণী মেয়ে সতু আর বালা মাঝে মাঝেই জ্ঞানদার কাছে চলে আসেন, ওঁকে নিয়ে পাড়া বেড়াতে বেরোন। জ্ঞানদাও ওঁদের আসার পথ চেয়ে বসে থাকেন।

বিলেতের ভাড়া বাড়িতে বাড়িওলির সঙ্গে খাবার জোগানের চুক্তি থাকে বলে জ্ঞানদাকে রান্নাবান্নার ঝামেলায় যেতে হয়নি। কিন্তু ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা অসুখ-বিসুখ সামলাতেই এসে অবধি নাজেহাল হয়ে পড়ছেন তিনি। তার ওপর কিছুদিনের মধ্যেই তীব্র শীত এসে পড়ল।

জানলা দিয়ে প্রথম বরফ পড়া দেখে জ্ঞানদা দারুণ উত্তেজিত। সব লোকজন রাস্তায় নেমে পড়ে বরফ গায়ে মাখছে। আনন্দে তিনিও ছুটে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন, গায়ে তখন শুধু একটা পাতলা সিল্কের শাড়ি। বাড়িওলি বারণ করলেও না শুনে তিনি আনন্দে বরফ কুড়োতে লাগলেন। তারপর রাত থেকে ধুম জ্বর, গা ব্যথা। ক্রমশ জ্বর বাড়তে লাগল আর হাত ফুলে লাল হয়ে গেল। রামা চাকর ডাক্তার ডেকে আনলেও খুব একটা উন্নতি হল না। হাতে ঘা হয়ে বিছানায় শুয়ে কাতরাতে লাগলেন জ্ঞানদা।

বাচ্চাদের কান্না শুনে একদিন পাশের বাড়ির মিস ডনকিনস দেখতে এলেন। জ্ঞানদার বিপন্ন দশা দেখে অবাক ডনকিনস জিজ্ঞেস করেন, তুমি একা একা বাচ্চাদের নিয়ে এদেশে এলে কেন?

জ্ঞানদা কাতরস্বরে বলেন, আমার স্বামী আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন বিলিতি আদবকায়দা শেখার জন্য। বাচ্চাদের এখানকার স্কুলে পড়াতে চাই আমরা।

তাই বলে এভাবে একা একা অচেনা দেশে বাস করা যায়? তুমি তো ভাল

করে ইংলিশ বলতেও পারছ না! গরমজামা না পরে কীভাবে বরফের মধ্যে নেমে গেলে? পুয়োর লেডি!

ডনকিনসের মায়া হয় এই ভারতীয় মহিলার জন্য। যে নিজেকে বাঁচাতে জানে না, সে বাচ্চাদের বাঁচাবে কী করে? তিনি হাল ধরতে এগিয়ে না এলে সে-যাত্রা জ্ঞানদা বাঁচতেন কি না সন্দেহ। ড. জোসেফ লিস্টার নামে এক মেধাবী চিকিৎসককে ডেকে আনলেন ডনকিনস, যিনি তখন অ্যান্টিসেপটিক আবিষ্কারের জন্য বিলেতে খুব সমাদৃত।

লিস্টার এসে জ্ঞানদার অবস্থা দেখে আঁতকে উঠলেন। ফ্রস্টবাইট থেকে ঘা হয়ে সেপটিকের দিকে যাচ্ছে। প্রবল জ্বর, রোগিণী প্রলাপ বকছে। ঘটনাচক্রে লিস্টার ইতিমধ্যে ফেনল অর্থাৎ কার্বলিক অ্যাসিডের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন বিশল্যকরণী অ্যান্টিসেপটিক। জ্ঞানদাকে পেয়ে নিজের ওষুধগুলি পরীক্ষানিরীক্ষার আরও একটা সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি মন দিয়ে জ্ঞানদার শরীরের ঘা খুঁটিয়ে দেখেন।

পরপুরুষের প্রথম স্পর্শে জ্ঞানদা কিন্তু ঘোরের মধ্যেও শিউরে ওঠেন। হলই বা ডাক্তার, পুরুষ তো বটে। সুদর্শন মাঝবয়সি এই ডাক্তারকে জ্ঞানদার বেশ পছন্দও হয়। ঠাকুরবাড়িতে নেহাত বিপর্যয় না হলে মেয়ে-বউদের জন্য সাহেব ডাক্তার ডাকা হয় না, জ্ঞানদার সেই অভিজ্ঞতা নেই। তবে লিস্টারের চিকিৎসায় কাজ হল, অল্প অল্প করে সেরে উঠতে লাগলেন জ্ঞানদা। এরকম গভীর অসুখের সময় সত্যেন পাশে নেই, আপনজন কেউ নেই। একটা চিঠি লিখলে একমাস পরে পৌঁছয়। জ্ঞানদার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে।

লিস্টার জানতে চান, ব্রেভ লেডি, তুমি কাঁদছ কেন? তুমি যেরকম একা একা এখানে এসে ছেলেমেয়েদের নিয়ে সংসার করছ, আমি কোনও ইংরেজ মহিলার মধ্যেও এমন দুঃসাহস দেখিনি। তুমি সেরে উঠবে।

জ্ঞানদার মনে হয় লিস্টার যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা দেবদূত। যা কখনও ভাবেননি এমন কাণ্ড করে বসেন তিনি, লিস্টারের হাত চেপে ধরে বলেন, সেভ মি, ইউ আর মাই এঞ্জেল!

ওহ নো! লিস্টার হেসে বলেন, আই অ্যাম আ ডক্টর। ইউ থ্যাঙ্ক মিসেস ডনকিনস ফর ব্রিঙ্গিং মি হিয়ার।

জ্ঞানদা মিসেস ডনকিনসের দিকে তাকিয়ে বলেন, উনি না থাকলে তো আমি বিদেশ বিভুঁইয়ে কবে মরে যেতাম।

ডনকিনস জ্ঞানদার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, নো গানাদা, তুমি কখনও মৃত্যুর কথা বলবে না। ব্রাইটনে এসে একজন ইন্ডিয়ান লেডি বিনা চিকিৎসায় মরে গেলে আমাদের লজ্জায় মুখ ঢাকতে হবে। আমরা ইংরেজ মেয়েরা পরস্পরকে সাহায্য করেই বেঁচে থাকি। ইউ আর লাকি যে ডক্টর লিস্টার এসে গেছেন।

জ্ঞানদা বিড়বিড় করে বলেন, এঞ্জেল! এঞ্জেল! প্লিজ সেভ মি।

লিস্টার বললেন, মিসেস টেগোর, তোমার ফ্রস্টবাইট ইনফেকটেড হয়ে গেছে, তাই অন্য ডক্টর সারাতে পারেননি। আর আমি এতদিন ধরে গবেষণা করছি কী করে উন্ড ডিস-ইনফেকটেড করা যায় তাই নিয়েই। ফলে আমি যে ওষুধ দেব, অন্য ডক্টর তা দিতে পারতেন না। ইউ আর রিয়েলি লাকি।

ডনকিনস বলেন, ডক্টর, তুমি যে ওর ওপর এক্সপেরিমেন্ট করছ নিজের ইচ্ছেমতো, এইসব ড্রাগ তো এখনও অ্যাপ্রুভড নয়, কোনও ইংরেজ মহিলার ওপর এই এক্সপেরিমেন্ট করার পারমিশন সহজে পাবে না। এতে কোনও রিস্ক নেই তো!

লিস্টার চটে যান, তোমাদের যদি আমার ওপর ট্রাস্ট না থাকে, আমি চলে যাচ্ছি। তোমার কোনও ধারণা নেই আমি রোজ এই পদ্ধতিতে কত রোগীর চিকিৎসা করি। অ্যান্টিসেপটিক নিয়ে আমার আবিষ্কার অ্যাপ্রুভড তো বটেই, অলরেডি মাচ ডিসকাসড। উন্ড-ড্রেসিংয়ে কার্বলিক অ্যাসিড ব্যবহার করে আমি অ্যামপুটেশন পেশেন্টদের ডেথরেট কত কমিয়ে দিয়েছি তুমি জানো? জানো আমার নামে এ বছরের যুগান্তকারী একটি আবিষ্কার লিস্টারিন মাউথওয়াশের নাম রাখা হয়েছে? আমার নামে একটি ব্যাকটেরিয়ার নাম রাখা হয়েছে লিস্টারিয়া? তোমার ট্রাস্ট না থাকে, রুটিন ড্রাগ লিখে দিচ্ছি, দেখো মিসেস টেগোরকে বাঁচাতে পারো কি না। কিন্তু ইউ হ্যাভ নো রাইট টু ইনসাল্ট মি। আমি চললাম।

লিস্টারকে রাগ করতে দেখে জ্ঞানদা ভয় পেয়ে যান, দুর্বল শরীরে উঠে বসে লিস্টারের হাত আঁকড়ে ধরেন, ডোন্ট লিভ মি এঞ্জেল! তুমি চলে গেলে আমি আর বাঁচব না। দেখো এই দুর্বল বিদেশিনিকে ফেলে তুমি চলে যাবে? তুমি যে ওষুধ দেবে, তাই খাব। যা বলবে করব। প্লিজ ডোন্ট ডেসার্ট মি।

ডনকিনসও তাড়াতাড়ি বলেন, আমি তা বলিনি ডক্টর, প্লিজ ডোন্ট মিসানডারস্ট্যান্ড মি। আমি ভয় পাচ্ছি গানাডার কিছু হলে ওর বাড়ির লোকেরা আমাকে দুষবে। বাট আই ট্রাস্ট ইউ সেজন্যেই তো ডেকে এনেছি।

লিস্টার কিছুটা নরম হন। এদিকে তাঁর ইন্ডিয়ান পেশেন্ট বিছানায় শুয়ে পড়েছেন আবার, হঠাৎ উত্তেজনার ধকল সামলাতে চেষ্টা করছেন আর বিড়বিড় করে বলছেন, ডোন্ট লিভ মি, প্লিজ ডোন্ট লিভ মি এঞ্জেল।

বিছানায় মিশে থাকা শীর্ণ বিদেশিনির ইথারিয়াল সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে লিস্টারের মায়া হয়, যেন কোন অচিনপুরের রাজকন্যা রুপোর কাঠির ছোঁয়ায় জাগিয়ে তোলার জন্য ডাক পাঠাচ্ছে তাঁকে। লিস্টার আলতো করে জ্ঞানদার গালে টোকা দিয়ে বলেন, মাই ইন্ডিয়ান প্রিন্সেস, আমি তোমাকে সারিয়ে না তুলে কোথাও যাব না। রোজ সকালে এসে তোমাকে দেখে যাব আমি।

লিস্টারের আঙুলগুলি নিজের গালে চেপে ধরে পরম নিশ্চিন্তে চোখ বোজেন জ্ঞানদা, তাঁর চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে।

সত্যেনের কাছে জ্ঞানদার অসুখের খবর জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন জ্ঞানেন্দ্রর মেয়েরা। সত্যেনের এরকম হঠকারিতার ফল ভুগতে হচ্ছে বেচারি জ্ঞানদাকে, সকলেই এজন্য সত্যেনের ওপর বিরক্ত।

মিসেস ডনকিনসের এ ব্যাপারে প্রখর মতামত। তিনি বলেন, গানাডা, কিছু মনে কোরো না, পুরুষরা এমনিতেই দায়িত্বজ্ঞানহীন। আর তোমার স্বামীটি তো দেখছি ইরেসপন্সিবলের চূড়ামণি।

জ্ঞানদার স্বামীর ওপর প্রবল অভিমান, তবু মিসেস ডনকিনসের মুখে পতিনিন্দা তাঁর ভাল লাগে না। তাড়াতাড়ি বলেন, না না মিসেস ডনকিনস, তিনি খুব কেয়ারিং। আমাকে স্বাবলম্বী করার জন্যই একা একা পাঠিয়ে দিয়েছেন, এজন্য আমাদের কত বিরোধিতা সহ্য করতে হয়েছে জানো!

তা হোক, ডনকিনস বলেন, তুমি জানো না গানাডা, পুরুষেরা বউকে টেকেন ফর গ্রান্টেড ধরে নেয়, মানুষ বলে মনে করে না। তুমি জানো, আমাদের ফেমিনিস্ট মেয়েরা ১৮৪০ সাল থেকে ভোটাধিকারের জন্য লড়াই করছে, এখনও পর্যন্ত আমরা সেই দাবি আদায় করতে পারিনি। দেশটা কি শুধু ছেলেরা চালায়? আমরা মুখের কাছে খাবার জোগান না দিলে, সাজিয়ে গুছিয়ে অফিসে না পাঠালে, হোম ম্যানেজমেন্ট না করলে ওরা সব অচল হয়ে যাবে। তবু ওরা আমাদের নাগরিক অধিকার দেবে না?

জ্ঞানদা বলেন, আমাদের দেশে তো ছেলেরাও ভোট দেয় না, ইংরেজ শাসকদের বেছে নেওয়ার কোনও সুযোগ দেওয়া হয় না আমাদের। তোমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক তাই এ-সব ভাবতে পারছ।

তোমাকেও ভাবতে হবে গানাডা, ডনকিনস উত্তেজিত হন, অনেকরকম পলিটিক্স আছে, তার মধ্যে ওল্ডেস্ট পলিটিক্স হল নারী-পুরুষে। বছর দুয়েক আগে জন স্টুয়ার্ট মিলের 'দি সাবজেকশন অফ উইমেন' বইটা বেরিয়ে আমাদের দেশে তো হুলুস্থুলু পড়ে গেছে। মেয়েদের কথায় ওরা কান দেয়নি কিন্তু এখন মেয়েদের পক্ষ নিয়ে একজন পুরুষ এরকম ধারালো যুক্তি দেওয়ায় পুরুষেরা খুব বেকায়দায় পড়ে গেছে আর মেয়েরা উজ্জীবিত। আমি তোমাকে পড়তে দেব।

আমি পড়ে কী করব? জ্ঞানদা বলেন, আমার স্বামী সকলের বিরোধিতা সত্ত্বেও আমার মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রকাশ দেখতে চান, সেটা যে আমাদের সমাজে কত কঠিন কাজ তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমাদের মধ্যে নারী-পুরুষে কোনও পলিটিক্স নেই।

ডনকিনস বিরক্ত হন, তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না গানাডা, এটা তোমার বা আমার একার স্বাধীনতার বিষয় না, একসঙ্গে সব মেয়েরা যেদিন রাষ্ট্রে ভোটাধিকার পাবে, পরিবারে পূর্ণ মানুষের মর্যাদা পাবে, পুরুষের সমকক্ষ হবে, সেদিন বলা যাবে স্ত্রীস্বাধীনতা এসেছে। তোমরা যখন স্ত্রীস্বাধীনতা নিয়ে লড়াই করছ, মিলের লেখা তোমাকে অবশ্যই পড়তে হবে আর তোমার স্বামীকেও পড়াতে হবে।

পরদিন ডক্টর লিস্টার জ্ঞানদাকে দেখতে এসে খুশি হয়ে উঠলেন, বাঃ, আজ তোমাকে দেখে সত্যি প্রিন্সেস মনে হচ্ছে। তুমি তো প্রায় সেরেই গেছ।

জ্ঞানদাও লিস্টারের পথ চেয়ে বসে ছিলেন যেন, সত্যি বলছ ডক্টর? আমি সত্যি সেরে উঠব?

না না, আমাকে ডক্টর বলে ডাকলে তো সারবে না, লিস্টার মজা করে বলেন, কই আজ আমাকে এঞ্জেল বলে ডাকলে না তো!

ওষুধে কাজ হয়েছে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি কাজ করেছে ডক্টরের উপস্থিতির টনিক। জ্ঞানদা দ্রুত সেরে উঠতে থাকেন।

কিন্তু একদিন রাতে তাঁর হঠাৎ ব্যথা উঠল। এখনও সময় হয়নি, তবু ব্যথায় ছটফট করতে করতে তাঁর জল ভাঙল। রামা চাকর পাশের বাড়ি থেকে ডনকিনসকে ডেকে নিয়ে এল। ডনকিনস অত রাতে ডক্টর ডাকবেন কোত্থেকে, কোনওরকমে এক প্রতিবেশিনী মিড-ওয়াইফ দাইকে ডেকে আনলেন।

কিন্তু শেষপর্যন্ত জ্ঞানদার বাচ্চাটাকে বাঁচানো গেল না। অসুখের ফলে তাঁর বাচ্চাটি ছিল রুগ্‌ণ ও অপরিণত। জন্মের পর জ্ঞানদার কোলেই সে মারা গেল। সেদিন জ্ঞানদার হাপুস কান্নার সময়ে ডনকিনস ছাড়া পাশে কেউ ছিল না।

প্রবাদ আছে বিপদ কখনও একা আসে না। এর কিছুদিন পরেই রামা চাকরের সঙ্গে সমুদ্রতীরে রোদের মধ্যে ছুটোছুটি করে জ্বর বাধাল ছোটছেলে চোবি, চিকিৎসার বিশেষ সুযোগ পাওয়া গেল না, দু'দিনের জ্বরে সে মারা গেল। একসঙ্গে দুই সন্তানের মৃত্যুশোকে পাথর হয়ে নির্জন ঘরে একা একা বসে রইলেন জ্ঞানদা।

যেদিন লিস্টার দেখা করতে এলেন, জ্ঞানদা তাঁর সামনে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। মার কান্না দেখে ছোট বিবি ও সুরেন মাকে জড়িয়ে ধরে। লিস্টার বিবিকে কোলে নিয়ে বলেন, সুইটি পাই, হোয়াই ডোন্ট ইউ সিং আ সঙ! শুনি কী গান শিখেছ স্কুলে, তোমার মায়ের মন ভাল হয়ে যাবে।

সত্যিই বিবির রিনরিনে সুরেলা গলায় ঘরের বাতাসে খুশির ছোঁয়া লাগে। বিবির হাত ধরে নাচতে থাকেন লিস্টার।

তারপর নাচ থামিয়ে জ্ঞানদার পাশে বসে বলেন, ইন্ডিয়ান প্রিন্সেস, ইটস এ পিটি যে তোমার বাচ্চাটিকে বাঁচানো গেল না। ইংলন্ডে কোন বাচ্চাদের জন্মের সময়ে মারা যাবার রেট বেশি জানো, শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে, যারা হসপিটালে সার্জেনের হাতে জন্মায়। তুলনায় যারা মিড-ওয়াইফের হাতে হয় তাদের বেঁচে থাকার রেট বেশি।

সেকী, জ্ঞানদা সত্যি অবাক হন, মিড-ওয়াইফরা তো আধুনিক বিজ্ঞানের কিছুই জানে না? আমি তো ভাবছিলাম ডক্টর ডাকতে পারলে আমার বাচ্চাটা বেঁচে যেত, দাইয়ের হাতে বলেই মারা গেছে।

না প্রিন্সেস, জোসেফ বলেন, সার্জেনদের হাত ধোয়ার অভ্যেস নেই। অনেক সময়েই হসপিটালের একজন রোগীর ঘায়ে ওষুধ লাগিয়ে হাত না ধুয়েই আর একজনের বাচ্চা ডেলিভারি করতে চলে যায়। এ থেকেই ইনফেকশন। কিন্তু মিড-ওয়াইফদের বারবার হাত ধোয়ার বাতিক আছে, তাই ওদের হাতে মরে কম। তোমার ক্ষেত্রে দাইয়ের বোধহয় কোনও দোষ ছিল না, তোমার অসুখের ধকল বাচ্চাটা নিতে পারেনি। লেট আস প্রে ফর হিজ পিসফুল আফটার লাইফ।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর লিস্টার জ্ঞানদার দিকে একটা সুন্দর রঙিন গিফট প্যাক বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, প্রিন্সেস, তোমার জন্য আজ আমি ওয়াইন আর চকলেট এনেছি, লেট আস সেলিব্রেট ইয়োর গুড হেলথ। ওয়াইন পান স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

একটি রক্তাক্ত হৃদয় সেইমুহূর্তে আর-একটি হৃদয়ের কাছে কিছুক্ষণের নীড় খুঁজে পেল। দুটি রক্তিম ওয়াইন গ্লাস আকাশে পরস্পরকে চুম্বন করল। সেদিনের সেই বেদনামধুর সন্ধ্যাটির রেশ খুঁজতেই যেন ডিসেম্বরে লিস্টারকে ঘিরে বড়দিনের পার্টি সাজালেন জ্ঞানদা।

আরও কয়েকমাস পরে দু'-তিনবার জাহাজ বদল করে আলেকজান্দ্রিয়া, প্যারিস, লন্ডন হয়ে ব্রাইটন পৌঁছলেন রবি ও সত্যেন। সময় লাগল প্রায় দিন কুড়ি। মেদিনা ভিলায় পৌঁছে দীর্ঘদিন পরে প্রিয়মুখ দেখার আশায় কড়া নাড়লেন সত্যেন্দ্র, কিন্তু বাড়ির দরজা খুললেন ইংরেজ ল্যান্ডলেডি।

রবি ও সত্যেন বাড়ির ভেতরে ঢুকতে অবশ্য বেশ মজা হল। জ্ঞানদা ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেজেগুজে অপেক্ষা করছিলেন। বিবি ও সুরেন ইতিমধ্যে স্কুলে যাচ্ছে, কলকাতার স্মৃতি কিছুটা ফিকে হয়ে এসেছে। কয়েকদিন ধরেই তারা শুনছে 'পাপা আসছে, পাপা আসছে।'

বিবির ধারণা ছিল তাদের 'পাপা' তার স্কুলের বন্ধুদের পাপাদের মতোই হ্যাটকোট পরা সাহেব মানুষ। কিন্তু সত্যেনকে দেখে তার সেই ধারণায় ধাক্কা লাগল প্রথমেই। সত্যেন ফুটফুটে পরির মতো বিবিকে কোলে নেওয়ার জন্য হাত বাড়াতেই সে ছুটে পালিয়ে গেল।

দরজার আড়ালে লুকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বিবি বলল, 'দ্যাটস নট মাই পাপা!' হি ইজ নট হোয়াইট!

সত্যেন বুঝলেন বিলেতের সব শিক্ষাই ভাল নয়, এখানকার চাপা বর্ণভেদ শিশুর অবোধ মনের গভীরে ঢুকে পড়েছে। এই অন্ধকার তাড়ানোই হবে তাঁর প্রথম কাজ। মেয়ের সঙ্গে ভাব করতে অনেক সময় ব্যয় হল।

আমার বিলিতি বউও কি পালটে গেছে? কালো বরকে আদর করবে তো? সত্যেন মজা করে জানতে চান জ্ঞানদার দিকে তাকিয়ে।

জ্ঞানদা তখন যত্ন করে ডিনার সাজাচ্ছেন। বিলেতে কায়দাকানুন কতটা শিখেছেন দেখিয়ে চমকে দিতে হবে না সত্যেনকে! কটাক্ষ করে তিনি

স্বামীকে বললেন, খুব তো একা একা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এখন আবার ঠেস দেওয়া হচ্ছে! মরেই যেতাম, নেহাত ডক্টর লিস্টার মরতে দিলেন না, তাই। এখন কত সাহেব ইলোপ করার জন্য সাধাসাধি করছে তা জানো?

কে তোমাকে ইলোপ করতে চায় একটু শুনি, সত্যেন মজা পেয়ে জানতে চান, সেই তোমার ডক্টর লিস্টার নাকি!

আহা, তাঁর তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই! জ্ঞানদা ব্লাশ করেন। সত্যেন অবশ্য বউয়ের গালের সেই ঈষৎ লালিমা লক্ষ করেন না।

ধন্যি মেয়ে তুমি মেজোবউঠান, রবি চারদিকে তাকিয়ে বলেন, কোথায় লোকলশকরে ভরা কলকাতার বাড়ি আর কোথায় এই নিরালা ভিলায় একলা থাকা, তুমি বলেই পারলে। আমাকে এমন একা ছেড়ে দিলে কবে পালিয়ে যেতুম। এত কষ্ট কেন করলে বলো তো?

বা রে, ছেলেমেয়েদের বিলিতি কেতা শেখাতে হবে না? জ্ঞানদা বললেন, তা ছাড়া তোমার মেজদাদা আমাকে মেমসাহেবি কায়দাকানুন শেখাতে চেয়েছিলেন, ঘরের কোণের বাঙালি বউ তাঁর পছন্দ নয়। এখানে এসে না থাকলে এতসব শিখব কী করে?

দেখি এখন কী শিখলে? জ্ঞানদার কাঁধে হাত রেখে সত্যেন বলেন, তোমাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়ে আমি যে এতদিন একা একা থাকলাম, সেই কষ্টটা উসুল করে নিতে হবে না এবার!

আমার ল্যান্ডলেডিটি বেশ ভাল, জ্ঞানদা জানান, তিনি আমাকে অনেককিছু শিখিয়েছেন। এখানে বাড়িঘরে কোনও ধুলো থাকা চলবে না, সব ঝকঝকে করে সাজিয়ে রাখা চাই। কিন্তু আমাদের দেশের মতো জল ব্যবহার করা যায় না, গৃহিণীর পকেটে একটি বড় ন্যাপকিন থাকে, সেই সর্ব-পরিষ্কারক ন্যাতা দিয়ে টেবিল চেয়ার আসবাব থেকে খাবার প্লেট পর্যন্ত সবই পরিষ্কার হয়, তারপর আবার ময়লা সমেত সেটা ঢুকে যায় গৃহিণীর পকেটে। আমাকে উনি বলেছেন সবসময়ে কোটের পকেটে ন্যাপকিন গুঁজে রাখাই গৃহপরিচ্ছন্নতার মূল মন্ত্র। চলবে ফিরবে আর যেখানে ধুলো দেখবে ন্যাপকিনে মুছে ফেলবে।

রবি হা হা করে হেসে ওঠেন, মেজোবউঠান, তুমি কি সেই সর্বশোধক ন্যাপকিনে পরিষ্কার করা প্লেটেই আমাদের বিলিতি ডিনার দিচ্ছ নাকি?

পাগল! জ্ঞানদা হেসে ওঠেন, আমি রামা চাকরকে দিয়ে আচ্ছা করে

গরমজল দিয়ে সব ধোয়ামোছা করাই। জল না দিলে আমার কিছুই পরিষ্কার হয় না।

তবে আর কী শিখলে বউঠান, জল না দিয়ে পরিষ্কার করাই তো এখানকার ম্যাজিক! রবি ঠাট্টা করেন, তুমি তো সেই বাঙালি বউ রয়ে গেলে।

সত্যেন বলেন, রবি জানিস তো, এখানে সর্দিকাশি হলে সাহেবরা ন্যাপকিনে নাক ঝাড়েন, ন্যাপকিনেই কফথুতু ফেলেন, আবার সেটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখেন পরেরবারের জন্য।

ছিঃ! রবির গা শিউরে ওঠে ঘেন্নায়। বলেন, আমাদের দেশের মতো এরা বাড়িতে পিকদান রাখলেই পারে, তাতে পকেট নোংরা হয় না।

জ্ঞানদা মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে বললেন, না না রবি, ওদের চোখে পিকদান খুব ন্যাস্টি দৃশ্য। অমন নোংরা জিনিস ওরা ঘরে রাখবে না, পকেটের ন্যাপকিন তো দৃশ্যমান নয়। এখানে চোখের পরিচ্ছন্নতা সবার আগে। এরা খেয়ে উঠে কুলকুচো করে না কারণ মুখ থেকে জল পড়া দেখতে খারাপ। সাহেবদের শোকবস্ত্রও সুদৃশ্য করে তৈরি।

ডিনার টেবিলে বসে খাওয়া শুরু করে রবি বলেন, দেখে শুনে যা বুঝছি মেজোবউঠান, এদের ঘরে শ্রী আছে কিন্তু পরিচ্ছন্নতা নেই। এরা সুশ্রী কিন্তু নোংরা। এই শেখার জন্য আমাদের প্রবাসে আসতে হল!

না রবি, সত্যেন প্রতিবাদ করেন, এদের অনেক ভাল স্বভাব আছে, সেই গুণগুলো আয়ত্ত করার জন্যই আমরা এখানে এসেছি। ওদের ভালর সঙ্গে আমাদের ভালটা মিশিয়ে নিতে পারলেই আমাদের পূর্ণাঙ্গ পরিশীলন হবে। জ্ঞানদার দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, তবে তোমার বিলিতি ডিনারটা বেশ এনজয় করছি।

রবি ফোড়ন কাটেন, হ্যাঁ, বেশ আলুনি আর আঝালি। বউঠান, তুমি এ-সব আলুসেদ্ধর সুপ আর পাউরুটি রান্না করতে করতে আসল রান্নাগুলো যেন ভুলে যেয়ো না।

রোস্ট চিকেনটা আমি রেঁধেছি, বাকি সব ল্যান্ডলেডির কিচেন থেকে, জ্ঞানদা বললেন, শোনো রবিঠাকুরপো, তোমার ভয় নেই, আমি এ-সব বিশেষ রাঁধছি না। খাবার সাপ্লাইয়ের দায়িত্ব বাড়িওলির। তার কল্যাণেই রোজ আমাদের প্রকৃত ইংলিশ ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার জুটবে।

ওরে বাবা, রবি আঁতকে ওঠেন, তা হলে তো আমাকে শিগগির পালাতে হবে বউঠান।

পালাব বললেই হল! সত্যেন ধমকে ওঠেন, চারদিকে ঘুরে দেখ রবি কত বঙ্গযুবক এই ইংরেজ বাড়িওলির সঙ্গ পেয়ে ধন্যবোধ করছে। কোট হ্যাট গাউন পরা জলজ্যান্ত বিবিসাহেবদের এত কাছে আসার সৌভাগ্যে পাগল হয়ে যাচ্ছে।

সে তো জাহাজেই নমুনা পেয়েছি মেজদাদা। রবি হেসে বলেন, জানো বউঠান, জাহাজে কয়েকটি ভারী মজার ইঙ্গবঙ্গ যুবক ছিল। তারা জাহাজের ইংরেজ চাকরদের হুকুম করার বদলে স্যার বলে ডাকেন। নামার সময়ে ইংরেজ গার্ড এসে সাহায্য করলে বঙ্গযুবারা আহ্লাদে গলে পড়েন। সাহেবগার্ডের একটি সেলামের বদলে এক শিলিং বখশিস দিয়ে ধন্য হন। আমার এক সহযাত্রীর কাছে শুনেছি ল্যান্ডলেডির সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা। কার্পেট পাতা, ছবি টাঙানো, ফুলভরা ফুলদানি সাজানো, পিয়ানো শোভিত ভাড়া ঘরে ঢুকেই তো প্রথমে ঘাবড়ে গেলেন, এত দামি ঘরে থাকবেন কী করে? তিনি তখনও জানেন না যে বিলেতের সব ঘর এরকম, বরং কোনও মাদুরপাতা চৌকি দেওয়া ঘরই দুষ্প্রাপ্য। তার ওপর যখন ইংরেজ বাড়িওলি এসে বিনীত স্বরে গুড মর্নিং বললেন, তখন তো তার দিশাহারা অবস্থা।

জ্ঞানদা হেসে গড়িয়ে পড়েন, তারপর তার সেই বাড়িওলির সঙ্গে ভাব হল কি না? এখানে তো ল্যান্ডলেডির কেয়ারেই জীবন সঁপে দিতে হয়।

রবি হাসতে হাসতে জানান, ক্রমশ ল্যান্ডলেডির সঙ্গে তার এতই আলাপ জমে উঠল যে এখন তার মেয়ের সঙ্গে ফ্লার্ট করা পর্যন্ত এগিয়ে গেছেন তিনি।

সকলের সমবেত হাসির মধুর উত্তাপের মধ্য দিয়ে সেদিনের মতো ডিনার শেষ হল।

পরদিন থেকে ব্রাইটনের জীবন ঢিমে তালে গড়িয়ে চলল। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ঘুম থেকে ওঠা, তারপর স্নান। রবি রোজ ঠান্ডা জলে আপাদমাথা ভিজিয়ে স্নান করেন, এখানকার রীতি মতো শুধু গরমজলে গা মুছে নেওয়া তাঁর পোষায় না। ল্যান্ডলেডি ব্রেকফাস্ট পাঠান ন'টায়। টোস্ট ওমলেট দুধ পরিজের ইংলিশ ব্রেকফাস্টের পর কিছুক্ষণ নিজের নিজের কাজ, পড়াশোনা, সুরেন বিবির সঙ্গে খেলাধুলার পর বেলা দেড়টায় লাঞ্চ। দিন শুরু বলতে গেলে ন'টার আগে হয় না, আবার চারটের মধ্যে আলো মরে আসে। রবির মনে হয়, এখানকার দিনগুলো যেন দশটা পাঁচটার অফিসবাবু। আর রাতগুলো ঘোড়ায় চেপে আসে

আর পায়ে হেঁটে ফেরে, যেন ফেরার ইচ্ছেটাই কম। বিকেলে একবার কেক বিস্কিট সহযোগে চা পাওয়া যায় তারপর রাত আটটায় এলাহি ডিনার।

ব্রাইটনের সমুদ্রতীর তখন খুব উপভোগ্য। অক্টোবরে শীত তেমন পড়েনি, ব্রেকফাস্টের পর বেলা দশটা-এগারোটা নাগাদ প্রায়দিনই ওঁরা সি-বিচে চলে আসেন। ঝকঝকে রোদে সাহেবমেমরা মহানন্দে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। রুগ্‌ণ আর বৃদ্ধদের হুইলচেয়ারে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে বাড়ির লোকেরা। মেয়েদের নানারকম সাজপোশাক দেখে রবির তাক লেগে যায়। কী সহজ স্বচ্ছন্দ এই সাগরপারের মেয়েগুলি! রবির মনে পড়ে যায় ঘরে ফেলে আসা প্রিয়মুখটি। আহা আমার নতুনবউঠান যদি এমন স্বাধীন আনন্দে সাগরপাড়ে ঘুরে বেড়াতে পারতেন!

সুরেন আর বিবির ছুটোছুটির সঙ্গে জ্ঞানদা পেরে ওঠেন না, রামা চাকর যত তাদের পেছনে দৌড়য় তত তারা রবির গায়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রবি ওদের নিয়ে ঝিনুক কুড়োতে শুরু করেন। রংবেরঙের ছাতার নীচে শুয়ে-বসে আছে স্বল্পবাস সুন্দরীরা, ইতালীয় ভিখারি তাদের সামনে অর্গান বাজিয়ে ভিক্ষা চাইছে। রবি মজা পেয়ে বলেন, দেখো বউঠান, ওই ভিখারিবা কেবল মেয়েদের সামনেই ঘুরঘুর করছে কেন?

জ্ঞানদা বললেন, মনে হচ্ছে ওরা সৌন্দর্যের ভিখারি, টাকাপয়সা না হলেও চলবে। তবে ওদের আর কী দোষ, তুমিও তো ঘুরেফিরে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছ রবিঠাকুরপো!

বউঠান, তোমার কাজলটানা ভারতীয় নয়নেও যে সুইমস্যুট পরা গোরাসাহেবদের রূপ ধরা পড়ছে না এমন কথা তো বলতে পারছি না।

কী যে বলো, ছি! অমন রূপ দেখলে আমার চোখ জ্বালা করে। ঝাঁঝিয়ে ওঠেন জ্ঞানদা, ওইরকম উলঙ্গপনার চেয়ে পোশাকের সৌন্দর্য অনেক বেশি, এটা যে এরা কবে বুঝবে। ভারতীয় রুচি অনেক পরিশীলিত।

রবি হাসেন, তা হলে তো এখানে এসে তুমি আরও বেশি বেশি বাঙালিনি হয়ে যাচ্ছ, কোথায় তোমাকে বিলিতি কালচার শেখাতে আনা হল, আর তুমি দিনকে দিন আরও কট্টর ইংরেজবিদ্বেষী হয়ে যাচ্ছ! আমি তো কল্পনা করেছিলাম এখানে এসে কেতাদুরস্ত গাউন শোভিত হ্যাট পরিহিত মিসেস টেগোরকে মিট করব, আর সেই তুমি কিনা বাংলার বালুচরী পরে ব্রাইটনের সমুদ্রতীরে রোদ পোয়াচ্ছ?

মিষ্টি হেসে জ্ঞানদা বলেন, আমার এই ভাল, দেখছ না সবাই ঘুরে ঘুরে কেমন আমাকেই দেখছে! আমার গায়ে আমার দেশের পতাকা লাগানো আছে।

আজকাল মাঝে মধ্যেই ডিনার বা বল ডান্স বা ইভনিং পার্টির নেমন্তন্ন থাকছে। ইংরেজ সমাজে ওঁদের মেশামেশির পালা শুরু হল একটি সান্ধ্য নিমন্ত্রণে। এতদিন জ্ঞানদা একা ছিলেন, এখন তাঁর স্বামী যোগ দেওয়ায় প্রতিবেশী ইংরেজদের আনাগোনা, আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ শুরু হয়েছে।

ডক্টর মারলোর বাড়ির সান্ধ্যপার্টিতে অনেক নারী পুরুষ জড়ো হয়েছেন সেদিন। ঘরে ঢুকেই হোস্ট ও হোস্টেসকে অভিবাদন জানানোর পালা। তারপর বাকিদের সঙ্গে আলাপ। ঘরে জায়গা কম তাই সবার বসার চেয়ার নেই। মহিলারা কৌচে বসে গল্প শুরু করলেও পুরুষরা অধিকাংশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছেন। নতুনদের সঙ্গে আলাপ শুরু ওয়েদার টক দিয়ে।

এ-সব আসরে পোশাক আসাকের ফ্যাশন খুব গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষদের সান্ধ্য পোশাকের শার্ট হতে হবে ধবধবে সাদা, তার ওপর বুক খোলা কালো ওয়েস্টকোটের ওপর থেকে সাদা শার্টের কলার উঁকি দেবে। গলায় সাদা নেকটাই। সবার ওপরে সামনে কোমর পর্যন্ত কাটা টেল কোট। রবি ও সত্যেন ইংরেজদের স্টাইলে টেল কোট পরে গেলেও জ্ঞানদা শাড়িই পরলেন। তাঁর মেরুন বালুচরী ও পশমিনা শাল নিয়ে ইংরেজ মহিলারা উচ্ছ্বসিত হয়ে নানা প্রশ্ন শুরু করলেন। মিসেস মারলোর মতে সেলাই করা গাউনের চেয়ে জ্ঞানদার ভাঁজে ভাঁজে বিন্যস্ত শাড়ি আরও লালিত্যময়।

ডক্টর লিস্টারকে দূর থেকে এগিয়ে আসতে দেখে জ্ঞানদার মনে উত্তেজনার ছোঁয়া লাগে। লিস্টার তাঁকে নাচে আহ্বান করলে জ্ঞানদা সত্যেনের দিকে তাকান।

সত্যেন সঙ্গে সঙ্গেই বলেন, যাও না জ্ঞানদা, ডক্টর লিস্টার তোমাকে পার্টনার হতে ডাকছেন, ইটস আ অনার!

জ্ঞানদা ও লিস্টারের নৃত্যরত জুটিকে বেশ মানিয়েছে। সত্যেনের মনে কি একটু খোঁচা লাগছে! তাঁদের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকেন, মনে মনে কিছুতেই হারবেন না, দুনিয়ার পুরুষদের সঙ্গে মিশে দেখে নিক জ্ঞানদা, তার পরেও যদি পুরুষ হিসেবে জ্ঞেনুর চোখে তিনি আকর্ষণীয় থাকেন, তবেই তাঁর পৌরুষের জিত।

কবে এলেন ব্রাইটনে? লিস্টারকে জিজ্ঞেস করেন জ্ঞানদা। জোসেফ লিস্টার স্কটল্যান্ডের এডিনবরায় চিকিৎসা এবং অধ্যাপনা করেন, মাঝে মাঝে ব্রাইটনে আসেন, যেমন কিছুদিন ছিলেন জ্ঞানদার অসুখের সময়ে।

লিস্টার জ্ঞানদাকে বলেন, ইন্ডিয়ান প্রিন্সেস, আমি অনেক রোগীর চিকিৎসা করি কিন্তু তোমাকে সারিয়ে তুলে যেরকম আনন্দ পেয়েছি, সেটা স্পেশাল।

আপনি ব্রাইটনে থেকে যাচ্ছেন না কেন? জ্ঞানদা আবদার করেন বালিকার মতো, তা হলে অসুখ করলেই আপনার দেখা পাওয়া যেত। আপনাকে দেখলেই আমার শরীর মন সব ভাল হয়ে যায়।

তা কি হয় প্রিন্সেস, তুমি যেমন একটা নির্দিষ্ট জীবনে বাঁধা, আমিও তেমনি, লিস্টার হেসে বলেন, ওখানেই আমার স্ত্রী অ্যাগনেস, ওখানে আমার কাজ, আমার রোগীরা। ওখানে কাজ করেই আমার সম্মান স্বীকৃতি সব। সে-সব ছেড়ে কি আসা যায়? তুমিই কি পারবে তোমার স্বামী ছেড়ে দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও সেটল করতে? কেন করবেই বা!

আপনি স্ত্রীকে খুব ভালবাসেন? জ্ঞানদা জানতে চান।

লিস্টার বলেন, অ্যাগনেস আমার সব কাজের সঙ্গিনী, আমার ঘরের গৃহিণী, আমার ল্যাবের অ্যাসিস্টান্ট।

উনিও কি আপনার মতো ডক্টর? জ্ঞানদা অবাক হন। বিলেতেও মহিলা ডক্টর খুব বেশি দেখা যায় না এখনও।

উনি মেডিক্যাল সায়েন্সের ছাত্রী, আমার গুরুকন্যা। লিস্টার জানান, অ্যাগনেস ভাল ফরাসি জানে, ওর অনুবাদ করা লুই পাস্তুরের থিয়োরি পড়েই জার্ম ইনফেকশনের ব্যাপারে আমার চোখ খুলে যায়।

বাঃ, জ্ঞানদা সত্যি খুশি হন, স্বামী স্ত্রীর এরকম জুটি তো আদর্শ। আমাদের দেশে এরকম যে কবে হবে তাই ভাবছি। আর কোনওদিন দেখা হবে কি না জানি না, তোমাদের কথা আমার সবসময়ে মনে থাকবে।

দেখা হোক বা না হোক, লিস্টার গাঢ়স্বরে বলেন, আমার প্রিন্সেস যেখানেই থাক, যেন সবসময়ে ভাল থাকে। কোনও দুঃখ যেন তোমার হাসি মুছে দিতে না পারে।

রবির সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়ে আসে এক সুন্দরী বিলেতবালা আর সবার চোখ ঘুরে আসে সেইদিকে। এখানে রূপের পূজা হয় সাড়ম্বরে,

রূপসির চারপাশে স্তাবকেরা ঘুরঘুর করে একটু হুকুম তামিল করার জন্য। রূপ এখানে লুকিয়ে থাকতে পারে না। মিস মিলি রবির সঙ্গে কথা বলছেন আর তখনই কত ইংরেজ যুবক তাঁকে নাচের সঙ্গী হতে ডাক দিচ্ছেন।

এরপর শুরু হল গানবাজনার আসর। গৃহকর্তা এক সুসজ্জিতা মেমসাহেবকে অনুরোধ করতেই তিনি পিয়ানো বাজাতে বসলেন আর পিয়ানোর রিডের ওঠানামার সঙ্গে তাঁর দশ আঙুলের আংটি ঝিকমিকিয়ে উঠতে লাগল। যেন পিয়ানো বাজানোর জন্যেই তিনি আঙুলগুলি সাজিয়েছেন। কিছু পরেই রবির বিপদ ঘনিয়ে এল। তাঁকে গান গাওয়ার অনুরোধ করে বসলেন বাড়ির গৃহিণী। রবি জানেন এরা ভারতীয় গানের কদর বোঝে না, এদের সামনে গান গাওয়ার কোনও মানে হয় না। তবু চারদিক থেকে অনুরোধ আসতে থাকায় তিনি এড়াতে পারলেন না।

কিন্তু রবি গাইতে শুরু করতেই ক্রমশ সমবেত ইংরেজ নারীপুরুষদের ঠোঁটের কোনায় হাসি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কোনও কোনও মহিলা হাসি চাপতে না পেরে নিচু হয়ে রুমাল কুড়ানোর ছলে হেসে নিলেন। কেউ আবার বান্ধবীর পিঠে মুখ লুকিয়ে হাসলেন। যাঁরা হাসি চাপতে সক্ষম হলেন তাঁদের চোখে চোখে যেন টেলিগ্রাফ চলতে লাগল। পিয়ানোবাদিকা মহিলার মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব দেখে রবির গায়ের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছিল। এমনকী মিলির মুখেও হাসি লেগে আছে দেখে রবি যেন মরমে মরে যাচ্ছিলেন। গান গেয়ে এমন অপদস্থ আর কখনও হননি। কোনওরকমে গান শেষ করে রবির মুখচোখ লাল হয়ে উঠল।

ঘরে মৃদু প্রশংসাধ্বনি উঠলেও অত হাসির পর রবি আর সেটাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করলেন না। ঘরের আবহাওয়ায় তাঁর অসুস্থ লাগছিল। মিলি এগিয়ে এসে গানের মানে জিজ্ঞেস করলে রবি 'প্রেমের কথা আর বোলো না' অনুবাদ করে বোঝাতে চাইলেন। তাতে কেউ মন্তব্য করলেন তোমাদের দেশে প্রেমের স্বাধীনতা আছে নাকি?

জ্ঞানদা রবির এরকম হেনস্থা আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁর হাত ধরে টেনে নৈশভোজের ঘরে নিয়ে গেলেন। এখানে সবাই একসঙ্গে খেতে যাচ্ছে না, তা হলে পার্টির রস বিঘ্নিত হয়। জোড়ায় জোড়ায় হাত ধরে কয়েকজন পালা করে খাবারঘরে যাচ্ছে।

জ্ঞানদা ফিসফিস করে রবিকে বললেন, এরা নিজেদের কালচারের বাইরে

সবকিছু নিয়ে হাসাহাসি করে, আসলে এরাই অশিক্ষিত। তোমার অপূর্ব গানটির মর্ম বুঝতেই পারল না, আজ তুমি খুব ভাল গেয়েছ রবি।

মেজোবউঠানের সান্ত্বনায় রবির চোখ চিকচিক করে ওঠে। বলেন, এরা যে রাজার জাত বউঠান, রাজদণ্ডের জোরে অন্যের সভ্যতাকে উপহাস করার স্পর্ধা রাখে। তবে মেজোবউঠান, আমি ভাবছি আমি ওদের গান আয়ত্ত করেই একদিন ওদের অপমানের জবাব দেব।

সত্যি রবি, জ্ঞানদা বলেন, এই যে বিলিতি মেয়েরা আমাদের গান শুনে হাসাহাসি করছিল, এরা প্রকৃতপক্ষে কিছুই জানে না। আমাদের দেশে যেমন ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের ঘরকন্না শিখিয়ে আর লেখাপড়া না শিখিয়ে বিয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়, এখানেও তেমন মেয়েদের পালিশ চলে বিয়ের বাজারে বিকোবার জন্য। বিয়ের জন্য যতটুকু লেখাপড়া দরকার ততটুকুই শেখানো হয়। একটু গান, একটু পিয়ানো, একটু সেলাই, একটু ভাল করে নাচা, একটু-আধটু ফরাসি ভাষা জানলেই বিয়ের বাজারের জন্য তৈরি।

রবি হেসে বলেন, তার মানে আমাদের মেয়েরা দিশি পুতুল আর এখানকার গোরিমেমরা বিলিতি পুতুল, তুমি বলছ এটুকুই তফাত! আমাদের মেয়েরা আর এদের মেয়েরা দুই-ই দোকানে বিক্রি হবার জন্য তৈরি। তা হলে আর সাতসমুদ্র পাড়ি দিয়ে কী শিখতে এলে মেজোবউঠান?

এখানে এসে এইটুকু তো শিখলাম, জ্ঞানদা বলেন, না এলে ভাবতাম এদেশের মেয়েরা কত-না স্বাধীন, কত-না শিক্ষিত।

হ্যাঁ বউঠান, রবি বলেন, যা দেখছি, এখানেও পুরুষেরাই হর্তাকর্তা, স্ত্রীরা তাদের অনুগত। স্ত্রীকে আদেশ করা, স্ত্রীর মনে লাগাম লাগিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো চালিয়ে বেড়ানোর চেষ্টাকে এখানকার স্বামীরাও তাদের ভগবানদত্ত অধিকার মনে করেন। তবে বড়লোকদের ফ্যাশনি মেয়েদের চেয়ে সাধারণ গেরস্থঘরের মহিলাদের আমার বেশি ভাল লাগে। তাঁদের অনেক কাজ করতে হয় ঘরে-বাইরে। গৃহিণীপনা তাক লাগিয়ে দেয়। লেখাপড়া বেশি না শিখলেও এদেশের মেয়েদের বুদ্ধি পরিষ্কার। অনেক বিষয় জানেন। কথাবার্তায় জ্ঞানলাভ করা যায়। এঁরা চার দেওয়ালে বদ্ধ নন। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়দের সভায় কোনও বিষয়ে স্পষ্ট মতামত জানাতে পারেন।

জ্ঞানদা ডেসার্টের দুটি প্লেট হাতে নিয়ে এসে একটি রবিকে দিতে দিতে বললেন, আমার ভাল লাগে এদের পারিবারিক সম্পর্কটা। সারাদিন পর কর্তা

বাড়ি ফিরলে আগুনের চারধারে জড়ো হয়ে বসে পুরো পরিবার খোলামেলা কথাবার্তা, গানবাজনা হয়। কী সুন্দর।

রুপোর চামচ দিয়ে ক্যারামেল পুডিং মুখে তুলতে তুলতে রবি বলেন, এখানে নারীপুরুষের সম্পর্কটাকে আড়াল করার চেষ্টা করা হয় না বলেই তা এত খোলামেলা ডানা মেলেছে। আপিস থেকে বাড়ি ফিরে যেমন পোশাকি কাপড়জামা ছেড়ে হাঁফ ছেড়ে বসে লোকে, তেমনি আনুষ্ঠানিক ব্যবহারের খোলস ছেড়ে মন খুলে আপনজনের সঙ্গে কথা বলতে চায়। তখনও কেন বউয়ের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলতে হবে, পাছে পাশের ঘর থেকে শ্বশুর-ভাশুর শুনে ফেলেন! স্ত্রীর গলা বা হাসি শোনা গেলে কেন মহাভারত উলটে যাবে! এজন্য বিলিতি বাঙালিরা দেশে ফিরে খুঁতখুঁত করে যে আমাদের কোনও হোম নেই, বিলেতেই যথার্থ হোম আছে। কারণ বিলেতের পরিবারে একটা স্বাধীন উচ্ছ্বাসের ছোঁয়া পাওয়া যায়। সারাদিনের পরে বাপ মা ভাই বোন স্ত্রী সন্তান মিলে বাড়ির মধ্যে অগ্নিকুণ্ডের চারধারে আনন্দের উৎস তৈরি হয়।

হ্যাঁ রে রবি, সত্যেন এসে যোগ দেন ওদের আলাপে, এদেশে এরা কী পরিবারের ভেতর কী বাইরে, নারীপুরুষের মেলামেশাটাকে খুব গুরুত্ব দেয়। সেজন্য এখানকার মেয়েরা স্বাধীন না হয়েও নিজেদের প্রাণের স্ফূর্তি মেলে ধরতে পারে। স্বামীকে সবার সামনে শাসন করতেও পারে আবার চুমুও খায় নিঃসংকোচে।

রবি ও জ্ঞানদার খাওয়া শেষ হয়েছে তাই সত্যেন খাবার ঘরে এসেছেন। সবাই একসঙ্গে খেতে চলে আসা ঠিক হবে না বলেই এই ব্যবস্থা। কিন্তু তাঁকে পেয়ে ওদের পারিবারিক আড্ডা যেন জমে উঠল।

এরকম সান্ধ্য চা-সভা, নৈশভোজ, নাচের আসর, বল, লন পার্টি লেগেই থাকে রবিদের জীবনে। এ যেন এক অন্য জীবন, কোথায় কলকাতার গানে কবিতায় ভরপুর সৃষ্টির উন্মাদনা আর কোথায় এখানে সভাশোভন হয়ে ওঠার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা! রবির হতাশ লাগে মাঝে মাঝেই।

অলস দিনেরবেলায় এবাড়ি-ওবাড়ি ভিজিট পালটা ভিজিট করাও এখানকার প্রথা। রবি লক্ষ করেছেন, বড়ঘরের মহিলাদের সামাজিক আলাপচারিতে একরকম দক্ষতা আছে, অনেক অতিথি থাকলে গৃহিণী তাঁর বাক্য ও হাসির অমৃত সকলকে সমানভাবে বিলিয়ে দিতে জানেন।

বিশেষ কারও সঙ্গে বেশি বেশি গল্প করা চলবে না, তাতে অন্যেরা ক্ষুণ্ণ হবেন।

জ্ঞানদার সঙ্গে দু'-একটি ভিজিটে গিয়ে রবি দেখলেন, গিন্নিরা একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা কথা বলেন, তারপরেই সকলের দিকে তাকিয়ে হাসেন আবার পরের কথাটা অন্য একজনকে বলেন, বলতে বলতে হয়তো সকলের দিকে চোখ ঘুরিয়ে আনেন।

আসরের মধ্যমণি গৃহিণী মিসেস জনসন একজনকে বললেন. লাভলি মর্নিং, ইজনট ইট! তারপর সে কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই আর-একজনের দিকে তাকিয়ে ছুড়ে দিলেন, কালরাতের সংগীতশালায় ম্যাডাম নীলসন গান করছিলেন, ইট ওয়াজ এক্সুইজিট!

অন্য সব মহিলারা তাঁর কথার পিঠে এক-একটা করে বিশেষণ জুড়ে দিতে লাগলেন পরম উৎসাহে, কেউ বললেন চার্মিং, কেউ বললেন সুপার্ব।

আর-একজন বাকি ছিলেন, তিনি বললেন, ইজনট ইট!

রবি ফিসফিস করে জ্ঞানদাকে বলেন, দেখো বউঠান, কথাগুলো যেন তাসের আসরের তাস চালার মতো করে সবার দিকে গড়িয়ে দেওয়া। এমন তাড়াতাড়ি এত দক্ষতার সঙ্গে কথা ঘুরছে যে বোঝা যায় এদের হাতে অনেক তাস গোছানো আছে।

জ্ঞানদা চোখ ঘুরিয়ে বলেন, কিংবা কথার লড়াই। সকালবেলা উঠে মুগুর ভাঁজা।

মিসেস ডনকিনস জ্ঞানদার সঙ্গে গল্প করতে এগিয়ে আসেন, জানতে চান, মিসেস টেগোর, তোমাদের দেশে কি এরকম সোশাল ভিজিট হয় যেখানে নারীপুরুষ সবাই থাকেন? তোমরা সেখানে কী কথা বলো?

আমাদের বাড়িতে হয়, জ্ঞানদা জানান, কিন্তু সাধারণভাবে অভিজাত হিন্দু পরিবারে এরকম চল নেই। আমাদের মেয়েরা এখনও সকলের সামনে বেরোয় না।

হাউ হরিবল, ডনকিনস বলেন, তোমরা এখনও পরদার আড়ালে মনুষ্যেতর জীবনযাপন করছ। দিস শুড বি চেঞ্জড।

জ্ঞানদা বলেন, আমাকে দেখে তোমার কি মনে হয়, মনুষ্যেতর জীব? আমি যেরকম একা একা বাচ্চাদের নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে এতদূর এসেছি, তুমি পারবে? তোমাদের দেশের ক'জন মেয়ে সেটা পারবে?

ডনকিনস জ্ঞানদার হাত ধরে বলেন, ওঃ গানডা ডার্লিং ডোন্ট টেক ইট পারসোনালি। আমি জানি তুমি ব্যতিক্রম, তোমার মতো সাহসী মহিলা আমি খুব কম দেখেছি। আই অ্যাডোর ইউ।

এর কিছুদিন পর সত্যেন জ্ঞানদা ও রবি ছেলেমেয়েদের নিয়ে লন্ডন যাত্রা করলেন। সেখান থেকে ট্রেন্টব্রিজ ওয়েলস, ডেভনশায়ার ঘুরে রবি লন্ডনে একটি পরিবারের সঙ্গে থাকতে শুরু করলেন। এত ঘোরাঘুরির মধ্যেও রাতে শোবার সময়ে তাঁর মনে পড়ে নতুনবউঠানকে। প্রায় রোজ তাঁকে চিঠি লেখেন রবি। চিঠি হয়তো একদিনেই শেষ হয় না, কাটাকুটিও হয় অনেক। কিন্তু রবি তাঁকে প্রতিদিন চিঠি লেখেন, প্রতিরাত।

'ইংলন্ডে আসবার আগে আমি নির্বোধের মতো আশা করেছিলেম যে, এই ক্ষুদ্র দ্বীপের দুই হস্ত-পরিমিত ভূমির সর্বত্রই গ্ল্যাডস্টোনের বাগ্মিতা, ম্যাক্স্‌মূলরের বেদব্যাখ্যা, টিন্ড্যালের বিজ্ঞানতত্ত্ব, কার্লাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শনশাস্ত্রে মুখরিত। সৌভাগ্যক্রমে তাতে আমি নিরাশ হয়েছি। মেয়েরা বেশভূষায় লিপ্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম করছে, সংসার যেমন চলে থাকে তেমনি চলছে, কেবল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে কোলাহল শোনা যায়। মেয়েরা জিজ্ঞাসা করে থাকে, তুমি নাচে গিয়েছিলে কি না, কনসর্ট কেমন লাগল, থিয়েটারে একজন নূতন অ্যাক্টর এসেছে, কাল অমুক জায়গায় ব্যান্ড হবে ইত্যাদি। পুরুষেরা বলবে, আফগান যুদ্ধের বিষয় তুমি কী বিবেচনা কর, Marquis of Lorneকে লন্ডনীয়েরা খুব সমাদর করেছিল, আজ দিন বেশ ভালো, কালকের দিন বড়ো মিজরেব্‌ল্ ছিল। এ-দেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজায়, গান গায়, আগুনের ধারে আগুন পোয়ায়, সোফায় ঠেসান দিয়ে নভেল পড়ে, ভিজিটরদের সঙ্গে আলাপচারি করে ও আবশ্যক বা অনাবশ্যক মতে যুবকদের সঙ্গে ফ্লার্ট করে। এদেশের চির-আইবুড়ো মেয়েরা কাজের লোক। টেম্‌পারেন্স মীটিং, ওয়ার্কিং মেন্‌স্ সোসাইটি প্রভৃতি যত প্রকার অনুষ্ঠানের কোলাহল আছে, সমুদয়ের মধ্যে তাদের কণ্ঠ আছে। পুরুষদের মতো তাঁদের আপিসে যেতে হয় না, মেয়েদের মতো ছেলেপিলে মানুষ করতে হয় না, এদিকে হয়তো এত বয়স হয়েছে যে 'বল'-এ গিয়ে নাচা বা ফ্লার্ট করে সময় কাটানো সংগত হয় না, তাই তাঁরা অনেক কাজ করতে পারেন, তাতে উপকারও হয়তো আছে।

এখানে দ্বারে দ্বারে মদের দোকান। আমি রাস্তায় বেরোলে জুতোর দোকান, দরজির দোকান, মাংসের দোকান, খেলনার দোকান পদে পদে দেখতে পাই কিন্তু বইয়ের দোকান প্রায় দেখতে পাই নে। আমাদের একটি কবিতার বই কেনবার আবশ্যক হয়েছিল, কিন্তু কাছাকাছির মধ্যে বইয়ের দোকান না দেখে একজন খেলনাওয়ালাকে সেই বই আনিয়ে দিতে হুকুম করতে হয়েছিল— আমি আগে জানতেম, এ দেশে একটা কসাইয়ের দোকান যেমন প্রচুররূপে দরকারি, বইয়ের দোকানও তেমনি।

ইংলন্ডে এলে সকলের চেয়ে চোখে পড়ে লোকের ব্যস্ততা। রাস্তা দিয়ে যারা চলে তাদের মুখ দেখতে মজা আছে— বগলে ছাতি নিয়ে হুস হুস করে চলেছে, পাশের লোকদের উপর ভ্রূক্ষেপ নেই, মুখে যেন মহা উদ্‌বেগ, সময় তাদের ফাঁকি দিয়ে না পালায় এই তাদের প্রাণপণ চেষ্টা। সমস্ত লন্ডনময় রেলোয়ে। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর এক-একটা ট্রেন যাচ্ছে। লন্ডন থেকে ব্রাইটনে আসবার সময় দেখি প্রতি মুহূর্তে উপর দিয়ে একটা, নীচে দিয়ে একটা, পাশ দিয়ে একটা, এমন চারি দিক থেকে হুস হাস করে ট্রেন ছুটেছে। সে ট্রেনগুলোর চেহারা লন্ডনের লোকদেরই মতো, এদিক থেকে ওদিক থেকে মহা ব্যস্তভাবে হাঁসফাঁস করতে করতে চলেছে। দেশ তো এই এক রত্তি, দু-পা চললেই ভয় হয় পাছে সমুদ্রে গিয়ে পড়ি, এখানে এত ট্রেন যে কেন ভেবে পাই নে। আমরা একবার লন্ডনে যাবার সময় দৈবাৎ ট্রেন মিস করেছিলেম, কিন্তু তার জন্যে বাড়ি ফিরে আসতে হয়নি, তার আধ ঘণ্টা পরেই আর-এক ট্রেন এসে হাজির।'

জোড়াসাঁকোর তেতলার ঘরে তখন একাকিনী কাদম্বরী বিছানায় এলোচুল ছড়িয়ে শুয়ে আছেন। চারদিকে ছড়ানো চিঠি কাগজ পানের বাটা। মাঝে মাঝে চিঠি তুলে নিয়ে পড়ছেন আবার উদাস হয়ে কী ভাবছেন। কোনও চিঠি এসেছে লন্ডন থেকে, কোনওটা ডেভনশায়ার।
রবি লিখেছেন—

'...ক্রমে ক্রমে এখানকার দুই-এক জন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হতে চলল। একটা মজা দেখছি, এখানকার লোকেরা আমাকে নিতান্ত অবুঝের মতো মনে করে। একদিন Dr.—এর ভাইয়ের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়েছিলেম। একটা দোকানের সম্মুখে কতকগুলো ফোটোগ্রাফ ছিল, সে আমাকে সেইখানে নিয়ে গিয়ে ফোটোগ্রাফের

ব্যাখ্যান আরম্ভ করে দিলে— আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে, একরকম যন্ত্র দিয়ে ঐ ছবিগুলো তৈরি হয়, মানুষে হাতে করে আঁকে না। আমার চার দিকে লোক দাঁড়িয়ে গেল। একটা ঘড়ির দোকানের সামনে নিয়ে, ঘড়িটা যে খুব আশ্চর্য যন্ত্র তাই আমার মনে সংস্কার জন্মাবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল। একটা ঈভনিং পার্টিতে মিস— আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি এর পূর্বে পিয়ানোর শব্দ শুনেছি কি না। এ-দেশের অনেক লোক হয়তো পরলোকের একটা ম্যাপ এঁকে দিতে পারে কিন্তু ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যদি একবিন্দুও খবর জানে। ইংলন্ড থেকে কোনো দেশের যে কিছু তফাত আছে তা তারা কল্পনাও করতে পারে না। ভারতবর্ষের কথা দূরে থাক্— সাধারণ লোকেরা কত বিষয় জানে না তার ঠিক নেই।'

কোনও চিঠিতে ফ্যান্সি-বল পার্টির চমৎকার বর্ণনা পড়ে রূপকথার সিন্ডারেলার কথা মনে পড়ে যায় কাদম্বরীর—

'আমরা সেদিন ফ্যান্সি-বলে অর্থাৎ ছদ্মবেশী নাচে গিয়েছিলেম— কত মেয়ে পুরুষ নানারকম সেজেগুজে সেখানে নাচতে গিয়েছিল। প্রকাণ্ড ঘর, গ্যাসের আলোয় আলোকাকীর্ণ, চার দিকে ব্যান্ড বাজছে— ছ-সাত শ' সুন্দরী, সুপুরুষ। ঘরে ন স্থানং তিল ধারয়েৎ— চাঁদের হাট তো তাকেই বলে। এক-একটা ঘরে দলে দলে স্ত্রীপুরুষে হাত ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে নাচ আরম্ভ করেছে, যেন জোড়া জোড়া পাগলের মতো। এক-একটা ঘরে এমন সত্তর আশি জন যুগলমূর্তি; এমন ঘেঁষাঘেঁষি যে কে কার ঘাড়ে পড়ে তার ঠিক নেই। একটা ঘরে শ্যাম্পেনের কুরুক্ষেত্র পড়ে গিয়েছে, মদ্যমাংসের ছড়াছড়ি, সেখানে লোকারণ্য; এক-একটা মেয়ের নাচের বিরাম নেই, দু-তিন ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত তার পা চলছে। একজন মেম তুষার-কুমারী সেজে গিয়েছিলেন, তাঁর সমস্তই শুভ্র, সর্বাঙ্গে পুঁতির সজ্জা, আলোতে ঝকমক করছে। একজন মুসলমানিনী সেজেছিলেন; একটা লাল ফুলো ইজের, উপরে একটা রেশমের পেশোয়াজ, মাথায় টুপির মতো— এ কাপড়ে তাঁকে বেশ মানিয়ে গিয়েছিল। একজন সেজেছিলেন আমাদের দিশি মেয়ে, একটা শাড়ি আর একটা কাঁচুলি তাঁর প্রধান সজ্জা, তার উপরে একটা চাদর, তাতে ইংরেজি কাপড়ের চেয়ে তাঁকে ঢের ভালো দেখাচ্ছিল। একজন সেজেছিলেন বিলিতি দাসী। আমি বাংলার জমিদার সেজেছিলেম, জরি দেওয়া মখমলের কাপড়, জরি দেওয়া মখমলের পাগড়ি প্রভৃতি পরেছিলেম।'

১৩

বই-মালিনী

রবি বিলেতে চলে যাওয়ার পর আন্নার আর কিছুতে মন লাগে না। রকমসকম দেখে আত্মারাম পাণ্ডুরং কিছুদিনের জন্য মেয়েকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। বন্ধু মনোমোহন ঘোষের বাড়িতে উঠেছেন তাঁরা। তারপর একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এলেন মহর্ষি ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে। পাণ্ডুরং বসলেন বৈঠকখানায় দেবেন ঠাকুরের কাছে আর আন্না চলে গেলেন বাড়ির ভেতরে মেয়েমহলে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলকে আপন করে নিতে তাঁর জুড়ি নেই। অন্দরে তেতলার ঘরে সহজভঙ্গিতে কাদম্বরীর গলা জড়িয়ে খাটে আধ-শোওয়া হয়ে গল্প করতে থাকেন আন্না। রবির ঘর কোনটা, রবি সারাদিন কী করে? কোথায় তাঁর লেখার টেবিল, কী খেতে ভালবাসে— এ-সব অজস্র প্রশ্নে তিনি পাগল করে দেন কাদম্বরীকে।

কাদম্বরী তাঁর চাঁপার কলির মতো আঙুলে আন্নার গোলাপি থুতনি তুলে ধরে জানতে চান, আন্না তুমি মরেছ, রবি তোমার সব চুরি করেছে মনে হচ্ছে!

আন্না লজ্জা পান, মুখ ঘুরিয়ে বলেন, আহা, সে তো জানে শুধু নতুনবউঠান আর নতুনবউঠান। তুমিই তার মাথা খেয়েছ। তোমাকে আমি খুব ঈর্ষা করি।

কাদম্বরী ছাড়েন না, নিজের অস্বস্তি গোপন করে আন্নাকে বলেন, ও-সব বলে পাশ কাটানো যাবে না, সত্যি বলো, তুমি রবিকে ভালবাসো?

লজ্জায় আন্নার মুখ নুয়ে পড়ে কাদম্বরীর বুকে। বলেন, আমি আগে কখনও এত কাছ থেকে কোনও কবিকে দেখিনি! তাঁকে ভাল না বেসে পারা যায় না!

আন্নার চোখে রবির এক নতুন চেহারার ছায়া দেখেন কাদম্বরী, সে আর তাঁর সেই কিশোর উপাসক নয়, সে যে কোন অজান্তে এক রমণীমোহন পুরুষ হয়ে উঠেছে কাদম্বরী জানতেও পারেননি। মনের কোণে কোথায় ঈষৎ খচখচ করে, এতদিনকার একান্তই তাঁর আঁচলে বাঁধা পোষা প্রাণীটি এখন অন্যত্র রাজ্যবিস্তার করছে! অন্য নারীর চোখের তারায় রবির ছায়া তিরতির করে কাঁপতে দেখে কাদম্বরী উদাস হয়ে যান একটু। কাদম্বরীর ছায়া কি কারও চোখের মণিতে ছায়া ফেলে?

পাণ্ডুরং মেয়ের মনের অবস্থা বুঝতে পারছেন বলেই কলকাতায় এসেছেন। রবি চলে যাওয়ার পর থেকেই আন্না খুব উদাস। রবি যাওয়ার সময়ে যেন আন্নার হৃদয়টিকেও সঙ্গে নিয়ে গেছেন। এদিকে এত যুবক তাঁর কৃপাপ্রার্থী, কিন্তু তাদের কাউকেই ঠিক মনে ধরেনি এই চঞ্চলা কন্যার। পাণ্ডুরং দেবেন ঠাকুরের সঙ্গে একথা-সেকথার পর জানতে চান রবির বিয়ের কথা কিছু ভাবছেন কি না মহর্ষি। দেবেন্দ্র পাণ্ডুরংকে যত্নআত্তি করলেও রবির বিয়ের কথায় সায় দিতে পারেন না। রবি এখন বিলেতে পড়তে গেছে। আগে সে-সব সম্পূর্ণ হোক, কাজ শুরু করুক, তারপর ভাবা যাবে। তা ছাড়া এই মরাঠি ভদ্রলোকের মনের ইচ্ছে অনুমান করলেও কোনওদিনই তাতে রাজি হতে পারবেন না দেবেন্দ্র। একে কন্যা বাঙালিনি নয় তার ওপর বয়সে রবির চেয়ে প্রায় পাঁচ-ছ' বছরের বড়। গুজরাতি মরাঠিদের মধ্যে এমন অসম-বয়সি বিয়ে হলেও বাঙালিদের মধ্যে চল নেই। দেবেন ঠাকুর নানা কথায় বিয়ের প্রসঙ্গটি লঘু করে দেন। পাণ্ডুরং বুদ্ধিমান পুরুষ, বুঝতে পারেন এখানে বিয়ের সম্ভাবনা কম। বিষণ্ণ মনে আন্নাকে নিয়ে তিনি ঠাকুরবাড়ি থেকে বিদায় নেন।

আন্নার ছেড়ে যাওয়া বিষাদ যেন কাদম্বরীর ওপর ভর করে। তেতলার একলা ঘরে কখনও বিছানায় কখনও মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে তাঁর দিনরাত যেন আর কাটতে চায় না। এখন আর ছাদের আসর বসে না। রবি চলে গেছে, অক্ষয় বা বিহারীলাল আর আসেন না। আসবেন কার কাছে? জ্যোতি এখন নাটক নিয়ে এমন মেতেছেন যে ঘরে আসার সময়ই হয় না। যখন ঘরে থাকেন, তখনও নতুন নাটক লেখায় ব্যস্ত। 'অশ্রুমতী' মঞ্চস্থ হচ্ছে হইচই করে। জ্যোতি সারাদিন রিহার্সালেই পড়ে থাকেন। নায়িকাকে পার্ট শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। এখানেই কাদম্বরীর ব্যথা।

ব্যথা আছে জ্যোতির বুকেও। বিনোদিনী বেঙ্গল থিয়েটার ছেড়ে চলে

গেছেন, সুতরাং অশ্রুমতীর নায়িকার ভূমিকায় তাঁকে পাওয়া গেল না। সুকুমারী বা বনবিহারিণীকে অনেক শিখিয়েও যেন বিনোদিনীর মতো হয় না। জ্যোতি ছুটে ছুটে কিশোরী বিনোদিনীর অভিনয় দেখতে যান ন্যাশনাল থিয়েটারে। কী তার অভিনয়! 'বিষবৃক্ষে' কুন্দনন্দিনী, 'সধবার একাদশী'তে কাঞ্চন, 'পলাশীর যুদ্ধে' ব্রিটানিয়া এবং 'মেঘনাদ বধে' একসঙ্গে সাতটি চরিত্রে পার্ট করে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। গিরিশ ঘোষের সাহচর্যে এবং নিজের ঐকান্তিক নিষ্ঠায় অন্যসব নায়িকাদের ছাপিয়ে ইতিমধ্যেই আগুনের শিখার মতো স্টেজ জ্বালিয়ে দিচ্ছেন বিনোদিনী। জ্যোতি বারবার তাঁকে অনুনয় করেন অশ্রুমতীর নায়িকা হওয়ার জন্য, কিন্তু বিনোদিনী ফিরিয়ে দেন। গিরিশ ঘোষকে ছেড়ে বেঙ্গল থিয়েটারে ফিরে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব না। তবে কি বিনোদিনী গিরিশের প্রেমে পড়েছে? জ্যোতির মনটা ঈর্ষায় চিনচিন করে ওঠে।

রূপা আর কাদম্বরী বসে বসে কখনও রবির চিঠি পড়েন, কখনও থিয়েটারের রিভিউ। সেদিন বিনোদিনীর রূপগুণের ব্যাখ্যান পড়তে পড়তে হঠাৎ কাদম্বরী দেখলেন রূপা কিছুই শুনছে না, হাঁ করে তাকিয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে।

কাদম্বরী পত্রিকা নামিয়ে রেখে বালিশে গা এলিয়ে বলেন, এই রূপা, কী দেখছিস রে অমন হাঁ করে?

রূপা বলে, তোমাকে দেখছি। দেখছি আর অবাক হয়ে ভাবছি এমন অপূর্ব রূপ তোমার, এমন শরীরের গড়ন, যেন হঠাৎ আসা আলোর মতো চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তবু কেন জ্যোতিদাদার ঘরে মন টেঁকে না!

তুই যেন জানিস না, তিনি এখন বিনোদিনী, সুকুমারী, বনবিহারিণীদের রূপে মজেছেন! কাদম্বরী ঝামটা মেরে বলেন, আমার দিকে চাইবার তাঁর সময় কোথায়? তবে আমাকে নিয়ে তুই বেশি বেশি আদিখ্যেতা করিস, সত্যি যদি অমন রূপসি হতাম তা হলে কি একা ঘরে পচে মরি?

ওমা, আমি কেন খামোখা মিথ্যে বলব নতুনবউঠান, রূপাও ঝংকার দেয়, তোমার বর যদি এখন আগুন দেখে পতঙ্গের মতো ঝাঁপ দেন, তাতে তোমার কমলহিরের মতো রূপ তো আর মিথ্যে হয়ে যায় না।

তা হলে আমাকে ফেলে তিনি সেখানে ছুটে যান কেন? সেই বারাঙ্গনা নটীরা কি রূপে রুচিতে শিক্ষায় আমাকে ছাপিয়ে গেছে? সে কি বিহারীলালের কবিতা পড়ে?

শোনো বউঠান, রূপা জোর গলায় বলে, স্টেজের নটীরা সেজেগুজে সবার সামনে তাদের রূপ মেলে ধরছে, কিন্তু তারা কেউ তোমার চেয়ে রূপসি'এ আমি বিশ্বাস করি না।

কাদম্বরী আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ান, গায়ের কাপড় ফেলে দিয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন তাঁরও মনে হয়, রূপা সত্যি বলছে। নিজের লাবণ্য উচ্ছ্বাসে তাঁর নিজেরই ঘোর লাগে যেন। কিন্তু বিনোদিনী, সে কেমন দেখতে? জানতেই হবে কাদম্বরীকে। অধীর হয়ে ওঠেন তিনি, বলেন, অনেকদিন তোর নতুনদাদাকে বলেছি থিয়েটারে নিয়ে যেতে, কিছুতেই সাহস পাননি বাবামশায়ের ভয়ে। চল তুই আর আমি লুকিয়ে বিনোদিনীকে দেখে আসি একদিন।

যাবে, সত্যি যাবে বউঠান? রূপাও উত্তেজিত হয়ে ওঠে নিষিদ্ধের স্বাদ নেওয়ার এমন লোভনীয় প্রস্তাবে।

প্রথমে মালিনীকে নিয়ে তুই বরং দেখে আয়, কাদম্বরী দ্বিধা করেন, আমি গিয়ে জানতে পারলে তো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে বাকি রাখবে সকলে। এমনিতেই বাঁজা বলে উঠতে বসতে খোঁটা দেয়, তার ওপর এখন স্বামীসোহাগ কমে গিয়েছে ভেবে সবাই যেন আরও তেড়ে আসছে। যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ভয় পাচ্ছি রে।

কাদম্বরীকে জড়িয়ে ধরে রূপা বলে, না বউঠান, তা হবে না। চলো না, এমন ব্যবস্থা করব লুকিয়ে যাওয়ার, কেউ জানতে পারলে তো!

কী ব্যবস্থা করবি শুনি? কাদম্বরী আশার আলোর খোঁজে মরিয়া যেন। তুই কী করে করবি? খবরদার হ্যারিসাহেবকে এর মধ্যে টেনে আনিস না যেন!

না না, বউঠান, ওই যে তুমি বললে মালিনীর কথা, আমি ওকেই ডেকে আনছি। ওই সব ব্যবস্থা করে দেবে। আমরা তিনজনেই গোপনে দেখে আসি চলো।

ধুর যত সব অসম্ভবের আশা, কাদম্বরী প্রসঙ্গ পালটাতে চান ভয় পেয়ে। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মালিনী এসে হাজির। সব শুনে সে এক অদ্ভুত কথা বলে বসল— নতুনবউঠান জানো, ভবিষ্যতে তোমাকে নিয়ে যে গল্পটা লেখা হবে, মালিনী রহস্য করে বলে, তার লাইনগুলো এখনই তোমাকে শোনাতে পারি, যদি শুনতে চাও তো।

সে আবার কী রে মালিনী, ভবিষ্যতের লেখা আবার কী, কাদম্বরী বলেন, তুই কি নিজেই আজকাল আফিম খেয়ে গল্পটল্প লিখছিস নাকি?

আমি কেন লিখব, তোমার প্রিয়জনদের মধ্যেই কেউ হয়তো লিখবে, আমি চোখ বুজে বসলেই সে লেখার অক্ষরগুলো অন্ধকারের মধ্যে জ্বলজ্বল করে চোখের সামনে ভেসে উঠছে, শুনবে, শোনোই না একটু— 'গিরিবালার সৌন্দর্য অকস্মাৎ আলোকরশ্মির ন্যায়, বিস্ময়ের ন্যায়, নিদ্রাভঙ্গে চেতনার ন্যায়,... তাহার সন্তানাদি নাই, ধনিগৃহে তাহার কোনো কাজকর্মও নাই— সে কেবল নির্জনে প্রতিদিন আপনার মধ্যে আপনি সঞ্চিত হইয়া শেষকালে আপনাকে আর ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। স্বামী আছে কিন্তু স্বামী তার আয়ত্তের মধ্যে নাই। গিরিবালা বাল্যকাল হইতে যৌবনে এমন পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিয়াও কেমন করিয়া তাহার স্বামীর চক্ষু এড়াইয়া গেছে।

বরঞ্চ বাল্যকালে সে তাহার স্বামীর আদর পাইয়াছিল।... গোপীনাথ যাহাকে দাসখত লিখিয়া দিয়াছে তাহার নাম লবঙ্গ— সে থিয়েটারে অভিনয় করে— সে স্টেজের উপর চমৎকার মূর্ছা যাইতে পারে— সে যখন সানুনাসিক কৃত্রিম কাঁদুনির স্বরে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া টানিয়া টানিয়া আধ-আধ উচ্চারণে 'প্রাণনাথ' 'প্রাণেশ্বর' করিয়া ডাক ছাড়িতে থাকে তখন পাতলা ধুতির উপর ওয়েস্টকোট পরা, ফুলমোজামণ্ডিত দর্শকমণ্ডলী 'এক্সেলেন্ট' 'এক্সেলেন্ট' করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে।'

কাদম্বরী উসখুস করে আর থাকতে না পেরে এক ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন, যাঃ, কীসব গাঁজাখুরি গল্প বলছিস মালিনী, তোদের নতুনদাদা কি ওরকম ছাপোষা পোশাক পরেন, না কি আমার নাম গিরিবালা? কেন এ-সব গিরিবালা গোপীনাথ লবঙ্গদের গল্প আমাকে শোনাচ্ছিস?

তুমি চিনতে পারলে না নতুনবউঠান, মালিনী বলে, ওটা তো তোমারই গল্প। দেখছ না সবটাই তোমার জীবনের আদলে লেখা!

সে তো তুই ইনিয়ে বিনিয়ে লিখেছিস, কাদম্বরী ফুঁসে ওঠেন, তোকে এত বিশ্বাস করি মালিনী, তুই কী করে পারলি আমাকে নিয়ে এমন কেচ্ছার গল্প ফাঁদতে? আমার যন্ত্রণা তোর কাছে হাসির খোরাক হল? ছিঃ!

মালিনী কাদম্বরীর পায়ে মাথা রেখে বলে, নতুনবউঠান বিশ্বাস করো, আমি এ-সব মনে মনে ভাবিনি। আমি চোখ বুজলে অনেক অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটে, না-লেখা অক্ষরগুলো নেচে বেড়ায়, আমি পড়তে পারি। আজ তোমার সামনে বসতেই আমার মাথায় হুড়মুড় করে এ-সব লাইনগুলো আসছে। এ

গল্প আমি লিখিনি, বিশ্বাস করো, এ ভাষায় আমি ভাবতেই পারি না। কে লিখবে কখন লিখবে আমি জানি না। কিন্তু জানি এ লেখা সত্যি।

যা যা, তুই আমার চোখের সামনে থেকে যা তো মালিনী, কাদম্বরী ওকে আর সইতে পারেন না, যত সব ভুতুড়ে কাণ্ড। রূপাকে বলেন, তুই রবির চিঠিগুলো আরেকবার পড়ে শোনা তো রূপা।

আর কতবার শুনবে নতুনবউঠান, রূপা যেন মজা পায়, পড়ে পড়ে আমারই তো মুখস্থ হয়ে গেল।

তবু পড়, কাদম্বরী বলেন, আমার ভাল লাগে, সেই যে মিস্টার আর মিসেস বেকার সারাক্ষণ ঝগড়া করেন, সেই চিঠিটা পড় না, বেশ মজা হবে। রূপা বিছানার ওপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে পড়তে থাকে—

'আমি দিনকতক আমার শিক্ষকের পরিবারের মধ্যে বাস করেছিলুম। সে বড়ো অদ্ভুত পরিবার। মিস্টার ব— মধ্যবিত্ত লোক। তিনি লাটিন ও গ্রীক খুব ভালোরকম জানেন। তাঁর ছেলেপিলে কেউ নেই; তিনি, তাঁর স্ত্রী, আমি, আর একজন দাসী, এই চারজন মাত্র একটি বাড়িতে থাকতুম। কর্তা আধবুড়ো লোক, অত্যন্ত অন্ধকার মূর্তি, দিনরাত খুঁতখুঁত খিট্‌খিট্ করেন, নীচের তলায় রান্নাঘরের পাশে একটি ছোট্ট জানলাওয়ালা দরজা-বন্ধ অন্ধকার ঘরে থাকেন। একে তো সূর্যকিরণ সে ঘরে সহজেই প্রবেশ করতে পারে না, তাতে জানলার উপরে একটা পর্দা ফেলা, চার দিকে পুরোনো ছেঁড়া ধুলোমাখা নানা প্রকার আকারের ভীষণদর্শন গ্রীক-লাটিন বইয়ে দেয়াল ঢাকা, ঘরে প্রবেশ করলে একরকম বদ্ধ হাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠতে হয়। এই ঘরটা হচ্ছে তাঁর স্টাডি, এইখানে তিনি পড়েন ও পড়ান। তাঁর মুখ সর্বদাই বিরক্ত। আঁট বুটজুতো পরতে বিলম্ব হচ্ছে, বুটজুতোর উপর চটে ওঠেন; যেতে যেতে দেয়ালের পেরেকে তাঁর পকেট আটকে যায়, রেগে ভুরু কুঁকড়ে ঠোঁট নাড়তে থাকেন। তিনি যেমন খুঁতখুঁতে মানুষ, তাঁর পক্ষে তেমনি খুঁতখুঁতের কারণ প্রতি পদে জোটে। আসতে যেতে হুঁচট খান, অনেক টানাটানিতে তাঁর দেরাজ খোলে না, যদি বা খোলে তবু যে-জিনিস খুঁজছিলেন তা পান না। এক-এক দিন সকালে তাঁর স্টাডিতে এসে দেখি, তিনি অকারণে বসে বসে ভ্রূকুটি করে উঁ আঁ করছেন, ঘরে একটি লোক নেই। কিন্তু ব— আসলে ভালোমানুষ— তিনি খুঁতখুঁতে বটে, রাগী নন; খিট্‌খিট্ করেন, কিন্তু ঝগড়া করেন না। নিদেন

তিনি মানুষের উপর রাগ প্রকাশ করেন না, টাইনি বলে তাঁর একটা কুকুর আছে তার উপরেই তাঁর আক্রোশ। সে একটু নড়লে চড়লে তাকে ধমকাতে থাকেন, আর দিনরাত তাকে লাথিয়ে লাথিয়ে একাকার করেন। তাঁকে আমি প্রায় হাসতে দেখি নি। তাঁর কাপড়চোপড় ছেঁড়া অপরিষ্কার। মানুষটা এইরকম। তিনি এককালে পাদরি ছিলেন; আমি নিশ্চয় বলতে পারি, প্রতি রবিবারে তাঁর বক্তৃতায় তিনি শ্রোতাদের নরকের বিভীষিকা দেখাতেন। তাঁর এত কাজের ভিড়, এত লোককে পড়াতে হত যে, এক-এক দিন তিনি ডিনার খেতে অবকাশ পেতেন না। এক-এক দিন তিনি বিছানা থেকে উঠে অবধি রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এমন অবস্থায় খিটখিটে হয়ে ওঠা কিছু আশ্চর্য নয়। গৃহিণী খুব ভালোমানুষ, রাগী উদ্ধত নন, এককালে বোধ হয় ভালো দেখতে ছিলেন, যত বয়স তার চেয়ে তাঁকে বড়ো দেখায়, চোখে চশমা, সাজগোজের বড়ো আড়ম্বর নেই। নিজে রাঁধেন, বাড়ির কাজকর্ম করেন, ছেলেপিলে নেই, সুতরাং কাজকর্ম বড়ো বেশি নয়। আমাকে খুব যত্ন করতেন। খুব অল্প দিনেতেই বোঝা যায় যে, দম্পতির মধ্যে বড়ো ভালোবাসা নেই, কিন্তু তাই বলে যে দুজনের মধ্যে খুব বিরোধ ঘটে তাও নয়, অনেকটা নিঃশব্দে সংসার চলে যাচ্ছে। মিসেস ব— কখনো স্বামীর স্টাডিতে যান না; সমস্ত দিনের মধ্যে খাবার সময় ছাড়া দুজনের মধ্যে দেখাশুনা হয় না, খাবার সময়ে দুজনে চুপচাপ বসে থাকেন। খেতে খেতে আমার সঙ্গে গল্প করেন, কিন্তু দুজনে পরস্পর গল্প করেন না। ব—র আলুর দরকার হয়েছে, তিনি চাপা গলায় মিসেসকে বললেন, 'some potatoes' (please কথাটা বললেন না কিংবা শোনা গেল না)। মিসেস ব— বলে উঠলেন 'I wish you were a little more polite'। ব— বললেন I did say 'please'; মিসেস ব— বললেন 'I did not hear it'; ব— বললেন 'it was no fault of mine'। এইখানেই দুই পক্ষ চুপ করে রইলেন। মাঝে থেকে আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুতে পড়ে যেতেম। একদিন আমি ডিনারে যেতে একটু দেরি করেছিলেম, গিয়ে দেখি, মিসেস ব—, ব—কে ধমকাচ্ছেন, অপরাধের মধ্যে তিনি মাংসের সঙ্গে একটু বেশি আলু নিয়েছিলেন। আমাকে দেখে মিসেস ক্ষান্ত হলেন, মিস্টার সাহস পেয়ে শোধ তোলবার জন্যে দ্বিগুণ করে আলু নিতে লাগলেন, মিসেস তাঁর দিকে নিরুপায় মর্মভেদী কটাক্ষপাত করলেন। দুই পক্ষই দুই পক্ষকে যথারীতি ডিয়ার ডার্লিং বলে ভুলেও সম্বোধন করেন না, কিংবা কারও ক্রিশ্চান নাম ধরে

ডাকেন না, পরস্পর পরস্পরকে মিস্টার ব— ও মিসেস ব— বলে ডাকেন। আমার সঙ্গে মিসেস হয়তো বেশ কথাবার্তা কচ্ছেন, এমন সময় মিস্টার এলেন, অমনি সমস্ত চুপচাপ। দুই পক্ষেই এইরকম। একদিন মিসেস আমাকে পিয়ানো শোনাচ্ছেন, এমন সময় মিস্টার এসে উপস্থিত; বললেন, 'When are you going to stop?' মিসেস বললেন, 'I thought you had gone out!' পিয়ানো থামল। তার পরে আমি যখন পিয়ানো শুনতে চাইতেম মিসেস বলতেন, 'that horrid man যখন বাড়িতে না থাকবেন তখন শোনাব,' আমি ভারি অপ্রস্তুতে পড়ে যেতুম। দুজনে এইরকম অমিল অথচ সংসার বেশ চলে যাচ্ছে। মিসেস রাঁধছেন বাড়ছেন, কাজকর্ম করছেন, মিস্টার রোজগার করে টাকা এনে দিচ্ছেন; দুজনে কখনো প্রকৃত ঝগড়া হয় না, কেবল কখনো কখনো দুই-এক বার দুই-একটা কথা-কাটাকাটি হয়, তা এত মৃদুস্বরে যে পাশের ঘরের লোকের কানে পর্যন্ত পৌঁছয় না। যা হোক আমি সেখানে দিনকতক থেকে বিব্রত হয়ে সে অশান্তির মধ্যে থেকে চলে এসে বেঁচেছি।'

শেষ পর্যন্ত রূপা আর মালিনী মিলে কাদম্বরীকে রাজি করিয়েই ফেলল। বিনোদিনীকে স্বচক্ষে দেখার জন্য কাদম্বরীও ছটফট করছিলেন সেই 'সরোজিনী' নাটকের সময় থেকে। কৌতূহল আর যেন বাধ মানছে না।

এক সন্ধ্যায় নিষিদ্ধ কাজের গোপন উত্তেজনায় দুরু দুরু বুকে আটপৌরে ধনেখালি শাড়ির ছদ্মবেশে ঘোমটায় মাথা ঢেকে রূপা আর কাদম্বরী বেরিয়ে পড়লেন ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্দেশে অ্যাডভেঞ্চারে।

'অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় সুধোকে লইয়া (গিরিবালা) গোপনে থিয়েটার দেখিতে গেল। নিষিদ্ধ কাজের উত্তেজনা বেশি। তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যে-এক মৃদু কম্পন উপস্থিত হইয়াছিল সেই কম্পনাবেগে এই আলোকময়, লোকময়, বাদ্যসংগীত-মুখরিত, দৃশ্যপটশোভিত রঙ্গভূমি তাহার চক্ষে দ্বিগুণ অপরূপতা ধারণ করিল।... সেদিন মানভঞ্জন অপেরা অভিনয় হইতেছে... রাধার দুর্জয় মান হইয়াছে; সে মানসাগরে কৃষ্ণ আর কিছুতেই থই পাইতেছে না— কত অনুনয় বিনয় সাধাসাধি কাঁদাকাঁদি, কিছুতেই কিছু হয় না। তখন গর্বভরে গিরিবালার বক্ষ ফুলিতে লাগিল। কৃষ্ণের এই লাঞ্ছনায় সে যেন মনে মনে রাধা হইয়া নিজের অসীম প্রতাপ নিজে অনুভব করিতে লাগিল। কেহ তাহাকে কখনো এমন করিয়া সাধে নাই: সে অবহেলিত অবমানিত পরিত্যক্ত

স্ত্রী, কিন্তু তবু সে এক অপূর্ব মোহে স্থির করিল যে, এমন করিয়া কাঁদাইবার ক্ষমতা তাহারও আছে।... অবশেষে যবনিকাপতন হইল, গ্যাসের আলো ম্লান হইয়া আসিল, দর্শকগণ প্রস্থানের উপক্রম করিল; গিরিবালা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসিয়া রহিল। এখান হইতে উঠিয়া যে বাড়ি যাইতে হইবে এ কথা তাহার মনে ছিল না।... এখন হইতে সে প্রতি সপ্তাহেই থিয়েটারে যাইতে আরম্ভ করিল।'

প্রতি সপ্তাহে না হলেও কাদম্বরী তাঁর দুঃসাহসী সঙ্গিনীদের নিয়ে আরও দু'-চারবার ন্যাশনালে গোপন অ্যাডভেঞ্চার করলেন। ঠাকুরবাড়ির কেউ এই থিয়েটার-কাণ্ড টের পেল না সত্যিই।

তাঁরা মেতেছিলেন অশ্রুমতী নিয়ে। এত শোরগোল পড়ে গেছে আর বাড়ির মেয়েরা দেখতে পাবে না! ঠাকুরবাড়ির আঙিনায় একদিন অভিনয়ের ব্যবস্থা হল। কিন্তু তাতে সকলের মন ভরলেও থিয়েটারের আবহাওয়া পুরোপুরি উপভোগ করা গেল না যেন। কিছুদিনের মধ্যেই গুণেন ঠাকুরের আদেশে ১৮৭৯ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর পুরো বেঙ্গল থিয়েটার ভাড়া নেওয়া হল শুধু ঠাকুর পরিবারের জন্য। আগে দু'-একজন লুকিয়ে চুরিয়ে দেখে থাকতেও পারেন কিন্তু অভিজাত মেয়েদের সেই প্রথম সাড়ম্বরে থিয়েটারে পদার্পণ। হলের বেঞ্চি সরিয়ে বাড়ি থেকে আনা কার্পেট, আরামচেয়ার ও নানা আসবাবে হল সেজে উঠল। ফুলের মালা, আলবোলা, মেয়েদের চিকের ব্যবস্থাও বাদ গেল না। ৫ এবং ৬ নং বাড়ির সকলেই এদিন মহা উৎসাহে থিয়েটার দেখতে গেলেন। কাদম্বরীও।

সেদিন নায়িকা হয়েছেন সুকুমারী। অন্যরা মুগ্ধ বিস্ময়ে নাটক উপভোগ করলেন কিন্তু কাদম্বরী আনমনা। তিনি ন্যাশনালে দেখে আসা বিনোদিনীর রূপমাধুর্যের স্মৃতিতে ঈর্ষাতুর বিষণ্ণতায় ডুবে রইলেন। জ্যোতির মুখে বিনোদিনীর প্রশংসাই তো সবচেয়ে বেশি শুনতে হয় তাঁকে!

আন্না তড়খড় ভগ্ন মন নিয়ে বোম্বাই ফিরে গেছেন। রবির প্রতি তীব্র অভিমানে তাঁকে চিঠি লেখেন না, কিন্তু কাদম্বরীকে দু'-একটা চিঠি পাঠিয়ে নিজের কথা জানান। রবির দেওয়া নলিনী নামটি অবশ্য তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। আনাবাই নলিনী নাম নিয়ে তিনি পত্র-পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করেন।

মনখারাপের মধ্যেও আনা বুঝতে পারছিলেন রবি অধরাই রয়ে যাবেন। কাদম্বরী চিঠিতে জানতে পারেন, আন্নার জীবনে এক নতুন পুরুষের

কথা। দু'জনের প্রথম দেখা ডবলিন শহরে, প্রায় প্রথম সাক্ষাতেই প্রেম। লিটলডেল তখন বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষ। তরুণ স্কটিশ অধ্যাপক হ্যারল্ড লিটলডেলের সঙ্গে নভেম্বরের এক শীতসন্ধ্যায় বিয়ে হয়ে গেল আন্নার।

আন্না হয়তো এই ভাল করল, কাদম্বরী হাতের তাস ফেলে বললেন। রূপা আর স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে বিছানার ওপর মাদুর পেতে গোল হয়ে বসে তাস খেলছেন তখন।

এ-কথা বলছ কেন? স্বর্ণ জানতে চান, ভাল খারাপ কীসে মাপছ নতুনবউঠান? রবির সঙ্গে বিয়ে হলেই বা কী খারাপ হত?

সে তো বাবামশায় রাজি হলেন না, কাদম্বরী বলেন। আর রবি কি তা চায়? চাইলে তো কিছু বলত আন্নাকে। আর আমি ভাবছিলাম, এ বাড়ির ছেলেরা তো অন্য নারীর রূপের মোহে স্ত্রীকে ভুলে যেতে পারে চট করে, তার চেয়ে ওর সাহেব বর ভাল।

এ তোমার অভিমানের কথা বউঠান, স্বর্ণ যেন মানতে চান না জ্যোতির প্রতি কাদম্বরীর চাপা ক্ষোভের কারণটা। ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের চরিত্র খুব বলিষ্ঠ। এদের মতো সংবেদনা আর কোন বাড়িতে পাবে?

রূপা আর ক্ষোভ চেপে রাখতে পারে না, স্বর্ণদিদি তুমি সব জানো না। রোজ কত সেজেগুজে অপেক্ষা করে নতুনবউঠান, আর নতুন দাদা ঘরে এলেও টাকাপয়সা নিয়ে পোশাক পালটে আতর লাগিয়ে আবার চলে যান, বউঠানের দিকে তাকানোর দু' মুহূর্ত ফুরসত নেই যেন।

কাল কী হল জানো ঠাকুরঝি? কাদম্বরীর চোখে জল ভরে আসে, আমি ওঁর পথ আটকে বললাম, যেতে দেব না, আজ সন্ধেটা আমার সঙ্গে থাকো।

তিনি বললেন, ছাড়ো বউ, আমাকে যেতেই হবে।

আমি আঁকড়ে ধরে বললাম, দেখি কেমন করে যাও!

তিনি বললেন, জেদ কোরো না।

আমি বললাম, করব।

তিনি নিষ্ঠুরভাবে আমার হাতটা ছাড়িয়ে দিলেন। ঠেলা লেগে আমি পড়ে গেলাম। তিনি চলে গেলেন। ওই কি আমার সেই স্বামী, যিনি লোকনিন্দা উপেক্ষা করে দিনের পর দিন আমাকে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে ময়দানে ঘুরেছেন, কত কাব্যপাঠ করে শুনিয়েছেন, গান শুনিয়েছেন? আমি যেন সেই স্বামীকে চিনতে পারি না।

বই-মালিনী বইয়ের ঝাঁপি নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়ায়, বলে আজ তোমার ঘরে ঢুকব, না, ঢুকব না নতুনবউঠান?

মেঘলা আকাশের মতো টলটলে চোখ তুলে তাকান কাদম্বরী। মালিনী এসেছিস, আয়, তোর কথাই ভাবছিলাম। তোর সেই গিরিবালার তারপর কী হল সেদিন শোনা হয়নি।

তুমি তো সেদিন রাগ করে তাড়িয়ে দিলে আমাকে, মালিনীর স্বর একটু অভিমানী শোনায়।

তা হোক, তুই শোনা মালিনী, কাদম্বরী কৌতূহলী, আমি সেদিন থেকে মাঝে মাঝেই ভাবি গিরিবালার কী হল!

'তখন রাত্রি দশটা। বাড়ির আর সকলে আহারাদি সমাধা করিয়া ঘুমাইতে গিয়াছে। এমন সময় আতর মাখিয়া, উড়ানি উড়াইয়া, হঠাৎ গোপীনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল— সুধো অনেকখানি জিভ কাটিয়া সাত হাত ঘোমটা টানিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।

গিরিবালা ভাবিল, তাহার দিন আসিয়াছে। সে মুখ তুলিয়া চাহিল না। সে রাধিকার মতো গুরুমানভরে অটল হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু দৃশ্যপট উঠিল না;... সংগীতহীন নীরসকণ্ঠে গোপীনাথ বলিল, 'একবার চাবিটা দাও দেখি।'... গিরিবালা সমস্ত মান বিসর্জন দিয়া উঠিয়া পড়িল। স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, 'চাবি দিব এখন, তুমি ঘরে চল।'...

গোপীনাথ কহিল, 'আমি বেশি দেরি করতে পারিব না, তুমি চাবি দাও।'...

গিরিবালা প্রস্তরমূর্তির মতো শক্ত হইয়া, দরজা ধরিয়া, ছাদের দিকে চাহিয়া, দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যর্থমনোরথ গোপীনাথ রাগে গরগর করিতে করিতে আসিয়া বলিল, 'চাবি দাও বলিতেছি, নহিলে ভালো হইবে না।'

গিরিবালা উত্তরমাত্র দিল না। তখন গোপী তাহাকে চাপিয়া ধরিল এবং তাহার হাত হইতে বাজুবন্ধ, গলা হইতে কণ্ঠী, অঙ্গুলি হইতে আংটি ছিনিয়া লইয়া তাহাকে লাথি মারিয়া চলিয়া গেল।'

এই পর্যন্ত শুনেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন কাদম্বরী। ওরে একটু থাম তুই মালিনী, গিরিবালার কষ্ট আমি আর সইতে পারছি না।

রূপা কাদম্বরীকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে চায়। কাদম্বরীও পরম আশ্রয়ের মতো তার কাঁধে মাথা রাখেন।

স্বর্ণ বলে ওঠেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না মালিনী, তুই কী একটা আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসলি আর নতুনবউঠান এমন কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন! এ তো তোর বটতলার গল্প নয়, ভাষার কৌশল বেশ ভাল, বর্ণনাও চমৎকার। এ গল্প কে লিখেছে?

আমি জানি না স্বর্ণদিদি, মালিনীর অকপট স্বীকারোক্তি। নতুনবউঠানের সামনে এলেই আজকাল আমার মাথায় এই গল্পের লাইনগুলো কিলবিল করে।

সেকী রে, স্বর্ণ অবাক হন, তুই এমন চোখ বুজে গড়গড়িয়ে কী বলে যাচ্ছিস, আরেকটু শোনা তো!

শোনো, আমি ছবির মতো দেখতে পাচ্ছি, মালিনী উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায়, গোপীনাথ থিয়েটারে গিয়ে গোলমাল পাকাচ্ছে, স্টেজের ওপর ফুলের তোড়া ছুড়ে দিচ্ছে, লবঙ্গ লবঙ্গ বলে চেঁচাচ্ছে। উপায় না দেখে থিয়েটারের মালিকরা গোপীনাথকে হল থেকে বের করে দিল। সেই রাগে থিয়েটারের দলকে শিক্ষা দেবার জন্য লবঙ্গকে নিয়ে পরদিন বোটে চড়ে পালিয়ে গেল গোপী।

ওমা, কী কাণ্ড, রূপাও উত্তেজিত, তারপর কী হল, আমার আর তর সইছে না মালিনীদিদি।

স্বর্ণ বিরক্ত হন, আঃ রূপা তুই থাম তো। মালিনী এভাবে নিজের ভাষায় বলিস না। ওই সাহিত্যের ভাষায় বল।

'থিয়েটারওয়ালারা হঠাৎ অকূলপাথারে পড়িয়া গেল। কিছুদিন লবঙ্গের জন্য অপেক্ষা করিয়া অবশেষে এক নতুন অভিনেত্রীকে মনোরমার অংশ অভ্যাস করাইয়া লইল; তাহাতে তাহাদের অভিনয়ের সময় পিছাইয়া গেল।

কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হইল না। অভিনয়স্থলে লোক আর ধরে না। শতশত লোক দ্বার হইতে ফিরিয়া যায়। কাগজেও প্রশংসার সীমা নাই।

সে প্রশংসা দূরদেশে গোপীনাথের কানে গেল। সে আর থাকিতে পারিল না। বিদ্বেষে ও কৌতূহলে পূর্ণ হইয়া সে অভিনয় দেখিতে আসিল।

মনোরমা যতক্ষণ মলিন দাসীবেশে ঘোমটা টানিয়া ছিল ততক্ষণ গোপীনাথ নিস্তব্ধ হইয়া দেখিতেছিল। কিন্তু যখন সে আভরণে ঝলমল করিয়া, রক্তাম্বর পরিয়া, মাথার ঘোমটা ঘুচাইয়া, রূপের তরঙ্গ তুলিয়া বাসরঘরে দাঁড়াইল এবং এক অনির্বচনীয় গর্বে গৌরবে গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর প্রতি এবং বিশেষ করিয়া সম্মুখবর্তী গোপীনাথের প্রতি

চকিত বিদ্যুতের ন্যায় অবজ্ঞাবজ্রপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল— যখন সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া প্রশংসার করতালিতে নাট্যস্থলী সুদীর্ঘকাল কম্পান্বিত করিয়া তুলিতে লাগিল— তখন গোপীনাথ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া 'গিরিবালা' 'গিরিবালা' করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। ছুটিয়া স্টেজের উপর লাফ দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল— বাদকগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

এই অকস্মাৎ রসভঙ্গে মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া দর্শকগণ ইংরাজিতে বাংলায় 'দূর করে দাও 'বের করে দাও' বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল।

গোপীনাথ পাগলের মতো ভগ্নকণ্ঠে চিৎকার করিতে লাগিল, 'আমি ওকে খুন করব, ওকে খুন করব।'

পুলিশ আসিয়া গোপীনাথকে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল। সমস্ত কলকাতা শহরের দর্শক দুই চক্ষু ভরিয়া গিরিবালার অভিনয় দেখিতে লাগিল, কেবল গোপীনাথ সেখানে স্থান পাইল না।'

মালিনী চুপ করতেই হাততালি দিয়ে ওঠেন স্বর্ণকুমারী। এমন অপূর্ব ভাষা, এমন রসবোধ, আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি। বল না মালিনী কে লিখেছেন, কোথা থেকে মুখস্থ করলি এই লেখা?

কাদম্বরী কেমন ঘোরের মধ্যে বলেন, গিরিবালা জিতে গেল! সত্যি এমন করে শোধ নেওয়া যায়! কী আশ্চর্য!

রূপা হাততালি দিয়ে বলে, কী মজা, চাইলে তুমিও তো এমন পারো নতুন বউঠান।

চুপ কর, যা মুখে আসে তাই বলিস, রূপাকে ধমক দিয়ে অন্যমনস্ক কাদম্বরী আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়ান। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কী যেন খুঁজতে থাকেন নিজের চেহারায়।

কার লেখা বল না, অধীর হয়ে ওঠেন স্বর্ণ, কেন হেঁয়ালি করছিস মালিনী। সে লেখকের আর কি কোনও লেখা আছে, এটাই বা কোথায় পেলি?

আমি জানি না দিদি, সত্যি বলছি, মালিনী বলে, আমার মাথায় মাঝে মাঝে কী যেন ভর করে, এগুলো বোধহয় এখনও লেখা হয়নি, কিন্তু কোথাও লেখা চলছে। গল্পটা আর নাম পড়তে পারছি, 'মানভঞ্জন'; কিন্তু লেখকের নামের জায়গাটা খালি, আমার মাথাটা কেমন ঘুরছে দিদি। আমি যাই।

এই থিয়েটার-পর্বের রেশ কাটতে না কাটতেই এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল বাড়িতে। শীতের দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ঊর্মিলাকে নিয়ে কাদম্বরী শুয়েছিলেন বিছানায়। কখন চোখ লেগে গেছে টের পাননি।

ঊর্মিলা পালঙ্ক থেকে নেমে খেলতে খেলতে কখন ছাদের বাঁকা সিঁড়ির দিকে চলে গেছে, তারপর নামতে গিয়ে গড়িয়ে পড়েছে সিঁড়ির নীচে। তার কান্নায় ঘুম ভেঙে কাদম্বরী যখন ছুটে এলেন, ততক্ষণে ব্রেন কনকাশন হয়ে নিথর ঊর্মিলার শরীর।

ঊর্মিলার দেহ কোলে নিয়ে মূর্ছা গেলেন কাদম্বরী। দাসীরা ছুটে গিয়ে যখন লেখার টেবিলে সাধনায় মগ্ন স্বর্ণকুমারীর কাছে খবর পৌঁছে দিল, সংবাদের আকস্মিক আঘাতে তিনিও অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

সারা বাড়িতে কালো ছায়া নেমে এল। বালক-বালিকাদের যে যার ঘরে আটকে রাখা হয়েছে, স্বর্ণর ছেলেমেয়েদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে সতীশ পণ্ডিতের ঘরে। মৃত্যুর নিষ্ঠুর রূপ যেন তারা জানতে না পারে। ওদের বলা হল, ঊর্মিলা কোথায় বেড়াতে গেছে।

শোকাচ্ছন্ন পরিবারের মহিলারা সবাই জড়ো হয়েছেন মৃত বালিকাকে ঘিরে। সৌদামিনীর চিন্তা, জানকীনাথ বিদেশে, এই অবস্থায় এতবড় আঘাত কী করে সামলাবেন স্বর্ণ? কোনায় বসে থাকা অশ্রুমতী কাদম্বরীর দিকে তাকিয়ে তিনি বলে ফেললেন, দাসদাসীদের এত পয়সা দিয়ে রাখা হয়েছে, বাচ্চারা তো তাদের কাছেই ভাল থাকে বাপু, নজর রাখতে না পারলে এত আদিখ্যেতার দরকার কী ছিল?

কথাটা কাদম্বরীর বুকে শেলের মতো বেঁধে। তিনি বলেন, ঊর্মিলা কি আমার সন্তান নয়? পেটে ধরিনি বলে এতবড় নিষ্ঠুর কথাটা বলতে পারলে বড়ঠাকুরঝি?

তা হলেও নতুনবউ, নীপময়ী বললেন, তোমার আরেকটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। খোলা সিঁড়ির সামনে বাচ্চা নিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লে, একবার দাসীদের ডাকা যেত না?

কাদম্বরী কাঁদতে কাঁদতে স্বর্ণর সামনে এসে কাঁধ ধরে নাড়িয়ে বলেন, তুমিও কি আমাকে দোষ দিচ্ছ স্বর্ণ ঠাকুরঝি? সত্যি বলো, আমার জানা দরকার তুমি কী ভাবছ।

স্বর্ণ উত্তর দেন না, কাঁদতে থাকেন, কাঁদতেই থাকেন। সৌদামিনী

কাদম্বরীকে বলেন, ওকে বিরক্ত কোরো না, একটু কাঁদতে দাও। সন্তানের অপঘাত মৃত্যুর চেয়ে বড় শোক হয় না।

সৌদামিনীর কথায় অবাক হয়ে যান কাদম্বরী, তিনিও যে সদ্য তাঁর একমাত্র সন্তানকে হারিয়েছেন, তাঁর সেই যন্ত্রণার কথা কেউ অনুভবই করছে না যেন? এরা কী নিষ্ঠুর অনুভূতিহীন! স্বর্ণ কোনও জবাব দিচ্ছে না কেন? সেও কি আমাকে দোষ দিচ্ছে?

পেছন থেকে কে যেন বলে ওঠে, নিজের পেটের মেয়ে হলে কি এমনি ঘুমিয়ে পড়তে পারতে ঠাকরুন? মায়ের চেয়ে কি কোনওদিন মাসির দরদ বেশি হয়, না হতে পারে?

হায়, হায়! এ-কথা শোনার আগে তাঁর মৃত্যু হল না কেন? আর কী মানে আছে বেঁচে থাকার? স্বর্ণর নীরবতা তাঁকে সবচেয়ে আঘাত করছে। মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে আছাড়ি পিছাড়ি কাঁদতে থাকেন সন্তানহীনা অপমানিতা কাদম্বরী।

রূপা কোথা থেকে ছুটে এসে কোলে তুলে নেয় কাদম্বরীর লুটিয়ে পড়া মাথা। তাঁকে জড়িয়ে তুলে ধরে ঘরে নিয়ে যেতে যেতে সবার দিকে তাকিয়ে সে চিৎকার করে, তোমরা কি মানুষ? একেই নতুনবউঠান মৃত্যুশোকে যন্ত্রণা পাচ্ছেন, তার ওপর তোমরা বাক্যবাণে বিঁধছ? ছিঃ!

রূপার দুঃসাহসে বাড়ির মেয়েরা স্তম্ভিত পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর কাঁধে ভর দিয়ে নিজের ঘরের দিকে হাঁটতে থাকেন অশ্রুমতী কাদম্বরী, পেছনের লম্বা বারান্দা জুড়ে তাঁর গঙ্গাজলি ডুরে শাড়ির আঁচল লুটিয়ে চলে, যেন এক নদীর মতন।

১৪

লুসি ও বিনোদিনী

রবিকে ইংলন্ডে আনা হয়েছে ব্যারিস্টারি বা আই সি এস পরীক্ষার জন্য। কিন্তু মেজোবউঠানের স্নেহচ্ছায়ায়, ঘরের আরামে রবির 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যটি এগিয়ে চললেও পড়াশোনা যে খুব বেশি এগোচ্ছে না সেটা কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ করলেন সত্যেন। সুতরাং বন্ধু তারকনাথ পালিতের উদ্যোগে তাঁকে লন্ডনে পাঠানো হল। প্রথমে কিছুদিন রিজেন্ট পার্কের সামনে একটি ভাড়া বাড়িতে একা থাকার প্র্যাকটিস করতে হল তাঁকে। লোকজন কেউ দেখা করতে এলে রবির মনে হয় তাদের জোর করে ধরে রাখবেন, এই শীতে নির্জন ঘরে তাঁর প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

মাঝে মাঝেই সত্যেন আসেন। কোনওদিন সত্যেন, তারক ও রবি হয়তো দল বেঁধে যোগ দিলেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভায়। আবার কোনওদিন ব্রিটিশ গণতন্ত্রের কাঠামোকে কাছ থেকে দেখার জন্য তাঁরা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের গ্রীষ্ম অধিবেশন দেখতে গেলেন। পরপর ক'দিন গিয়ে কিন্তু হতাশ হলেন রবি।

ঘরে ফিরে সত্যেন ও তারককে বলেই ফেললেন তাঁর নিরাশার কথা, পার্লামেন্টের অভ্রভেদী চূড়া, প্রকাণ্ড বাড়ি, হাঁ করা ঘরগুলো দেখলে খুব তাক লেগে যায়; কিন্তু ভেতরে গেলে তেমন ভক্তি হয় না। ইংরেজদের গণতন্ত্র ও বিচক্ষণতা সম্বন্ধে আমার যতটা উঁচু ধারণা ছিল, ততই এরা হতাশ করল।

সত্যেন নিজেও বেশ হতাশ, ইংরেজরা যে এমন অসভ্যের মতো চেঁচামেচি করবে এ আমার দুঃস্বপ্নের অতীত ছিল।

রবি যোগ করলেন, এরা তো অন্য কাউকে কথা বলতেই দিচ্ছে না,

বক্তাকে কতভাবে যে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে তা ভাবা যায় না, কেউ হাততালি দিচ্ছে, কেউ হিসস হিসস শব্দ করে, এত অসংযত!

তারক একটু লঘু করার চেষ্টা করেন, আসলে তোমরা বুঝতে পারছ না, এটাই রাজনীতির আসল চেহারা, কেউ কাউকে বলতে দেব না, কেউ কাউকে বিনা যুদ্ধে একচুল জমি ছাড়ব না।

তা হলে ভদ্রতা, সৌজন্যের বড় বড় কথাগুলো সব ইংরেজদের ভণ্ডামি, রবি তবু ফুঁসে ওঠেন। সেদিন যে আইরিশ মেম্বার ভারতের প্রেস অ্যাক্ট-এর বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছিলেন, কেউ তাঁর কথা মন দিয়ে শুনলই না! অথচ ভারতবাসীর করের টাকাতেই ওদের এত রমরমা। ভারতের কোনও রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে নাই বা কেন?

রবি যা খেপেছে এবার না রাজদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারক বলেন, তার চেয়ে তাড়াতাড়ি ব্যারিস্টারি পড়া শেষ করে এ-সব তর্ক তোলার চেষ্টা করো।

তবে হ্যাঁ, রবি বলেন, কিছু যে শেখার মতো পাইনি তা বলব না, গ্ল্যাডস্টোনের বাগ্মিতায় আমি অভিভূত। তিনি মঞ্চে ওঠামাত্রেই সমস্ত ঘর একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল, গলার স্বর শুনতে পেয়ে বাইরে ঘুরে বেড়ানো মেম্বারেরা এসে বসতে লাগলেন, দু'দিকের বেঞ্চি ভরতি হয়ে গেল, তখন যেন পূর্ণ উৎসের মতো গ্ল্যাডস্টোনের ভাষণ উৎসারিত হতে লাগল। তিনি তেজের সঙ্গে বলেন কিন্তু চিৎকার করেন না, যা বলেন আন্তরিক বিশ্বাস থেকে বলেন। আর অন্যদিকে, আইরিশ মেলোডির সুরে মজে থাকার পাশাপাশি উপেক্ষিত আইরিশ মেম্বারদের প্রতি আমার টান রোজই বাড়ছে।

ওঁরা সেদিন তারক পালিতের বাড়িতে উঠেছেন। হঠাৎ বালা এসে রবির হাত ধরে টানতে থাকেন পিয়ানোর দিকে।

পেছন থেকে সতু বলে ওঠেন, অনেক রাজনীতি হয়েছে, এবার তোমার একটা আইরিশ মেলোডি শোনাও রবি। আমার বিলেতি বান্ধবীরাও তোমার গলার খুব প্রশংসা করেছে।

সেই ভাল, স্কচের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে তারক বললেন, রবির গান শোনা যাক এবার, বালা সতুর ইংরেজ বান্ধবীরাও যখন ভাল বলছে!

রবির গান শেষ হতেই বালা যোগ করেন, রবির গলার এই টেনর ইংরেজ মেয়েদের মুগ্ধ করেছে। শুধু তাই নয়, রবি, তোমার চেহারার প্রশংসাতেও পঞ্চমুখ তারা।

সতু বলেন, রবি তো লজ্জায় মেয়েদের মুখের দিকে তাকাতেই পারে না। এখানে পার্টি হলে সবাই একটু আধটু ফ্লার্ট করে, তুমি কেন করতে পারছ না রবি! তোমাকে মেয়েরা এত পছন্দ করে!

রবি লাজুক হেসে বললেন, আমার চোখ সেই যে বাঙালি মেয়ের কালোহরিণ চোখে বাঁধা পড়েছে, তার থেকে আর মুক্তি পেলাম না। বিলিতি নীলনয়নাদের দেখে আমার পুষিবেড়াল পুষিবেড়াল মনে হয়।

কিছুদিনের মধ্যেই অবশ্য দু'জন নীলনয়না পুষিবেড়ালের সঙ্গে সরস বন্ধুত্বে জড়িয়ে পড়লেন রবি। মাঝখানে কিছুদিন বার্কারদের বাড়িতে কাটিয়ে তাদের দাম্পত্য ঝগড়ায় বিপর্যস্ত রবি আশ্রয় নিলেন লুসি স্কটদের পরিবারে। বিলেতের এই পরিবারটি হয়ে উঠল তাঁর আপনজনের মতো। বিশেষত মাতৃস্নেহবঞ্চিত রবিকে মিসেস স্কট তাঁর অসীম স্নেহের বন্ধনে বেঁধে ফেললেন।

রবি কাদম্বরীকে চিঠিতে লিখতে থাকেন, 'এখন আমি ক-র পরিবারের মধ্যে বাস করি। তিনি, তাঁর স্ত্রী, তাঁদের চার মেয়ে, দুই ছেলে, তিন দাসী, আমি ও টেবি বলে এক কুকুর নিয়ে এই বাড়ির জনসংখ্যা। মিস্টার ক একজন ডাক্তার। তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি প্রায় সমস্ত পাকা। বেশ বলিষ্ঠ সুশ্রী দেখতে। অমায়িক স্বভাব, অমায়িক মুখশ্রী। মিসেস ক আমাকে আন্তরিক যত্ন করেন। শীতের সময় আমি গরম কাপড় না পরলে তাঁর কাছে ভর্ৎসনা খাই। খাবার সময় যদি তাঁর মনে হয় আমি কম খেয়েছি, তা হলে যতক্ষণ না তাঁর মনের মতো খাই ততক্ষণ পীড়াপীড়ি করেন। বিলেতে লোকে কাশিকে ভয় করে; দৈবাৎ যদি আমি দিনের মধ্যে দু'বার কেশেছি তা হলেই তিনি জোর করে আমার স্নান বন্ধ করান, আমাকে দশরকম ওষুধ গেলান, শুতে যাবার আগে আমার পায়ে খানিকটা গরম জল ঢালবার বন্দোবস্ত করেন, তবে ছাড়েন।'

রবিকে গরম জলের সেক দিতে এসে লুসি ও জেসি নানারকম খুনসুটি শুরু করে দেয়, তাদের চঞ্চলতায় রবির সংকোচ কেটে যাচ্ছে। তিনিও বেশ ওদের সঙ্গে খুনসুটিতে মেতে ওঠেন।

লুসি হেসে হেসে বলে, জানো রবি, একজন ইন্ডিয়ান অতিথি আসবে শুনে আমরা ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে মাসির কাছে চলে গিয়েছিলাম!

কেন, রবিও মজা পেয়ে জানতে চান, আমি কি ভূত না রাক্ষস?

না না, জেসি এবার বলে, আমরা ভেবেছিলাম কোথাকার কোন জংলি আসছে, বড় বড় নখ, গায়ে গন্ধ।

আমি তো ভেবেছিলাম, তোমার গায়ে উলকি আঁকা থাকবে আর নাকে কানে গলায় ভারী ভারী সব গয়না, হাসতে হাসতে লুসি বলল।

ও তোমরা ইন্ডিয়ান বলতে রেড ইন্ডিয়ান ভেবেছিলে, রবি লুসি-জেসির কথা শুনে মজা করে বলেন, দাঁড়াও না, একদিন ওরকম সেজে দেখাব তোমাদের। আবার মাসির বাড়ি পালাতে হবে।

ইসস, ভয় দেখাবে! লুসি বলে, দেখি কে কাকে ভয় দেখায়! পায়ে সেক দিয়ে দিচ্ছি, আরাম করে শুয়ে আছেন বাবু, আবার ভয় দেখাবেন!

রবি বলেন, তখন তো পালিয়ে গিয়েছিলে, এখন কী মনে হচ্ছে দেখে?

লুসি বলে, বলব না। বুঝে নাও।

রাতে খুব সুন্দর সুন্দর সব স্বপ্ন দেখলেন রবি। ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল। বাইরের ঘরের সোফায় এসে বসেছিলেন। এ বাড়ির সকালটা কীভাবে শুরু হয়, কে জানে। সব চুপচাপ। সবাই ঘুমোচ্ছে।

একটু পরে বড়মেয়েটি নেমে এল নীচে। ফায়ারপ্লেসের আগুন উসকে দিয়ে সে বলে, গুড মর্নিং রবি। ঘুম ঠিক হয়েছিল?

এটাই কথাবার্তা শুরু করার দস্তুর, রবিও তাকে বলেন গুড মর্নিং।

মেয়েটি দ্রুতপায়ে রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধুনিকে ব্রেকফাস্টের ব্যাপারে কিছু নির্দেশ দেয়। আবার ফিরে এসে অগ্নিকুণ্ডে দু'-চারটে কয়লা গুঁজে দিয়ে সোফায় বসে।

এমন সময় সিঁড়িতে দুদ্দাড় শব্দ। শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে মিস্টার স্কট নামলেন। ফায়ারপ্লেসের কাছে গিয়ে হাত পা সেকতে সেকতেই গুড মর্নিং-এর পাট সেরে ফেললেন। তারপর খবরের কাগজ নিয়ে বসলেন খাবার টেবিলে।

রবিকে দু'-একটা খবর পড়ে শোনাতে শোনাতে কফিপর্ব শুরু হয়ে যায়। লুসি ও জেসি নেমে এসে বাবার গালে চুমু দিয়ে সকাল শুরু করে।

মিস্টার স্কট বললেন, এই যে লুসি জেসি, আজ আবার ফাইন হল তোমাদের। আমার পরে ঘুম থেকে উঠেছ, দাও, দাও চার আনা ফাইন।

দেব, বাবা, দেব। ঠিক দিয়ে দেব। বাবার গলা জড়িয়ে ধরে লুসি বলে। জেসিও বাবাকে একটু আদর করে যায়।

স্কট রবিকে সাক্ষী মেনে বলেন, দেখো রবি, এরা কথা রাখছে না। এদের সঙ্গে আমার চুক্তি আছে, ওরা আমার আগে উঠলে আমি পাঁচ সিকে পুরস্কার দেব আর আমি আগে উঠলে ওরা দেবে চার আনা ফাইন। ওদের কাছে আমার অনেক পাওনা হয়েছে, এরকম ডেট অব অনার ফাঁকি দেওয়া কি ভদ্রতা?

সব শেষে ব্রেকফাস্ট টেবিলে যোগ দিলেন মিসেস স্কট। সাড়ে ন'টার মধ্যে জলখাবার পর্ব শেষ। একটু হাসিঠাট্টার পরেই মেয়েদের তাগাদা দেন স্কট আন্টি। সবাই কাজে লেগে পড়ো। হাতে দস্তানা পরে আন্টি নিজে দাসীদের নিয়ে একতলা থেকে চারতলা পর্যন্ত ঝাড়মোছ করান। রান্নাঘরে গিয়ে রুটিওলা, তরকারিওলা, মাংসওলার বিল দেখে পাওনা মেটান। কর্তার সঙ্গে পরামর্শ করেন। রান্নার তদারক করেন। বড় মেয়েটিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে।

মেজোমেয়ে জেসির কাজ হল দাসীরা ঘর ঝাঁট দেওয়ার পর একটা ঝাড়ন নিয়ে ড্রয়িংরুমের ধুলো সাফ করা। লুসি তখন সেলাই নিয়ে বসে। বালিশের ওয়াড় বা মোজা রিপু করা, চিঠিপত্র লেখা এ-সব তার কাজ। লুসি কিন্তু গানবাজনাও করে, বাড়িতে সে একমাত্র গাইয়ে-বাজিয়ে। গানের আসরে আজকাল রবিও সোৎসাহে যোগ দিচ্ছেন।

লুসির খেয়ালে হঠাৎ এক-টি নতুন খেলা শুরু হল কিছুদিন। প্ল্যানচেট-চর্চা। এক-একদিন সন্ধ্যায় টেবিল চালা হত। কয়েকজন মিলে চেয়ারে বসে একটা টিপাইতে হাতে হাত লাগিয়ে রাখতেন আর টিপাই উন্মত্তের মতো সারাঘরে ঘুরে বেড়াত। শেষে যাতে হাত দেন তাই নড়তে শুরু করে। একবার খেলাচ্ছলে ওরা মিস্টার স্কটের টুপির দিকে হাত বাড়াতেই স্কট আন্টি ছুটে এসে টুপি সরিয়ে নিলেন, স্কটসাহেবের কোনও জিনিসে শয়তানের স্পর্শ লাগুক সেটা তিনি হতে দেবেন না কিছুতেই।

এরমধ্যে রবি ভরতি হয়েছেন লন্ডনে ইউনিভার্সিটি কলেজে ইংলিশ পড়ার জন্য। এখানে রবির সহপাঠী তারকের ছেলে লোকেন। বয়স কম হলেও অদ্ভুতভাবে তেরো বছরের লোকেনের সঙ্গে আঠারো বছরের রবির বন্ধুত্ব খুব জমে উঠল অচিরেই। লুসিকে বাংলা শেখাতে গিয়ে রবি যখন শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে হোঁচট খাচ্ছেন, তখনও তাঁর সাহায্যকারী লোকেন পালিত।

রবির সন্দেহ হয় শুধু লুসি নয়, জেসিও যেন তাঁর প্রতি একটু বেশিই মনোযোগী। বাগানের গাছের ফাঁকে, ছাদের দক্ষিণমুখো ঘরে, পিয়ানোর রিডের ওঠা-নামায়, প্ল্যানচেটের আঙুল ছোঁয়ায় কী যে মধুর রহস্য পল্লবিত হয়ে ওঠে, রবি সবটা যেন বুঝতে পারেন না।

ইংলিশ ক্লাসের ফাঁকে রবি তাঁর সমস্যার কথা বলেন লোকেনকে। লুসি যেন কী একটা কথা বলতে চায়, কিন্তু কী বলতে চায় রবি বোঝেন না। আবার জেসিও কত রহস্য করে লুসিকে লুকিয়ে।

লোকেন তাঁকে বলে, বুঝতে পারছ না, ওরা দু'জনেই তোমার প্রেমে পড়েছে।

রবি বলেন, কী জানি, আমি তো বিশ্বাস করার মতো মরাল কারেজ পাচ্ছি না। কী যে করি!

কী আবার করবে, লোকেন অনেক পরিণত, প্রেম করো। ফ্লার্ট করো। ওরা তোমার সুরের ভক্ত, চেহারায় মুগ্ধ।

রবি সাহস পান না। তাঁর মনে পড়ে যায় ঘরের কোনার একটি রহস্যময় কালো চোখ। কালো আর নীল চোখের টানাপোড়েনে হাবুডুবু খান তরুণ রবি।

স্কটকন্যাদের সঙ্গে রবির মাখামাখি বন্ধুত্বের কাহিনি কিছুটা পল্লবিত হয়ে ক্রমে দেবেন ঠাকুরের কানেও এসে পৌঁছিল। তার ওপর ইংরেজ মেয়েদের স্বাধীন রূপ নিয়ে রবির মুগ্ধতা যেভাবে ভারতীতে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' নামে প্রকাশিত হচ্ছিল, তাতে দেশে বেশ শোরগোল পড়ে গেল। কয়েকজন তো জোর তর্ক বাঁধিয়ে দিলেন এ নিয়ে।

মহর্ষি রবিকে নির্দেশ দিলেন দেশে ফিরতে। কিছুদিন এলোমেলো বিলেত ভ্রমণের পরে সবে যখন ইংলিশ ক্লাসের শিক্ষক মি. মরলির পড়ানোয় আকর্ষিত হয়েছেন রবি, তখনই তাঁর দেশে ফেরার ডাক এল।

স্কট আন্টি রবির হাত ধরে কেঁদে ফেললেন বিদায়কালে। রবির মনেও শেষ ক'দিন চলল অসহ্য টানাটানি। মালতীপুঁথির খাতা নানারকম আঁকিবুকি করতে করতে রবি লিখলেন তাঁর বেদনার ভাষ্য,

'ফুরালো দুদিন/কেহ নাহি জানে এই দুইটি দিবসে—
কি বিপ্লব বাধিয়াছে একটি হৃদয়ে।

দুইটি দিবস/চিরজীবনের স্রোত দিয়াছে ফিরায়ে—
এই দুই দিবসের পদচিহ্নগুলি/শত বরষের শিরে রহিবে অঙ্কিত।
* যত অশ্রু বরষেছি এই দুই দিন/যত হাসি হাসিয়াছি এই দুই দিন *
এই দুই দিবসের হাসি অশ্রু মিলি/
হৃদয়ে স্থাপিবে চির * হাসি অশ্রু। * বসন্ত বরষা।'

নিজের বেদনা চেপে রেখে, ব্যারিস্টার বা আই সি এস হওয়ার চেষ্টায় জলাঞ্জলি দিয়ে, দুই নীলনয়নার হৃদয়ে দাগা দিয়ে ১৮৮০ সালের বসন্তকালে দেশে ফিরে এলেন রবি। পথে ফ্রান্স ভ্রমণ করে একইসঙ্গে বাচ্চাদের নিয়ে ঘরে ফিরলেন সত্যেন জ্ঞানদাও।

বাবু কলকাতার এক আশ্চর্য নক্ষত্র বিনোদিনী। বারাঙ্গনার মেয়ে পুঁটি কী এক অসাধারণ জাদুমন্ত্রে নিজেকে পালটে নিয়েছে। তাঁর রেয়াজি কণ্ঠের গানে, চমকদার রূপে আর অভিনয়ের মুনশিয়ানায় রাতের পর রাত জমে ওঠে আলোকিত নগরমঞ্চ। শহরের অভিজাত পুরুষেরা তাঁর পায়ে লুটোপুটি খায়। অভিনয় শেষে কেউ ফুল নিয়ে আসে তো কেউ টাকার তোড়া, কেউ হিরের নেকলেস উপহার দেয় তো কারও হাত প্রণামের ছলে হাঁটু বেয়ে তাঁর উরু ছুঁতে আসে।

বিনোদিনী অবশ্য সবাইকে পাত্তা দেন না। বাছা বাছা বাবুরাই তাঁর প্রসাদ পায়। ধনীঘরের এক যুবক এখন তাঁর প্রেমিক, যদিও সে ছেলেটির বাড়ি থেকে বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

কিন্তু সবার ওপরে গিরিশচন্দ্র। তিনিই বিনোদিনীর ঈশ্বর। বিনোদিনীর বাড়িতে আজকাল প্রায়ই জমাটি আসর বসাচ্ছেন গিরিশ। অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্রেরাও আসেন। কোনওদিন গিরিশ কিটসের কবিতা পাঠ করে শোনান তো আর-একদিন শেকসপিয়রের নাটক, কোনওদিন কাব্যালোচনা তো কোনওদিন আবার বিলেতের অভিনেত্রীদের কথা। মিসেস সিডেনস-এর লেডি ম্যাকবেথ চরিত্রে অসাধারণ অভিনয়ের কথা প্রায়ই বলেন গিরিশ। বিনোদিনী চাতকের মতো শুষে সব রসগ্রহণ করেন। নিজেকে গিরিশের মনোমতো করে তুলতে তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই।

মলমলের নকশাকাটা উড়ানি উড়িয়ে, বিলিতি আতরের খুশবু ছড়িয়ে হঠাৎই একদিন সেখানে উপস্থিত হলেন জ্যোতি।

গিরিশ বলে ওঠেন, এ কাকে টেনে এনেছিস বিনোদ? এই খারাপ পাড়ায় নটীর ঘরে জ্যোতিঠাকুরের উদয় হল, লোকে যে আমাকেই দুষবে!

কেন গিরিশবাবু, আপনি এলে আমারই বা আসতে দোষ কোথায়? জ্যোতি বলেন। নটীর কাছে নাট্যকারকে তো আসতেই হবে।

জ্যোতি, তুমি বড়ঘরের ছেলে, গিরিশ তবু বললেন, তুমি এখানে এলে সমাজে অনেক কথা হবে। আমার কথা আলাদা, আমি সারাদিন নেশা করি, থিয়েটারের নেশায় যা খুশি করি, আমাকে নিয়ে কেউ কিছু বলে না, বললেও যায় আসে না।

আমি আপনাকে আমার নতুন নাটক শোনাতে চাই, জ্যোতি গিরিশকে বলেন, আপনি অনুমতি না দিলে বিনোদিনী তো তাতে অভিনয় করতে পারবে না।

বিনোদিনীর হিরের নাকচাবি ঠিকরে ওঠে। এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলেন তিনি, এখন বলে ওঠেন, আমি তো এখন ন্যাশনালে ছাড়া অন্য কোথাও থিয়েটার করব না, সরোজিনী করেছিলাম। জ্যোতিঠাকুরবাবু, এখন আপনার নাটক কী করে করি বলুন তো?

জ্যোতির হৃদয় সে মুহূর্তে যেন থেমে গেল, পৃথিবী দুলে উঠল। সরোজিনী! সরোজিনী! উঃ কী নিষ্ঠুর তুমি! বিনোদিনীর গা থেকে ভেসে আসা আতরের যে গন্ধ জ্যোতিকে পাগল করে সেই গন্ধে এখন তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসে।

গিরিশ কেঠো গলায় শ্লেষের সঙ্গে জ্যোতিকে বললেন, ও, আসল কথা এটাই, আমাকে নাটক শোনাতে চাওয়াটা একটা বাহানা, আসলে তুমি চাও বিনোদিনীকে!

উপস্থিত দু'-একজন হেসে হেসে বলেন, বিনোদিনীকে কে না চায় মশায়, ঠাকুর একা আর কী দোষ করলেন?

এ-সব হেঁজিপেঁজি লোকের ফোড়ন কাটায় জ্যোতির মানে লাগে, অথচ সত্যিই তো বিনোদিনীর টানে চুম্বকের মতো ছুটে এসেছেন তিনি। ওর হাসি, ওর গন্ধ, ওর নাকচাবির ইশারা ওঁকে পাগল করে দেয় যে উন্মাদনা কোনও ঘরনির কাছেই পাওয়া সম্ভব না, যা এমনকী কাদম্বরীও দিতে পারে না।

একটু বিরক্ত হয়েই জ্যোতি বললেন, দেখুন গিরিশবাবু, এতে দোষ কীসের? বিনোদিনী ভাল অভিনেত্রী, আমি যদি তাকে আমার নাটকের হিরোইন করতে চাই, আপনার গায়ে লাগবে কেন?

গিরিশের এক ফচকে চেলা বলে ওঠে, রোজ সন্ধ্যায় জ্যোতিঠাকুর ন্যাশনালে আসেন বিনোদিনীকে দেখতে! রোজ!

তাতে কী হল? জ্যোতি ফুঁসে ওঠেন।

আহা রাগ করছেন কেন, বিনোদিনী জ্যোতির হাত ধরে অনুনয় করেন, ঠান্ডা হয়ে একটু বসুন দেখি!

জ্যোতি তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমার কাছে আসতে এত পাথরে ঠোক্কর খেতে হয় কেন সরোজিনী?

আহা, ওটা কি আমার নাম নাকি? বিনোদিনী লজ্জা পান। আমি তো কত চরিত্র করেছি, যখন যে পার্ট করি সেটাই আমাকে সারাক্ষণ খেলার সঙ্গীর মতো ঘিরে রাখে, তখন আর অন্য পার্ট মনে থাকে না।

আমার কাছে তুমি চিরদিনই সরোজিনী হয়ে থাকবে, জ্যোতি বলেন, যতদিন-না আমার নতুন নাটকের হিরোইন হবে। ওই 'জ্বল জ্বল চিতা' গানের সঙ্গে আগুনের দৃশ্যে তোমার রূপ যে দেখেছে সে কোনওদিন ভুলতে পারবে না।

সরোজিনী নিয়ে দর্শকেরা পাগল হয়ে গেছিল ঠিকই, বিনোদিনী বলেন, কিন্তু ঠাকুর, আগেও অমন হয়েছে। আমরা যখন গ্রেট ন্যাশনাল থেকে সারা ভারত ঘুরে ঘুরে 'নীলদর্পণ' করছিলাম, কী হয়েছিল জানো! ক্রমে সেই দৃশ্যটা এল, রোগসাহেব ক্ষেত্রমণিকে পীড়ন করছে আর ক্ষেত্রমণি নিজের ধর্মরক্ষার জন্য চিৎকার করে বলছে, ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, মুই তোর মেয়ে। ছেড়ে দে, আমায় ছেড়ে দে। তারপর তোরাপ এসে সাহেবের গলা টিপে ধরে হাঁটুর গুঁতো কিল চড় মারছে, অমনি সাহেব দর্শকরা হইচই শুরু করে দিল। কতগুলো লালমুখো গোরা তরোয়াল খুলে স্টেজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেকী হুড়োহুড়ি চিৎকার!

জ্যোতি বলেন, জানি বিনোদ, সেই অভিনয় দেখেই তো আমি তোমাকে সরোজিনীর পার্ট দেব ঠিক করলাম। কিন্তু সরোজিনীর উন্মাদনা আরও বেশি ছিল। অন্যদের দিকে তাকিয়ে আবার বলেন, আপনারা দেখেননি, সরোজিনী এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে ওই নাটকটি গ্রামেগঞ্জে যাত্রাপালা হয়েও ছড়িয়ে পড়েছে।

গিরিশের একটু গায়ে লাগে, বলেন, আপনি সরোজিনী ভুলতে পারছেন না, মেঘনাদ বধের সাতটি চরিত্রে ওকে দেখেননি? বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনীতে?

মৃণালিনীতে ওর অভিনয় দেখে বঙ্কিম বলেছেন, আমি মনোরমার ছবি লিখেছিলাম, কখনও প্রত্যক্ষ চলেফিরে বেড়াতে দেখব আশা করিনি। এখন বিনোদিনীর অভিনয়ে যেন জ্যান্ত মনোরমাকে দেখছি।

চেলা বলে, আর সধবার একাদশীর কাঞ্চন?

আরেক চেলা বলে, ব্রিটানিয়া, পলাশীর যুদ্ধে?

অমৃতলাল বসু বললেন, সরোজিনীতে খুব ভাল পার্ট করেছিল বিনোদিনী সত্যি, কিন্তু গিরিশ যখন নায়ক সাজে, তার উলটোদিকে নায়িকা বিনোদিনীকে যেমন মানায়, তেমনটা আর কিছুতে না।

জ্যোতির বিমর্ষ লাগে, এখানে যেন গিরিশের রাজ্যপাট। গিরিশের কবল থেকে না ছাড়াতে পারলে এভাবে বিনোদিনীকে রাজি করানো যাবে না।

জ্যোতি ঘুরেফিরে আসেন বিনোদিনীর কাছে। বিনোদিনীও খুশি হন তাঁকে দেখলে, নিজের লেখা কবিতার খসড়া শোনান। জ্যোতিঠাকুর প্রশংসা করলে তাঁর শরীরে খুশির হিল্লোল বয়ে যায়। জ্যোতি আসতেই নিজের লেখায় সুর বসিয়ে বিনোদিনী গান গেয়ে ওঠেন,

'চাই না চাই না চাই নারে তোর ওজন করা ভালবাসা
সিন্ধুসম ভালবাসা বিন্দুতে কি যায় পিপাসা
ভালবাসা পাকা সোনা, ভালবাসায় খাদ মেশে না
ভালবাসা বেচাকেনা ভরাডুবি করে আশা।'

জ্যোতি আকুল হয়ে বলে ওঠেন, এমন গান তুমি কাকে নিয়ে বেঁধেছ সরোজিনী? কে তোমাকে এমন দাগা দিল? আমাকে বলো, আমি তোমার সব কষ্ট বুক পেতে নেব বলেই তো বারবার ছুটে আসি।

বিনোদ রহস্যময় হাসি হেসে আর-একটা গান ধরেন।

জ্যোতি যখন তাঁকে নিজের লেখা গান বা নাটক শোনান, বিনোদিনী তখন মুগ্ধ শ্রোতা। কিন্তু তাঁর মনের কোণের নিভৃত জায়গাটায় কিছুতেই যেন পৌঁছতে পারেন না জ্যোতি। সেখানে বিনোদ তাকে ঢুকতে দেয় না কেন? কে বসে আছে সেখানে? গিরিশ না অন্য কেউ? নিজের কন্দর্পকান্তি রূপ এবং আশ্চর্য প্রতিভাকে ব্যর্থ মনে হয় জ্যোতির। ভগ্নহৃদয় নিয়ে বারবার বিনোদিনীর কাছ থেকে ফিরে আসেন তিনি।

ফিরে আসেন কাদম্বরীর কাছে। কিন্তু ফিরে এসেও সুখ কোথায়? কাদম্বরী তো বারবার জ্যোতিকেই কাঠগড়ায় তোলে। কেঁদেকেটে অস্থির করে তোলে বিনোদিনীর সঙ্গে কল্পিত প্রণয়ের অভিযোগে।

কাদম্বরীকে নিয়ে একদিন স্টিমারে ভেসে পড়লেন জ্যোতি, সঙ্গে অক্ষয় ও দু'-একটি বন্ধুবান্ধব। সেদিন ওঁদের গানবাজনার মুড, জ্যোতি পাগলের মতো সুর তৈরি করছেন আর অক্ষয় কথা বসাচ্ছেন। বন্ধুরা বাহবা দিচ্ছেন সুরে সুর মিলিয়ে।

কাদম্বরী আজ আসরের মধ্যমণি। জ্যোতি সুর দিচ্ছেন তাঁর দিকে তাকিয়ে, অক্ষয় গান গাইছেন তাঁকে ঘিরে। আকাশের পাখি, নদীর জল তাঁকে ঘিরে উৎসবে মেতেছে। কাদম্বরীর বড় ভাল লাগে। বহুদিন পরে আবার এমন আসর, গত বসন্তের স্মৃতির মতো, বেলকুঁড়ি-গন্ধমাখা তেতলার ছাদের সন্ধ্যার মতো। আজ আবার যেন তিনি ত্রিমুণ্ডী হেকেটি।

আকাশ কালো করে ঝড় এল, বৃষ্টি এল, পালের মতো উড়তে লাগল কাদম্বরীর শাড়ি, তবু কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। নীল মেঘডম্বরু শাড়ির ঘোমটায় মাথা ঢেকে নিলেন হেকেটি আর দুই ঘোরলাগা পুরুষ গান তৈরি করে চললেন।

বাহ্যজ্ঞানহীন তুরীয় অবস্থায় জ্যোতি ও অক্ষয় একের পর এক কত গান যে তৈরি করলেন সেদিন! গানগুলি ইন্দ্র, শচী ও দেবদেবীদের নিয়ে নানারকম প্রেমের, রাগ অনুরাগের গান। চন্দননগরে পৌঁছে সেগুলি নিয়ে বসলেন দুই বন্ধু, ঘষামাজা করে তৈরি হল 'মানময়ী' নামে একটি গীতিনাট্য।

নাটক তৈরি হতেই জ্যোতির আর-একরকম ছটফটানি, এবার থিয়েটার নামাতে হবে। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এই গীতিনাট্যের তোড়জোড়ের মধ্যেই ফিরে এলেন রবি, সত্যেন ও জ্ঞানদা। বাড়ির গানবাজনার এই চিরপরিচিত স্রোতে ফিরতে পেরে রবির মন নেচে ওঠে। গুনগুন করে মানময়ীর গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতেই রবি লিখে ফেললেন একটি নতুন গান।

রবির গলা শুনে কাদম্বরী বলেন, রবি কেমন পালটে গেছ, তোমার গলাও কেমন বিলিতি বিলিতি ঠেকছে।

আহা, এ-কথা শোনার জন্য কি ফিরে এলাম বউঠান, রবি মজা করে বলেন, সেখানে তোমার কথা ভেবে ভেবে রাতে ঘুম হত না, কত বিলিতি বালিকার ফুলশর অগ্রাহ্য করে তোমার কাছে ফিরে এলাম, আর তুমি এমন পরপর ভাব করছ!

অ্যাই রবি, একদম বাজে কথা, কাদম্বরী ঠোঁট ফুলিয়ে বলেন, আমার কথা তোমার মনেই ছিল না। কত বালিকাকে ফুলশরে বধ করেছ তুমিই জানো, তবে আন্না যে এখানে এসে তোমার জন্য চোখের জল ফেলেছে, সে তো আমি নিজের চোখেই দেখেছি।

রবি কাদম্বরীর হাত ধরে একপাক ঘুরে যান নাচের ভঙ্গিতে, গেয়ে ওঠেন, আয় তবে সহচরী—

জ্যোতি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, বাঃ বেশ তো গানটা, নতুন লিখলি রবি? লাগিয়ে দে আমাদের নাটকে।

এবার স্বর্ণকুমারীও বলে উঠলেন, না রবি, তোর গলা একটু পালটেছে ঠিকই, নতুনবউঠান ভুল কিছু বলেননি। কেমন যেন বিদেশি বিদেশি লাগছে, ভালই লাগছে।

অক্ষয় বললেন, বিলিতি সুরের প্রভাবে গলা একটু পালটেছে ঠিক, তার ওপর ওর এখন বয়ঃসন্ধি পেরোনো কণ্ঠ। রবির গলায় আইরিশ মেলোডির ছোঁয়া লেগেছে।

রবি আপাদমস্তক শিউরে ওঠেন কী এক অজানা ভাললাগায়, একদিন ছিল যখন অক্ষয়ের কণ্ঠে আইরিশ মেলোডির ওইসব কবিতার আবৃত্তি শুনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছেন। বিলেতে গিয়ে সুরগুলি শিখে এসে অক্ষয়কে কবে শোনাবেন, তাই ভাবতেন কিশোর রবি। শিখেছেনও, কিন্তু সব সুর যে ভাল লেগেছে তা নয়। কিছু সুর মিষ্টি, সরল, করুণ। কিন্তু আয়ারল্যান্ডের প্রাচীন কবিসভার বীণ ছোটবেলায় যেভাবে বেজে উঠত, বিলেতে যেন তেমনভাবে বাজল না। বরং তিনি অন্য অনেক সুর শিখেছেন। লুসির সঙ্গে সুরের খেলায় মেতেছিলেন এই সেদিন, এখন যেন পিয়ানোর ছেঁড়া তার বেজে ওঠে বুকে। চোখের জল লুকোতে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ান তিনি।

জ্ঞানদা অন্য কথা বলেন, প্রথমে নিজেদের মধ্যেই মানময়ীর অভিনয় হোক না। কে কী পার্ট করবে সব ঠিক করা যাক।

আমি সুরাটে গিয়ে কাজে যোগ দেওয়ার আগেই তা হলে অভিনয় হোক, সত্যেন বললেন। এতদিন দূরে ছিলাম, একটু গানবাজনা অভিনয়ের স্বাদ নিয়ে কাজে ফিরতে চাই।

ঘরে বসেই ঠিক হয়ে গেল, জ্যোতি করবেন ইন্দ্রের পার্ট, রবি মদন।

আর শচী সাজবেন কে? কাদম্বরী পরম উৎসাহে জানতে চান।

বহুদিন বিদেশে থেকে জ্ঞানদার মন থেকে নতুনবউয়ের ওপর অসন্তোষ কিছুটা কমেছে। মেয়েটা কেমন শীর্ণ হয়ে গেছে, চোখের তলায় জমে আছে বর্ষার মেঘ।

তুমিই তো শচী সাজতে পারো নতুনবউ, জ্ঞানদা বললেন, সাজলে গুজলে নতুনের সঙ্গে তোমায় বেশ মানাবে।

এমনিতে বুঝি মানায় না? কাদম্বরী সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেন জ্ঞানদার গোপন ইশারাটি। ঠিক কীরকম হলে মানাবে বলো তো?

আহা, মেজোবউঠান ওভাবে কিছু বলেননি, জ্যোতি তাড়াতাড়ি বলেন, তোমরা আবার শুরু করে দিয়ো না, দোহাই নতুনবউ।

অভিমানিনী কাদম্বরী রবির কাছে জানলায় গিয়ে দাঁড়ান। রবি তাঁর হাতে হাত রাখে। কানে ফিসফিস করে উচ্চারণ করে নিজের লেখা একটি কবিতা,

'হয়তো জান না, দেবি, অদৃশ্য বাঁধন দিয়া
নিয়মিত পথে এক ফিরাইছ মোর হিয়া
গেছি দূরে গেছি কাছে, সেই আকর্ষণ আছে
পথভ্রষ্ট হই নাক তাহারি অটল বলে।'

বৈশাখে বাড়ির আঙিনায় মহা ধুমধাম করে মানময়ীর অভিনয় হল। কাদম্বরী সর্বস্ব পণ করে অভিনয় করলেন, মানময়ী শচীর চোখের জলে মিশিয়ে দিলেন নিজের চেপে রাখা অশ্রুজলরাশি।

সবাই নাটকের অভিনয়ের প্রশংসায় মাতোয়ারা, বিশেষত কাদম্বরীর অভিনয় সবাইকে অবাক করেছে। সকলে যখন ধন্য ধন্য করছে তখন জ্যোতিকে আড়ালে টেনে নিয়ে তাঁর আঙরাখার সোনার বোতাম ধরে নাড়াচাড়া করতে করতে কাদম্বরী জানতে চান, তোমার বিনোদিনী কি আমার চেয়েও ভাল অভিনয় করে?

উঃ, নতুনবউ, তোমার মাথার ঠিক নেই! জ্যোতি ছিটকে যান, যে অধরা আগুনকে ভুলে থাকতে চাইছেন তিনি আবার তাকেই কেন টেনে আনে কাদম্বরী!

নাটকের মানময়ীর মানভঞ্জন হয়, কিন্তু বাস্তবের মানময়ী নিজের পরম সাফল্যের দিনেও চোখভরা অশ্রু নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন চিত্রার্পিত।

১৫

শ্রীমতী হে

রবির প্রেরণা কাদম্বরী, কাদম্বরী জ্যোতির জন্য উতলা, জ্যোতি বিনোদিনীর জন্য। মাঝে মাঝে জ্যোতি ভাবেন, বিনোদিনী কি তাঁর জীবনের ফেম ফেটাল! কী অনিবার্য আকর্ষণে সব ওলটপালট করে দিচ্ছে সে। প্রিয়তমা নতুনবউকেও আর তত প্রিয় মনে হয় না, অথচ বিনোদিনী ধরা দেয় না। কাদম্বরীকেই বা সামলাবেন কীভাবে, সে যে তিল তিল করে ধ্বংস করছে নিজেকে।

কাদম্বরী ভাবছেন, জ্যোতি কার্তিকের মোহান্ধ পোকার মতো আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছেন, কী করে তাঁকে সরিয়ে আনবেন ওই নটীর অগ্নিশিখা থেকে। কী করে বাঁচাবেন নিজেকে?

রবি বুঝতে পারেন দু'জনকেই। জ্যোতিদাদার কাছে বিনোদিনী এখন দেবী মিউজ, সরোজিনীর পর থেকেই তাকে নিয়ে পাগলা হয়ে আছেন কিন্তু রবির মিউজ নতুনবউঠান। এমন এক আশ্চর্য নারী, চাঁদনি রাতের আলোর মতো, কনকচাঁপার সৌরভের মতো যাঁর উপস্থিতি, তাঁকে কেন চোখের জলে ভাসতে হবে? তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে পাতার পর পাতা কবিতা লিখে চলেন রবি। 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যটি শেষ হতে চলল এবার, প্রথম সর্গ শুরু হয়েছিল বিলেত যাওয়ার আগে।

সর্বনাশিনী সেই বিনোদিনীর থেকে অনেক দূরে শান্তিনিকেতনে চলে এলেন ওঁরা, রবি জ্যোতি ও কাদম্বরী। সবুজের সেই অবারিত আঙিনায় কাদম্বরীকে ঘিরে দুই অসাধারণ যুবকের মনে দু'রকম ঘূর্ণি পাকিয়ে ওঠে।

একগুচ্ছ বকুলফুল কুড়িয়ে এনেছেন কাদম্বরী, ফুল নাড়াচাড়া করতে করতে আদুরে গলায় বলেন, এই ফুলগুলো যেমন শুকিয়ে যাবে, আমিও একদিন শুকনো বকুলের মালার মতো তোমাদের ঘরের কোনায় পড়ে থাকব।

রবির কানে কথাগুলো মনে হয় হেকেটিদেবীর বেদনাসংগীত। এই প্যাথস থেকে জন্ম নেয় তাঁর নতুন কবিতা।

জ্যোতির মনে হয়, এই রে, কাদম্বরী আবার এ-সব প্রলাপ শুরু করেছে। কলকাতার জনমোহিনী জীবন থেকে, নাট্যরঙ্গ থেকে দূরে সরে এসেছেন তিনি, স্ত্রীর মনখারাপ সারিয়ে তুলবেন বলে। এখানে এসেও কি ওর মন ভাল হবে না?

তিনি বলেন, নতুনবউ, তুমি কি শান্তিনিকেতনের এই উদাত্ত পরিবেশেও কোনও আনন্দ খুঁজে পাচ্ছ না?

আমি কি আর নতুন আছি? তোমার চোখে আমি তো এখন পুরাতন, কাদম্বরীর অভিমান যায় না, আরও কত নতুন এসে গেছে তোমার জীবনে!

রবির চমক লাগে, কে যেন বাতাসে ফিসফিস করে বলে যাচ্ছে— 'হেথা হতে যাও পুরাতন', কে বলল, কে!

না গো, হেকেটিদেবী, রবিও রহস্য করেন, তুমি বুঝি সত্যি বুঝতে পারছ না এ-বই কার চরণকমলে অর্ঘ্য দিতে চাই?

'চরণে দিনু গো আনি— এ ভগ্নহৃদয়খানি
চরণ রঞ্জিবে তব হৃদিশোণিতধারা'

কিন্তু সে কার চরণকমলে? কাদম্বরী বুঝেও বোঝেন না যেন।

সেই তার, রবি বলেন, বিলেতে গিয়েও যার ছায়া ঘাড় থেকে নামাতে পারিনি, যেখানে যাই, যার ছায়া পিছু ধাওয়া করে!

তা হলে এবার সে তোমার ঘাড় মটকাবে, কাদম্বরী হাসতে হাসতে বললেন। হাসি যেন রবির সারা গায়ে জুঁইফুলের মতো ঝরে পড়ল।

রবি অস্ফুটে উচ্চারণ করেন, 'আঁধার হৃদয়মাঝে দেবীর প্রতিমা-পারা।'

প্রথম বেরোল ভারতী-তে, তারপর 'ভগ্নহৃদয়' বই হয়ে বেরোল ১৮৮১-র জুন মাস নাগাদ। তখন থেকেই শুরু 'শ্রীমতী হে-কে' নিয়ে নানা জল্পনা। 'অলীকবাবু' নাটকে একবার হেমাঙ্গিনী সেজেছিলেন কাদম্বরী, আবার ঘনিষ্ঠজনেরা তাঁকে হেকেটি বলে ডাকেন, তবে তিনিই কি 'শ্রীমতী হে'?

জ্ঞানদাও বলতে ছাড়েন না, বই হাতে নিয়ে তাঁর প্রথম কথা, শেষে

কাদম্বরীকে উৎসর্গ করতে হল রবি, এমন আড়াল করে কবিরা তো স্বপ্নের নারীকে উৎসর্গ করে জানতাম!

রবির মনখারাপ হয়, মেজোবউঠানের সব ভাল, শুধু কেন যে নতুনবউঠানকে দেখতে পারেন না! দু'জনের মধ্যে যেন অদৃশ্য রেষারেষি। মুখে অবশ্য বলেন, তুমি কী করে জানলে কাকে উৎসর্গ করেছি, কবিদের সব কথা প্রকাশ হয়ে গেলেই বিপদ। তবে নতুনবউঠান যে আমার অনেক কবিতার মিউজ, এ-কথা অস্বীকার করব না। আমার কাছে তিনি যত না রক্তমাংসের মানুষ, তার চেয়ে বেশি একটি আইডিয়া।

কী জানি বাপু, জ্ঞানদা স্পষ্টতই বিরক্ত হন, কী যে আহামরি দেখেছ ওর মধ্যে? ভেবেছিলাম বিলেত ঘুরে এলে ওর ভূতটা ঘাড় থেকে নামবে, এখনও তোমার ছেলেমানুষি গেল না।

ফিরে আসার পর জ্ঞানদার মহলে অনেক নতুন নিয়ম চালু হয়েছে। তাঁর ছেলেমেয়েরা খোদ বিলিতি কাটিংয়ের পোশাক পরে। ধুমধাম করে কেক কেটে তাদের জন্মদিন পালন হয়। সুরেন ভরতি হয়েছে সেন্ট জেভিয়ার্সে আর বিবি লোরেটোয়। রামা চাকরের সঙ্গে রোজ বিকেলে বেড়াতে যায় সুরেন বিবিরা। অন্য বাচ্চাদের কাছে এটা রীতিমতো ঈর্ষার বিষয়। ঠাকুরবাড়িতে ছোটরা কেউই এত মনোযোগ পায় না, সেখানে জ্ঞানদার আদরযত্নে সুরেন বিবির বিচরণ যেন রাজপুত্র রাজকন্যার মতো।

জ্ঞানদা নিয়ম করেছেন, প্রতিদিন বাড়ির একজন করে বাচ্চা ওদের সঙ্গে হাওয়া খেতে যাবে। ছোটরা অধীর হয়ে অপেক্ষা করে কবে তার পালা।

বিবি সুরেনের পিঠোপিঠি বয়স সরলার। তার মায়ের বাচ্চা মানুষ করায় আগ্রহ বা সময় কোনওটাই নেই। দাসীর হেফাজতে এবং গুরুমশায়ের কড়া শাসনে দিন কাটে। যেদিন তার বেড়াতে যাওয়ার পালা, সেজেগুজে বেরতে গিয়েই বাধা। গুরুমশায় দেখে ফেলে যেতে দিলেন না, তার অশ্রুভারাক্রান্ত চোখের সামনে দিয়ে সুরেন বিবিরা বেরিয়ে গেল, উড়ে গেল তার বাইরে বেরোনোর স্বপ্ন।

বালিকাদের মধ্যে বিবি, সরলা ও প্রতিভার গলায় খুব সুর। রবি মহা উৎসাহে বাড়ির গানবাজনায় ছোটদেরও টেনে আনছেন। সাবাদিন ঘরের বাতাসে দিশি-বিলিতি সুরের উচ্ছল আমেজে শুরু হয়ে যায় মাঘোৎসবের প্রস্তুতি। আগে দায়িত্ব নিতেন দ্বিজেন, সত্যেন বা জ্যোতি। এবার রবিই

গানবাজনার দায়িত্বে, নতুন নতুন ব্রহ্মসংগীত লিখছেন, ওস্তাদদের বন্দিশ থেকে সুর নিয়ে ভেঙে নতুন সুর তৈরি করছেন, শেখাচ্ছেন। প্রতিবার মাঘোৎসবের দিন গানের বই বেরোয়, এবার আগেই আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস থেকে বিশ-পঁচিশটি প্রুফ তুলে গানগুলি হাতে হাতে ছড়িয়ে দিলেন রেওয়াজের জন্য। আগেকার গানের চেয়ে রবির গানে নানা সুর, নানা ভাবের খেলায় আনন্দ যেন অনেক বেশি। কিছু বুঝুক না বুঝুক, বাচ্চাদের মনেও যেন সেই আনন্দের ছোঁয়া লাগে।

জ্যোতি তো বলেই ফেললেন, আমাদের গানে উপনিষদের গাম্ভীর্যের ভাবটা বেশি ছিল, শ্রীমান রবির আমলে ব্রহ্মসংগীত যেন পূর্ণতা পেল।

কিন্তু পিয়ানোর মধ্যে ওস্তাদি গানগুলিকে ফেলে, যথেচ্ছ মন্থন করে জ্যোতি যে সুর নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করছিলেন সেইসময়, রবি ছিলেন তাঁর সে-কাজের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। এইসব এক্সপেরিমেন্ট ব্রহ্মসংগীতে ব্যবহার করা হয়নি কিন্তু বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে লেখা ও অভিনীত 'বাল্মীকিপ্রতিভা' নৃত্যনাট্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সুরবিপ্লব। অপেরা নয়, রবির ভাষায় সেটা ছিল 'সুরে-নাটিকা'।

বাল্মীকির ভূমিকায় রবি স্বয়ং অসাধারণ অভিনয় করলেন, তবে সবাইকে মুগ্ধ করে দিল সরস্বতীর সাজে হেমেনের বালিকাকন্যা প্রতিভা। গানে, সুরে, অভিনয়ে রবির এমন মুনশিয়ানা এই প্রথম বাইরের অতিথিদের কাছে প্রতিষ্ঠিত হল। বঙ্কিমচন্দ্র অভিনয় দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন দেবেনবাবুর ছোট ছেলের প্রতিভায়।

এ-সবের মধ্যে দিন কাটছিল আনন্দেই। কিন্তু রবির ভবিষ্যৎ নিয়ে সত্যেন-জ্ঞানদা তখনও ভাবছেন। জ্ঞানদার ইচ্ছে রবি আবার বিলেত যাক। এখানে কাদম্বরীর মুখের দিকে তাকিয়ে পড়ে থাকার চেয়ে অনেক বড় একটা পৃথিবী আছে। রবি সেখানে গিয়ে নিজের অসমাপ্ত পড়া সম্পূর্ণ করুক। সত্যেনেরও তাই ইচ্ছে। তারকনাথ মহর্ষিকে সেই অনুরোধ জানান, রবি এবার বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টারি পড়া শেষ করুক।

রবির ইচ্ছেও সেরকম। পড়া শেষ না করে ফিরে আসায় স্বজনবন্ধুরা কেউই খুশি হননি। যখন সবে তাঁর পড়ায় মন বসেছিল, তখনই বাবা ডাক পাঠালেন। অসমাপ্ত কাজ সমাধা করতে তিনিও মহর্ষির কাছে বিলেত যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। প্রতিমাসে বিলেত থেকে তাঁকে একটি করে চিঠি

লিখবেন, এই শর্তে দেবেন্দ্রনাথ অনুমতি দিলেন। কিন্তু রবির যাওয়া হল না। তার কারণ কাদম্বরী।

কলকাতায় ফিরে গানবাজনার পাশাপাশি জ্যোতি আবার বিনোদিনীর কাছে যাওয়া শুরু করেছেন। কাদম্বরী কিছুদিন কান্নাকাটির পর একদিন ডাক পাঠালেন মালিনীকে।

বইয়ের বোঝা নামিয়ে মালিনী মেঝেতে বসে পড়ে। নতুনবউঠান, তোমার ঘরে একটা অন্যরকম গন্ধ আছে, এলেই কেমন উদাস উদাস লাগে।

অধীর কাদম্বরী কাজের কথায় আসেন, চল মালিনী, একদিন নাটক দেখতে যাই। বিনোদিনী নাকি গিরিশ ঘোষের একটা নতুন থিয়েটার করছে!

দেখবে, বউঠান? মালিনী সতর্ক হয়, দেখো আবার ধরা পড়ে যাব না তো। এখন আবার বাড়িতে মেজোবউঠান আছেন, সবদিকে তাঁর নজর।

পড়লে পড়ব, কাদম্বরী মরিয়া, তুই টিকিট কাটার ব্যবস্থা কর। সেবারের মতো, আমি, তুই আর রূপা।

রূপাও উৎসাহী, ছটফট করে বলে, নতুনবউঠান, রবিদাদাকে চুপিচুপি সঙ্গে যেতে বলো না! বেশ মজা হবে।

কাদম্বরী ভাবেন, মন্দ না কথাটা। কিন্তু রবি যদি রাজি না হয়! কিংবা রাজি হবেই বা না কেন, সে তো শকুন্তলার মুগ্ধ হরিণশিশুর মতো আমার পায়ে পায়ে ঘোরে!

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়াচ্ছিলেন কাদম্বরী। আনমনে বললেন, সে বলা যায়, কিন্তু রবিকে তো সবাই চিনে ফেলবে, আর জল্পনা করবে ওর সঙ্গে ঘোমটা ঢাকা মহিলাটি কে?

সে যার যা খুশি ভাবুক না, রূপা পরোয়া করে না। তোমার মুখ তো কেউ দেখতে পাবে না!

কাদম্বরী অতটা বেপরোয়া হতে পারেন না, বলেন, না না সে ঝুঁকি নেওয়া যায় না। ধরা পড়ে গেলে রবির খুব বিড়ম্বনা হবে। লোকে সন্দেহ করবে আমাকেই।

সেই নাটক দেখতে যাওয়াই কাল হল কাদম্বরীর। মানময়ীর অভিনয়ের পর সকলের বাহবা পেয়ে তাঁর ধারণা হয়েছিল কোনও নটীর থেকে অভিনয়ে তাঁর নৈপুণ্য কোনও অংশে কম নয়। তারা পতিতা হয়ে যতটা উত্তরণ ঘটাতে

পারে তার চেয়ে অনেকগুণ ডানা মেলতে পারে কাদম্বরীর শিক্ষিত রুচির অভিনয়।

কিন্তু সেদিন তাঁকে স্তম্ভিত করে দিল বিনোদিনী। মঞ্চে তার অনায়াস চলাফেরা যেন সম্রাজ্ঞীর মতো। রূপের মাজাঘষা মহিমায়, কণ্ঠের নিয়ন্ত্রিত স্বরক্ষেপণে, গিরিশের পরিমার্জনায় এবং দর্শকদের ঘনঘন করতালিতে তার জ্যোতির্ময়ী উপস্থিতি। কাদম্বরীর মনে হল ওই মঞ্চে উঠে দাঁড়ালে তিনিও এমন মোহগ্রস্ত করে দিতে পারেন দর্শকদের। তখন সেই বিপুল জনতার 'এনকোর' ধ্বনিতে ভাসমান তাদের প্রিয়নায়িকাকে দেখে জ্যোতিরিন্দ্র কী করবেন? ভালবাসবেন তো? নাকি তাঁর ঈর্ষা হবে, হবে চণ্ডালের মতো রাগ!

পরক্ষণেই নেতিয়ে পড়ে কাদম্বরীর সুখকল্পনা। সাদামাটা ধনেখালির আড়ালে ঢাকা নিজের শরীরটাকে বিনোদিনীর পাশে নেহাতই তুচ্ছ মনে হয়।

তখনই তিনি জ্যোতিকে দেখতে পেলেন। সামনের সারিতে বসেছিলেন, পেছন থেকে বুঝতে পারেননি কাদম্বরী। এখন উঠে দাঁড়িয়ে মঞ্চে বিনোদিনীর দিকে ফুলের মালা ছুড়ে দিয়ে সাধু সাধু বলে চেঁচিয়ে উঠতেই কাদম্বরীর চোখে অন্ধকার নেমে আসে। রূপার কাঁধে অবশ দেহে এলিয়ে পড়েন তিনি। কোনওরকমে একটু সুস্থ বোধ করতেই রূপা ও মালিনী বেরিয়ে পড়ল কাদম্বরীকে নিয়ে।

জোড়াসাঁকোয় ফিরে কাদম্বরী রুপোর কৌটোয় বহুদিনের জমানো আফিমের গুলি বার করে অনেকগুলি খেয়ে নিলেন। রবি রাতের দিকে কী একটা নতুন গান শোনাবেন বলে ঘরে ঢুকে দেখলেন ছিন্নলতার মতো মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন নতুনবউঠান, ঠোঁটের দু'পাশে গ্যাঁজলা।

পরের তিনদিন ঠাকুরবাড়ির সবকাজ শিকেয় তুলে সারিয়ে তোলা হল কাদম্বরীকে। এই ভয়ংকর আঘাত রবিকে এলোমেলো করে দিল। বিপন্ন বিষণ্ণ নতুনবউঠানকে খাদের কিনারায় ফেলে রেখে রবি কিছুতেই বিলেত চলে যেতে পারলেন না।

বিপর্যয় সামলাতে জ্যোতি কাদম্বরীকে নিয়ে গেলেন পশ্চিমের পাহাড়ে। নতুনবউঠানের ছেড়ে যাওয়া তেতলার ফাঁকাঘরে বসে রবি তখন কবিতায় খাতায় বেদনা মন্থন করে লিখছিলেন 'তারকার আত্মহত্যা'— 'জ্যোতির্ময় তীর হতে—

চিঠি লিখছিলেন নতুনবউঠানকে, 'আমার বড় ইচ্ছা ছিল যে, তুমি বলবে— 'অমুক জায়গায় আমি একটি সুন্দর উপত্যকা দেখলুম; সেখেনে একটি নির্ঝর বোয়ে যাচ্ছিল, জায়গাটা দেখেই মনে হল, আহা ভা (ভানু) যদি এখানে থাকত তা হলে তার বড় ভাল লাগত।'

এদিকে ভগ্নহৃদয় পাঠকমহলে আলোড়ন তুলল, রবিকে নিয়ে তরুণদল বাংলার শেলি বলে নাচানাচি শুরু করলেন। তাঁর বড় চুল, তাঁর পোশাক, চশমা সবকিছুই হয়ে উঠল অনুকরণযোগ্য ফ্যাশন স্টেটমেন্ট।

ত্রিপুরার দূত এসে খবর দিলেন, রবির কাব্যটি মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের খুব পছন্দ হয়েছে, তিনি অভিবাদন জানাচ্ছেন। কিন্তু রবির আর-এক বন্ধু প্রিয়নাথ সেনের একেবারেই ভালো লাগেনি এই কাব্য। বিহারীলালের অবশ্য পছন্দ হল। সময়ে অসময়ে প্রায়ই বিহারীলালের কাছে চলে আসেন রবি। প্রায় রোজই দেখেন, পঙ্খের কাজ করা মেঝের ওপর উপুড় হয়ে কবিতা লিখছেন বিহারীলাল, লিখতে লিখতেই রবিকে দেখে খুশি হয়ে ডেকে নেন। অগ্রজ-অনুজ দুই কবির সারা দুপুর কেটে যায় কবিতার ছন্দ নিয়ে তর্কে।

কাদম্বরী ফিরে আসার পর ঠাকুরবাড়িতে আবার শুরু হল 'বসন্ত উৎসব' অভিনয়ের উদ্‌যোগ। এবার নায়িকা লীলা সাজবেন কাদম্বরী, আর যে সন্ন্যাসিনীর কৃপায় লীলা তার প্রেমিককে ফিরে পেল, তার ভূমিকায় লেখিকা স্বর্ণকুমারী স্বয়ং। নায়ক জ্যোতিরিন্দ্র। রবি প্রতিনায়ক হয়ে টিনের তলোয়ার ঘুরিয়ে খুব যুদ্ধ করলেন।

অভিনয়ের দিন ঢালা বাগেশ্রী রাগিণীতে কাদম্বরী যখন গাইছিলেন— 'চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য মেঘান্ধ নিশীথ চেয়ে/দুর্ভেদ্য অন্ধকারে হৃদয় রয়েছে ছেয়ে'— তাঁর পিঠভরা খোলা চুলে, বড় বড় চোখে শোকাতুরা লীলার কল্পিত মূর্তি যেন জীবন্ত হয়ে উঠল।

রবি, জ্যোতি, স্বর্ণকুমারীরা যতই কাদম্বরীকে আনন্দে রাখার চেষ্টা করুন, বাড়ির মেয়েমহল কিন্তু কাদম্বরীকে ছেড়ে কথা বলল না। তরকারির আসরে এসে বসতে না বসতেই শুরু হয়ে যায় টীকা টিপ্পনী।

কেউ বললেন, কী গো নতুনবউ, এত নাটুকেপনা কেন? দুঃখকষ্ট তো সবার আছে, আমরা তো বাপু অমন করে বিষ খাইনি?

খেলেই যদি, অত অল্প করে খেলে কেন, সেই তো ফিরে আসতে হল

আমাদের মধ্যে! মাঝখান থেকে কর্তাদের যত ঝুটঝামেলা পোয়াতে হচ্ছে, বাইরে জ্যোতিঠাকুরকে নিয়ে কত কানাকানি। নিজের বরকে এমন বদনাম করে মুখ দেখাচ্ছ কী করে?

এত বিষ এদের জিভে, কালো হয়ে যায় কাদম্বরীর মুখ। সত্যি তাঁর মরে যাওয়াই ছিল ভাল, কেন যে রবি বাঁচিয়ে তুলল! চোখ দিয়ে টপটপ ঝরে পড়ে রুপোলি বেদনা।

জ্ঞানদাও অসন্তুষ্ট তাঁর ওপর। এমনি করে বাড়ির লোকের বদনাম করা তিনি মেনে নিতে পারেন না। কাদম্বরীকে আঘাত দিয়ে বললেন, এখন কেঁদে কী হবে নতুনবউ? তুমি নিজের মুখ পুড়িয়েছ, আমাদেরও। এই কথা চাপা দিতে কত টাকা খরচ হয়েছে জানো? আর নতুনের মুখের দিকে তো তাকানো যাচ্ছে না, এত ভালবেসে এই প্রতিদান পেল সে!

রূপা আর চুপ থাকতে পারে না, বলে, মেজোবউঠান, তোমরা কেউ ওঁর দুঃখটা বুঝছ না, কেউ কি সাধ করে এমন করে? ওঁকে একটু সামলাতে দাও না।

জ্ঞানদা রুষ্টস্বরে বলেন, তুই চুপ কর রূপা, সব ব্যাপারে কথা বলিস না। আর নতুনবউ, তোমাকে বলি, জীবনে অনেক ঝড়ঝাপটা আসে, কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জ নেওয়াটাই তো বেঁচে থাকা। আমি বিলেতে অসুস্থ বাচ্চাগুলোকে নিয়ে রুগ্‌ণ শরীরে একা একা কীভাবে দিন কাটিয়েছি, তুমি ভাবতেও পারবে না। আফিম খাওয়াটা ভীরুতা। নিজে জ্বলছ, নতুনকেও জ্বালাচ্ছ। আমি প্রথম থেকেই জানতাম, তুমি পারবে না। নতুনের মতো পুরুষকে বেঁধে রাখতে পারে না তোমার মতো মেয়েরা।

আমি কীরকম? জলভরা চোখে ফুঁসে ওঠেন কাদম্বরী। সব বুঝলাম মেজদি, কিন্তু আমি যেভাবে দিনের পর দিন নিজের স্বামীকে আগুনের দিকে ধাবমান পতঙ্গের মতো বাজারের নটীর দিকে ছুটে যেতে দেখেও হাসিমুখে সহ্য করেছি, সেটা কি তুমি পারতে?

এ তোমার মিথ্যে সন্দেহ নতুনবউ। জ্যোতির রূপগুণে নটীরা সবাই মাতোয়ারা, কিন্তু জ্যোতি তোমার প্রতি কোনও অবহেলা করেনি। আজও সে তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যায়, তোমাকে নায়িকা সাজিয়ে গীতিনাট্য করে।

ও-সব লোকদেখানো, কাদম্বরী খুব নিচু গলায় বলেন, ও আর আমাকে ভালবাসে না। আমি আমার সেই জীবনসঙ্গীকে চিনতে পারি না আর।

সৌদামিনী এখন অন্দরের কর্ত্রী। জলচৌকিতে বসে রুপোর পিকদানে পিক ফেলে বলেন, শোনো বাছা, একটা মিঠেপান মুখে দাও দেখি!

হঠাৎ পানের প্রস্তাবে কাদম্বরী তাঁর দিকে তাকান। সৌদামিনী একটি পান এগিয়ে দিয়ে বললেন, শোনো, পুরুষেরা একটু বারমুখি হতে পারে, কিন্তু তুমি যদি সন্দেহবাতিক দেখাও, তা হলে জ্যোতি আর ঘরে ফিরতেই চাইবে না। ঠান্ডা মাথায় একটু কায়দা করে চলো, দেখবে সংকট কেটে যাবে।

পেছন থেকে মুখ লুকিয়ে কে যেন বলে ওঠে, বাঁজা বউয়ের আবার বায়নাক্কা কত! স্বামী তো ওইজন্যেই মুখ ফেরাচ্ছে। কোলভরে একটা ছেলে আনতে পারলে দেখতাম, বর ঘরে ফেরে কিনা!

অ্যাই, কে বললে গো? রূপা আবার ঝামটে ওঠে, আড়াল থেকে যা নয় তাই বলবে? যাদের খাচ্ছ পরছ, তাদেরই কথা শোনাও!

ও বাবা, এ যে নতুনবউ কালকেউটের ছানা পুষেছে! আবার পেছন থেকে কে বলে ওঠে। ঠাকুরবাড়ির অসংখ্য আশ্রিত মহিলাদের মধ্যে অনেকেই এই আসরে তরকারি নিয়ে বসে। তাদেরই কেউ কেউ টিপ্পনী কাটছে পেছন থেকে।

এক বয়স্কা বিধবা সামনাসামনিই বলে ফেললেন মনের কথা, নতুনবউ, কিছু মনে কোরো না, তুমি বাপু একটু অপয়া আছ। ঊর্মিলাটা তোমার কাছে ছিল, পড়ে গেল আর তোমার ঘুমই ভাঙল না; নিজের কোলেও ছেলেপুলে এল না; দোষ আছে, চুপচাপ থাকো। বেশ তো ছিলে ফুরুৎ ফুরুৎ গানবাজনা নিয়ে, এখন আবার এ-সব আফিম খেয়ে নাটক করা কেন?

তীব্র শোকের বিদ্যুৎ প্রবাহে মাথা টলে ওঠে কাদম্বরীর। ঊর্মিলার কথা মনে পড়ে জ্ঞান হারাচ্ছেন তিনি। জ্ঞানদা তাড়াতাড়ি ধরে বসান তাঁকে। রূপাকে বলেন ওঁকে ঘরে নিয়ে যেতে। যেতে যেতেই রূপার ঘাড়ে মাথা রেখে কাদম্বরী পাগলিনীর মতো গুনগুনিয়ে গেয়ে ওঠেন 'মানময়ী'র একটি গানের কলি— 'সজনী লো সজনী, কেন কেন এ পোড়া প্রাণ গেল না?.../এনে দে এনে দে বিষ, আর যে লো পারি না।'

কাদম্বরী এরপর আর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকতে চাইলেন না, জ্যোতি ও রবির সঙ্গে চন্দননগরের গঙ্গাতীরের একটি বাগান-বাড়িতে এসে উঠলেন। কয়েকবছর আগেও এখানে এসে মুগ্ধ হয়েছিলেন ওঁরা, ঠাকুরবাড়ির কোলাহল থেকে দূরে গঙ্গার কোলে সেই বাড়ি যেন এক স্বপ্নরাজ্য।

ঘাটে বাঁধা থাকে একটা ডিঙি নৌকো। অক্ষয় এলে ডিঙি চড়ে মাঝনদীতে গিয়েও গানবাজনার পালা শুরু হয়ে যায়। দিনের পর দিন কেটে যায় অলস মায়ায়; সন্ধ্যা কাটে নদীর ঘাসে বসে গান গেয়ে; এমনকী কোনও কোনওদিন রাত হয়ে যায়, তবু গঙ্গার তীর থেকে নড়তে চান না কাদম্বরী।

এখানে এসে জ্যোতিকেও অনেক কাছে পেয়েছেন, যদিও প্রায়দিনই কলকাতায় যাওয়া-আসা করেন জ্যোতি।

কিছুদিন পর বাড়ি পালটে মোরান সাহেবের বাংলোয়। সেও গঙ্গার ধারে। কাদম্বরীর বিক্ষিপ্ত মনের ওপর দিয়ে গঙ্গার বাতাস যেন স্নেহের স্পর্শ দিয়ে ছুঁয়ে যায়। রবিও সতর্ক থাকেন যাতে বউঠানের মনে কোনও মেঘ না জমে। জ্যোতির অনুপস্থিতিতে হাসিগল্পে গানে কবিতায় ভরিয়ে রাখেন কাদম্বরীর অবসর।

সেখান থেকে কলকাতায় সদর স্ট্রিটের একটি ভাড়া বাড়িতে। ১৮৮১-৮২ সালের অনেকটা সময় জুড়ে জোড়াসাঁকোর বাইরেই কাটাচ্ছিলেন তিনসঙ্গী। কাদম্বরী জোড়াসাঁকোয় ফিরতে চান না। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের গঞ্জনা থেকে দূরে, তেতলার ঘরের নিঃসীম একাকিত্ব এড়িয়ে সদর স্ট্রিটের বাড়িটাই গুছিয়ে নেন তিনি। জ্যোতি সবসময়ে বাড়ি না এলেও রবি তো আছেই। রবি লেখার টেবিলে বসলে তার জন্য মৌসাম্বির শরবত এনে দেন কাদম্বরী, কখনও বা ছাদের আলিসায় সূর্যাস্তের আকাশের দিকে তাকিয়ে গল্প করতে করতে দিব্যি কেটে যায় দেওর বউদির।

এক-একদিন বই-মালিনী এসে হাজির হয় আশ্চর্য সব গল্পের ঝুলি নিয়ে। তাকে দেখলেই কাদম্বরী আজকাল আগের মতন জাদুগল্প শুনতে চান, তাঁর যেন জাদুগল্পের নেশা ধরে গেছে। কিন্তু আগের মতো মালিনীর চোখের সামনে সবসময় ওরকম ম্যাজিক খেলে না।

কোনওদিন সে বলে, তার চেয়ে আগের মতো নতুন নতুন বই দেখাই বউঠান? দেখো না এই বইটা— সেদিন স্বর্ণদিদির খুব পছন্দ হয়েছে।

কাদম্বরীর মনে লাগে না, ও-সব নতুন বইয়ের খবর তো রবির কাছে, জ্যোতির কাছেই শোনা যায়, এখন তো তিনি আর নেহাত অন্তঃপুরচারিণী নন। মালিনী ছাড়াও তাঁর বই জোগাড়ের অন্য পথ আছে। মালিনী কাছে এলেই তাঁর বুক দুরুদুরু করে, না জানি কী রহস্যময় কাহিনি শোনা যাবে,

যা প্রতিধ্বনির মতো তাঁর জীবনের গূঢ় গোপনকে মনে করিয়ে দেয়, যা প্রতিবিম্বের মতো সামনে এসে দাঁড়ায়!

বল না মালিনী, কাদম্বরী রোজ অনুনয় করেন, তেমন আশ্চর্য একটা গল্প, যা ছাপা হয়নি অথচ কোন অজানা ইথার তরঙ্গে লেখা হয়েছে।

একদিন মালিনী এল হাতে লেখা কয়েকটি ভূর্জপত্র নিয়ে, উদ্ভাসিত মুখে বলল, এবার তোমাকে অবাক করে দেব নতুনবউঠান। ঠোঁটে কৌতুক ছড়িয়ে সেই পুঁথির পাতা থেকে পড়ে শোনাতে থাকে সে—

অনেকদিন কোনও গান রচনা করা হয়নি, সেই জ্বরের ঘোরে রবি একটা গান বাঁধবার চেষ্টা করল। একটি দুটি লাইন ঠিক এসে গেল, তৃতীয় লাইনটা ভাবতে গিয়ে গুলিয়ে গেল প্রথম লাইনটা। কিছুতেই মনে পড়ে না। সেটা হাতড়াতে গিয়ে আবার তৃতীয় লাইনটা হারিয়ে যায়।

কপালে একটা হাতের ছোঁয়া লাগতে চমকে উঠল রবি। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন কাদম্বরী। উরিখুরি চুল, চোখ দুটি ছলছলে, শরীরে একটা আটপৌরে হলুদ শাড়ি জড়ানো।

দুজনে পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। এর মধ্যে রবি গিয়েছিল কাদম্বরীর কাছে ক্ষমা চাইতে, কাদম্বরী উদাসীনভাবে কাটাকাটা উত্তর দিয়েছেন, রবি বুঝতে পেরেছিল, ওঁর রাগ পড়েনি। তারপর কাদম্বরী অসুখে শয্যাশায়িনী হলেন, মনোর মা আর নিস্তারিণী দাসী তাঁর ঘরে বসে থাকে, রবি সকাল-বিকেল দেখে এসেছে, অন্তরঙ্গ কোনও কথা হয়নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জমিদারির কাজে গিয়েছেন শিলাইদহে, জোড়াসাঁকো থেকে দু'জন কর্মচারী এসে রয়েছে এ বাড়িতে।

রবি অস্ফুট স্বরে বলল, নতুনবউঠান!

কাদম্বরী বললেন, রবি। তোমার অসুখ হয়েছে, আমাকে খবর দাওনি?

রবি কাদম্বরীর ডান হাতখানি ধরল। সে হাত খুব উষ্ণ। কাদম্বরীর মুখ দেখলেও টের পাওয়া যায় জ্বরের ঝাঁঝ।

রবি বলল, তোমারও তো বেশ জ্বর, তুমি উঠে এলে কেন?

কাদম্বরী বললেন, মেয়েমানুষের জ্বর হলে কিছু হয় না। সরকার মশাইকে জানাচ্ছি, নীলু ডাক্তারকে ডেকে আনুক তোমার জন্য। এত জ্বর, তোমার কপালে জলপটি দেওয়া হয়নি—

রবি বলল, এখুনি ডাক্তার ডাকার দরকার নেই। মোটে একদিনের জ্বর, আমার এমনই ঠিক হয়ে যাবে।

কাদম্বরী বললেন, তুমি চুপটি করে শুয়ে পড়ো। এক্ষুনি আসছি।

রুপোর বাটিতে ঠান্ডা জল আর পরিষ্কার একটুকরো কাপড় নিয়ে একটু পরেই ফিরে এলেন কাদম্বরী। একপাশে বসে রবির কপালে জলপট্টি দিলেন যত্ন করে।

রবি বলল, এ তোমার ভারী অন্যায়, নতুনবউঠান। তোমার এখন শুয়ে থাকার কথা। তুমি জলপট্টি নাওনি কেন?

কাদম্বরী বললেন, তোমার এই মাথায় কত কী চিন্তা করতে হয়। বেশি গরম হলে ক্ষতি হতে পারে। আমাদের মাথার আর কী দাম আছে!

রবি বলল, চিন্তা সব মানুষই করে। তবে তোমার মনের মধ্যে কী যে চলে, তার আমি কোনও হদিশ পাই না।

কাদম্বরী হেসে বললেন, হদিশ করার সময় কোথায় তোমার?

রবি বলল, আমি দোষ করেছি। পথভ্রান্ত হয়েছিলাম, কিন্তু সেই দোষ কি একেবারে ক্ষমার অযোগ্য?

কাদম্বরী বললেন, ক্ষমার প্রশ্ন আসেই না, রবি। তুমি কি সর্বক্ষণ বাড়িতে বসে থাকবে নাকি আমার জন্য? আমি বুঝি তা বুঝি না?

রবি বলল, একটা লাভ হল কি জান, নতুনবউঠান, এই কয়েক মাস অন্যদের কাছে ঘুরে ঘুরে আমার উপলব্ধি হল, তোমার কাছাকাছি থাকতেই আমার সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে।

দু'দিন বাদে রবির জ্বর ছাড়ল। কাদম্বরীর ছাড়ল তার পরেরদিন। আবার শনিবারে দু'জনেরই একসঙ্গে জ্বর এল। নীলমাধব ডাক্তার দু'জনকেই ওষুধ দিলেন। সেই ওষুধে জ্বর ছাড়ে, আবার আসে। এই পালা জ্বর ক্রমে গা-সহ্য হয়ে গেল।

জ্বর যখন থাকে না তখন রবি লিখতে বসে যায়, কাদম্বরী ঘর গুছোতে শুরু করেন। সন্ধের পর দু'জনে মুখোমুখি বসে গল্প করে কিংবা গান গায়। রবি তার সদ্য লেখা কবিতাটা পড়ে শোনায়। কাদম্বরী রবির সব লেখার প্রথম পাঠিকা কিংবা শ্রোতা।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই রবির কানে আসে কী একটা পাঠের শব্দ। কে

পড়ছে, এটা তো বউঠানের গলা না! কৌতূহলী হয়ে দ্রুত বারান্দা পার হয়ে বউঠানের ঘরে ঢুকে পড়েন তিনি।

রবি ঘরে ঢুকতেই মালিনী পুঁথিপত্র গুটিয়ে উঠে পড়তে যায়। রবি তার আগেই জানতে চান, কী বই পড়া হচ্ছিল মালিনী? তাতে যেন আমার নাম শুনলাম!

রবির হঠাৎ আবির্ভাবে মালিনীর চোখের ঘোর কেটে গেল, কে যেন ধাক্কা দিয়ে তাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনে। রবিবাবু এ-সব শুনলে যে তাকে পাগল ভাববেন!

মালিনী পুঁথিটি ঝুলিতে পুরে ফেলতে চায়, কিন্তু রবি তরিৎগতিতে প্রায় ছোঁ মেরে সেটা হাতে তুলে নিলেন। তিনজনের অবাক দৃষ্টির সামনে রবির হাত লেগে ভূর্জপত্রের পৃষ্ঠাগুলি ঝুরঝুর করে গুঁড়ো হয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

১৬

বিনোদিনী

ঠাকুরবাড়ির বাঁধাধরা গণ্ডিতে জ্ঞানদা ক্রমশই হাঁপিয়ে উঠছিলেন। ছেলেমেয়েকে নিয়ে কিছুদিন তিনি সিমলা পাহাড়ে বাসা বাঁধলেন। তাঁর ধারণা হয়েছে, কলকাতার বিশেষত জোড়াসাঁকো বাড়ি থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল। সিমলার স্কুলেই ভরতি হল বিবি ও সুরেন কিন্তু তাদের আসল শিক্ষা ঘরের মধ্যে, মায়ের কাছে।

জ্ঞানদা নিজের প্রিয় কাব্যসাহিত্য পড়ে শোনান ছেলেমেয়েকে। তাঁর পছন্দ শেলির 'সেনসিটিভ পয়েন্ট' আর 'দি ক্লাউড', টেনিসনের 'মে কুইন' আর 'দি ব্রুক'। আবার ভারতী পত্রিকা থেকেও পড়ে পড়ে শোনান নতুন লেখা। সুরেন বিবির প্রতিদিনের আর-একটি কাজ হল সমবয়সি ভাইবোনদের আঁকাবাঁকা অক্ষরে চিঠি লেখা। এভাবেই ব্যাকরণের গতেবাঁধা নিয়ম এড়িয়ে তাদের শিক্ষা শুরু হয় প্রাণের স্পর্শে, সাহিত্যের উত্তেজনায়।

জ্ঞানদার আর-একটি প্রিয় কবিতা টমাস মুরের 'লাল্লারুখ'। মুরের কবিতা ঠাকুরবাড়িতে খুব চর্চা হত, আইরিশ মেলোডির কারণেই। সত্যেন পাঠিয়ে দিয়েছেন হান্স আন্ডারসন আর গ্রিমভাইদের রূপকথা, সুরেন বিবি রাতদিন কাড়াকাড়ি করে বইদুটি নিয়ে। বড়দের পছন্দের সব উত্তরাধিকার ছড়িয়ে পড়তে লাগল সুদূর সিমলায় বসে থাকা ছোট ছোট দুটি বালক-বালিকার তন্ত্রীতে।

কিছুদিন পর ছেলেমেয়ে নিয়ে একা একা পাহাড়ে থাকার চেয়ে কলকাতায় নেমে আসাই সুবিধেজনক মনে হল জ্ঞানদার। অবশ্য ঠাকুরবাড়িতে নয়, আলাদা বাড়ি ভাড়া করে ওঁরা উঠে এলেন ভবানীপুরের বির্জিতলাও পাড়ায়। মস্ত দোতলা বাড়ি, বিলিতি স্টাইলে মাঝখানে বড় হলঘর, তার চারপাশে

চারটে ঘর, গাড়ি-বারান্দার ওপরে আরও একখানা। এখন এরকম বাড়িতে থাকতেই আরাম পান জ্ঞানদা।

ইংল্যান্ডে বাস করার ফলে তাঁর অভ্যেসগুলি পালটে গেছে। সুরেন বিবিরা ম্যাট-ন্যাপকিন সাজানো ডাইনিং টেবিলে না বসলে খেতে পারে না। ঠাকুরবাড়ির সনাতন পরিবেশে তাদের অসুবিধে হচ্ছিল। তা ছাড়া কূটকচালি-ভরা মেয়েমহলের দমবন্ধ করা পরিবেশ এখন আর জ্ঞানদার সহ্য হয় না। ছেলেমেয়েরা ওখানে বেড়ে উঠুক সেটা তিনি কখনওই চান না।

জ্ঞানদার বাড়িই হয়ে উঠল রবি-জ্যোতির ঘরোয়া আড্ডার নতুন ঠিকানা। ভারতীর মিটিং থেকে পিয়ানো বাজিয়ে গান রচনার আসর— সবকিছুই এখন এই বাড়িতে। এখানেই জড়ো হন অক্ষয়, প্রিয়নাথ, বিহারীলালের মতো বন্ধুজন। এই আড্ডার নিয়মিত সদস্য স্বর্ণকুমারী ও জানকীনাথ। স্বর্ণকুমারীকে ঠাকুরবাড়িতে রেখে জানকীনাথ বিলেত গিয়েছিলেন পড়তে, কিন্তু উর্মিলার মৃত্যুর খবরে তিনি দেশে ফিরে আসেন। কখনও কখনও সৌদামিনী বা বর্ণকুমারীও এসে হাজির হন। বাদ শুধু একজন, সদর স্ট্রিটের বাড়ির নতুনবউ। জ্ঞানদার বাড়িতে তাঁর আমন্ত্রণ থাকে ন।। জ্ঞানদা নিজেই এ-সব গানবাজনা কবিতার আসরের মধ্যমণি হয়ে থাকতে ভালবাসেন, সেখানে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে তিনি ডেকে আনতে চান না। তিনি সবাইকে উৎসাহ দেবেন, তাঁর প্রেরণায় সবাই নাটক বা গীতিনাট্যে মেতে উঠবে, তাঁর সঙ্গেই রবি-জ্যোতিরা সাহিত্য আলোচনা করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। এইজন্য তিল তিল করে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন জ্ঞানদা।

স্বর্ণ যে দাদাদের সঙ্গে প্রকাশ্য সভায় গিয়ে কবিতা পড়ছে বা কাদম্বরী যে ডিঙিনৌকোয় চড়ে জ্যোতির বন্ধুদের গান শুনিয়ে মুগ্ধ করছে, এ-সবের সুযোগ কে করে দিয়েছে? চোদ্দো-পনেরো বছর আগের সেই সময়ে তিনি জোর করে অন্ধকারের চৌকাঠ ভেঙে না বেরলে এতদিনেও ওরা আলোর মুখ দেখত না। জোড়াসাঁকোর চারদেওয়ালে বন্দি হয়ে থোড়-বড়ি-খাড়া নিয়েই জীবন কাটাতে হত।

তা ছাড়া ঠাকুরবাড়িতে একমাত্র এই কাদম্বরীর কাছেই তাঁকে কয়েকবার হার মানতে হয়েছে। তাঁর সামনেই নতুনবউকে নিয়ে ছাদের আসরে জ্যোতি, রবি, অক্ষয়, বিহারীলালদের আদিখ্যেতা তিনি ভুলে যাননি।

এখন জ্যোতির যে ঘরে মন টেকে না, তাতে তিনি আশ্চর্য নন মোটেই। জ্যোতির মতো সৃষ্টিশীল প্রতিভা চিরদিন ওই বউকে নিয়ে মেতে থাকতে পারবে না, এ বিশ্বাস তাঁর ছিলই। তার ওপর এখন কাদম্বরী যেরকম ঘ্যানঘ্যানে হয়ে গেছে, জ্যোতি আর কত সইবে?

গানবাজনার শেষে জ্যোতির মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না, মেজোবউঠানের কাছে রাতে থেকে যান। জ্ঞানদাও তাঁকে নিজের কাছে টেনে নেন স্নেহে, শুশ্রূষায়, ভালবাসায়। এই দেবরটির প্রতি তাঁর অদ্ভুত টান এখনও অটুট।

সদর স্ট্রিটের বাড়িটা দামি দামি ফার্নিচার কিনে সাজিয়ে তুলেছেন জ্যোতি, তাতে আবার লেগেছে কাদম্বরীর রুচির ছোঁয়া। তবু সেই বাড়িটাকে মাঝে মাঝে একঘেয়ে মনে হয় জ্যোতির। গান কবিতা সাজসজ্জার আড়ম্বরের মধ্যেও পুরনো দাম্পত্য যেন হাঁপিয়ে ওঠে নতুন প্রাণের অভাবে।

জ্ঞানদার বাড়ির উদার স্নেহময় বাতাসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায়। শুধু মেজোবউঠান নন, তাঁর ছেলেমেয়েরাও জ্যোতিকে স্নেহের বন্ধনে আটকে রাখে। আহা কাদম্বরীর কোলে যদি একটি কচি উপহার দিতে পারতেন! জ্যোতি নিজেকেই দোষ দেন। হতাশায় বাড়ি ফেরেন না, রবি সতর্ক করেন, জ্যোতিদাদা, নতুনবউঠান কিন্তু রাগ করবেন, সে আমি সামলাতে পারব না।

জ্যোতি রবিকে বলেন, সে আমি কাল গিয়ে সামলে নেব। তুই সদর স্ট্রিটে ফিরে আজ রাতে বউঠানকে পাহারা দে রবি।

কেন একদিন একা থাকলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে তার? জ্ঞানদা ডাইনিং টেবল সাজাতে সাজাতে বলেন, আমি গাড়োয়ানকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি, রবি তুমিও আজ থেকে যাও।

বিবি এসে রবির হাত ধরে টানাটানি করতে থাকে, যেয়ো না রবিকা, আজ আমরা সেই বিলেতের মতো গান করব সবাই মিলে।

বালিকা বিবির স্নেহকাঙাল মুখের দিকে তাকিয়ে টানাপোড়েনে পড়ে যান রবি, তবু সেই নিঃসঙ্গ অভিমানিনী নতুনবউঠানের মুখ মনে করে শেষে সদর স্ট্রিটের দিকেই পা বাড়ালেন।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই জ্যোতির মনে পড়ল বিনোদিনীর মুখ। এই সকালে তার মানসীপ্রতিমার ধ্যানে কাদম্বরী ঢুকে পড়তে পারছেন না

বলেই জ্যোতির ঘুম পাড়িয়ে রাখা প্রেম চনমন করে উঠল। তিনি ঠিক করে ফেললেন, অনেকদিন যাওয়া হয়নি, আজ বিনোদিনীর খোঁজ নিয়ে তবেই বাড়ি ফিরবেন।

বিলিতি কায়দায় জ্ঞানদার ব্রেকফাস্ট ঘণ্টি বেজে উঠল, অর্থাৎ টেবলে খাবার রেডি। এমনিতে বিলেতের সব চালচলন মানতে পারেন না জ্ঞানদা, কিন্তু যেগুলি ভাল তা তিনি গ্রহণ করেছেন। ওদের গুছিয়ে সংসার করার কায়দাকানুনগুলি বেশ ভাল, এই যেমন টেবিলে বসে একসঙ্গে খানাপিনার ব্যাপারটা। বাঙালি বাড়িতে কর্তার খাবার আগে সাজিয়ে দিতে হবে তাঁর সময়মতো, ছেলেপুলেরা আলাদা আলাদা সময়ে খাবে, গিন্নিরা খাবেন সবার হয়ে গেলে তারপর। এতে সময় অনেক নষ্ট হয় আর গৃহিণীর পরিশ্রমও বেশি। একটা নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়ার পাট চুকে গেলে টেবিল পরিষ্কার করে গিন্নিরাও পড়াশোনা বা পছন্দসই অন্য কাজে মন দিতে পারেন।

সবচেয়ে বড় কথা, সবাই একসঙ্গে বসে খাওয়ার মজাই আলাদা। নিজেদের কথাবার্তা হাসিঠাট্টার মধ্যে যে খোলামেলা মেলামেশা হয়, সেটাই পারিবারিক সম্পর্কের আসল অমৃতধারা।

জ্যোতি টেবিলে পৌঁছে দেখলেন, বিবি সুরেন জ্ঞানদারা সবাই আগেই এসে গেছেন। কিন্তু কেউ খাওয়া শুরু করেনি, তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। জলখাবারের মেনু অবশ্য বিশুদ্ধ মতে, গরম গরম ধোঁয়া ওঠা ঠাকুরবাড়ির বিখ্যাত মাছের কচুরি দেখে জ্যোতি বুঝতে পারেন জমিয়ে খিদে পেয়েছে। সেই সঙ্গে আবার হাতছানি দিচ্ছে বরফকুচি দেওয়া ফলের রস আর চিনেমাটির বাটিতে সাজানো কাজু-কিশমিশ দেওয়া মোহনভোগ।

জ্ঞানদা জানতে চান, এখনি বাড়ি ফিরবে নাকি জ্যোতি? এসেছ, দু'-তিনদিন থেকে একটু জিরিয়ে যাও না।

জ্যোতি হেসে উড়িয়ে দেন, কী যে বলো মেজোবউঠান, আমি তো প্রায় রোজই আসি। দিনের বেলা কি আমার কোনও কাজকর্ম নেই?

তা হলে কাজ সেরে ফিরে এসো, দুপুরে ইলিশ রান্না হবে। জ্ঞানদা যেন বালক দেওরকে লোভ দেখান।

জ্যোতি হেসে বলেন, আর আমার বউ যে গোঁসাঘরে খিল দেবে. তোমার তাতে খুব মজা হবে, না? কেন যে তোমার এখনও এত রাগ সে বেচারার ওপর!

আমার রাগ করতে বয়ে গেছে, জ্ঞানদা ফোঁস করে ওঠেন, সে কি আমার ঘরের লোক যে রাগ কবব?

আর আমি? জ্যোতি জানতে চান, আমাকে যে আটকে রাখতে চাও তোমার কারাগারে, সে কোন অপরাধে দেবী?

আহা, জ্ঞানদা অভিমানী গলায় বলেন, জানো না যেন, তোমাকে ভালবাসি বলেই ধরে রাখতে চাই। তোমার মেজদাদা কোন সুদূরে পড়ে থাকেন, আমার কি ভাল লাগে একা একা শুধু বিবি-সুরেনকে নিয়ে সংসার সামলাতে! তুমি থাকলে আমাদের বাড়িতে খুশির হিল্লোল বয়ে যায়। বিবি সুরেনরাও কত খুশি হয়, তুমি বোঝো না!

কালপরশুই আবার আসব বউঠান, জ্যোতি জ্ঞানদার হাতের ওপরে হাত রেখে মিনতি করেন, আজ ছুটি দাও।

কোন রাজ্যজয় করতে যাবে শুনি? জ্ঞানদা কৌতূহলী হন, এখনি বাড়ি যাবে না নিশ্চয়ই!

বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা করতে হবে একটু, জ্যোতি মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে বলেন, আমার পরের নাটকে ওকে নায়িকা করতে চাই।

জ্ঞানদা তীক্ষ্মচোখে জ্যোতিকে দেখেন, চিবুক ধরে তাঁর মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে বলেন, একটা সত্যি কথা বলবে নতুনঠাকুরপো, কাদম্বরীর সন্দেহ কি সত্যি? তুমি কি সত্যি বিনোদিনীর প্রেমে পড়েছ?

জ্যোতি জ্ঞানদার সামনে থেকে সরে যান জানলার কাছে, কী করে বোঝাব মেজোবউঠান, কখনও কখনও নাট্যকারের কাছে নায়িকা তার লেখার প্রেরণা হয়ে ওঠে তুমি কি জান না তা? প্রেরণাকে প্রেম নাম দিলে বড্ড স্থূল শোনায়, জিনিসটাকে এত নীচে নামিয়ে এনো না, দোহাই তোমাদের।

জ্ঞানদার ভয় হয় জ্যোতি বোধহয় ভাবছেন তিনিও কাদম্বরীর মতো মোটাদাগের চিন্তায় নামিয়ে আনছেন বিনোদিনীকে। কিন্তু তিনি তো কাদম্বরী নন, তাড়াতাড়ি বলেন, না নতুনঠাকুরপো, সে ভয় কোরো না, বিনোদিনী যদি তোমার প্রেরণা হয়, আমি কখনও তাকে মোটা দাগে বিচার করব না। আটকেও রাখব না। যাও তুমি তোমার মিউজের কাছে।

বিনোদিনীর বাড়ি পৌঁছে জ্যোতি দেখলেন পরিবেশ থমথমে। বিনোদিনীর মুখে সংকটের ছায়া। গিরিশ মাথার চুল ছিঁড়ছেন। অমৃতলাল চুপচাপ বসে আছেন।

বিনোদিনীর এক ধনী প্রেমিক ছিল, সম্প্রতি সে লুকিয়ে বিয়ে করেছে। সেজন্য বিনোদিনীর খুবই মন খারাপ, জ্যোতি জানেন। কিন্তু সেজন্য সবাই এত গম্ভীর থাকবেন তা তো সম্ভব নয়। তবে কী হল?

জ্যোতি সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে জানতে চান, কী হয়েছে বিনোদিনী? কারও অসুখ করেছে?

না জ্যোতিবাবু, ভেজা গলায় বিনোদিনী বলেন, আমার স্বপ্ন বুঝি অধরা থেকে গেল। আমি ন্যাশনাল থেকে প্রায় বিতাড়িত হয়েছি। গিরিশবাবু এখন একটি নতুন থিয়েটার তৈরি করতে চান, কিন্তু টাকার অভাবে সে-চেষ্টা থমকে যাচ্ছে।

গিরিশবাবু ন্যাশনাল ছেড়ে নতুন থিয়েটার করবেন, জ্যোতি উল্লসিত হন, এ তো দারুণ খবর।

গিরিশ বলেন, ওহে ঠাকুরবাবু, ন্যাশনাল থিয়েটারে তো আর ভদ্রলোকে থাকতে পারছে না। মালিক কথায় কথায় সবাইকে অপমান করছেন। বিনোদিনী পনেরো দিন বেনারস বেড়াতে গেছিল বলে ওর টাকা কেটেছে। বিনোদ তাই রাগ করে ন্যাশনাল ছেড়ে দিল। আমিও বেবিয়ে এসে নাটক করছি। এখন নতুন থিয়েটার তৈরি করতে চাই। আপনার তো অনেক টাকাপয়সা, প্রতিপত্তি। দেখুন না কিছু করতে পারেন কি না।

জ্যোতি উদগ্রীব হয়ে জানতে চান, কী করতে হবে বলুন। বিনোদিনীর চোখের জল মোছার জন্য তিনি সবকিছুই করতে পারেন।

টাকা চাই, অনেক টাকা, গিরিশ বলেন, পারবেন কিছু করতে? আমার তো শখের থিয়েটার না, এ থেকেই রুটিরুজি চালাতে হবে।

জ্যোতি নিজেকে ধিক্কার দেন মনে মনে। অনেক টাকা তিনি কোথা থেকে দেবেন, কিছু জোগাড় করা যেতে পারে মাত্র। বাবামশায় তো কখনওই থিয়েটারের পেছনে এত টাকা ওড়াতে দেবেন না, তাঁর নিজের অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়। তবু বিনোদিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে মরিয়া হয়ে বলে ফেলেন, কিছু তো দিতেই পারি, আরও কিছু জোগাড় করা যায়। হাল ছেড়ে বসে থাকলে তো হবে না।

বিনোদিনী এগিয়ে এসে জ্যোতির হাত ধরে বলেন, সত্যি কিছু করা যাবে? আমাদের নতুন থিয়েটার গড়ে দিলে আমি চিরদিন আপনার কেনা হয়ে থাকব জ্যোতিঠাকুর।

জ্যোতির গা ভাললাগায় শিরশির করে ওঠে। এতদিন ওই প্রেমিকের জন্য বিনোদিনী তাঁকে কাছে ঘেঁসতে দেয়নি, আজ এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, এই মুহূর্তটা যদি চিরস্থায়ী করে রাখা যেত!

কিন্তু সেই মুহূর্তেই ঘরে ঢোকেন এক অল্পবয়সি যুবক, দামি বিলিতি মদের গন্ধে তাঁর গা ভুরভুর করছে, অঙ্গে মহামূল্য আঙরাখা, গলায় লম্বা সোনার চেন, পাঁচ আঙুলে হিরে-পান্নার আংটি। ঢুকতে ঢুকতেই আগের কথার রেশ টেনে বলেন, কী বিনোদিনী, আমাকে ফেলে অন্য কোনও মহাপুরুষের কেনা হয়ে থাকবে তুমি?

বিনোদিনী তাঁকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে যান, তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে বলেন, গুরমুখবাবু আপনি বসুন, ওরকম টালমাটাল করবেন না।

গিরিশ গুরমুখকে আপ্যায়ন করতে চান, বড়লোকের ছেলে, সাহায্যে লাগতে পারে। বলেন, আহা বিনোদ, ওঁকে ওরকম করে বোলো না, উনি থিয়েটার ভালবাসেন, ওঁকে একটু আদরযত্ন করো।

গিরিশ নিজেও আর ন্যাশনালে থাকতে চান না। মালিক প্রতাপচাঁদ এতদিন শিল্পীদের অবহেলা করলেও তাঁর কথা শুনতেন। ক্ষুব্ধ শিল্পীরা গিরিশের কথায় মালিকের অন্যায় মেনে নিয়েও কাজ করছিল। কিন্তু ইদানীং প্রতাপ যেন গিরিশকেও গুরুত্ব দিতে চান না, ন্যাশনালের বাণিজ্যিক রমরমা যে গিরিশ আর বিনোদিনীর জন্যেই, তা আর মানতে চাইছেন না তিনি। এই অবস্থায় গিরিশ চাইছেন নতুন করে শুরু করতে। ইতিমধ্যেই ন্যাশনাল ছেড়ে ক্যালকাটা স্টার কোম্পানি নামে একটা নাট্যদল গড়েছেন তিনি। অমৃতলাল মিত্র, নীলমাধব চক্রবর্তী, অঘোরনাথ পাঠক, বিনোদিনী, ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী, গঙ্গামণিরাও যোগ দিয়েছেন নতুন এই দলে। পুরনো 'সীতাহরণ' নাটকটি নতুন দলের ব্যানারে অভিনয় শুরু হয়েছে, তবে নির্দিষ্ট কোনও স্টেজ না থাকায় আজ এখানে কাল ওখানে হচ্ছে। এভাবে বেশিদিন চলবে না, তাই গিরিশ মরিয়া হয়ে উঠেছেন একটি পূর্ণাঙ্গ থিয়েটার মঞ্চ গড়তে, আর তার জন্য বড়লোক বাবু ধরা দরকার। বিনোদিনীকে সুকৌশলে টোপ হিসেবে এগিয়ে দিচ্ছেন তিনি।

বিনোদিনী কাছে গেলে গুরমুখ বলেন, না না, গিরিশবাবু, একটু ভুল বললেন, আমি থিয়েটার ফিয়েটার ভালবাসি না, ভালবাসি শুধু বিনোদিনীকে। তার হাত ধরে টেনে ডাকেন, এসো বিনোদ, আমার বুকে এসো।

বিরক্ত বিনোদিনী হাত ছাড়িয়ে নেন, 'থিয়েটার ফিয়েটার' কথাটা শুনে তাঁর গা জ্বলে যাচ্ছে। কিছুদিন ধরেই সদ্য গোঁফ গজানো এই যুবকটি তাঁকে টানাটানি করছে, কিন্তু বিনোদের মনে আগের প্রেমিকের প্রতি ভালবাসা ছিল, তাই পাত্তা দেননি।

গিরিশও বিরক্ত হন, তা হলে তুমি এখন এসো গুরমুখ, আমরা থিয়েটার নিয়ে একটু সিরিয়াস আলোচনা করছি।

জ্যোতি আর সহ্য করতে পারেন না, আঠারো-উনিশ বছরের ছেলের মাতাল হয়ে এ কী বেহায়াপনা! উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, আপনি নিজে থেকে যাবেন না গলা ধাক্কা দেব?

আরে, এ যে দেখি ঠাকুরবাড়ির জ্যোতিরিন্দ্র! অন্ধকারে চাঁদের উদয়! গুরমুখ জ্বালা ধরানো হাসি হাসেন, এনার কাছেই কি নিজেকে বিকিয়ে দিচ্ছিলে বিনোদ? এই তোমাদের সিরিয়াস আলোচনা?

বিনোদিনী নিজেকে স্পষ্ট করতে চান, গুরুমুখবাবু শুনুন, আপনি ভুল বুঝছেন। আমরা ন্যাশনাল ছেড়ে দিয়েছি। নতুন থিয়েটার গড়ব, তার জন্য টাকা চাই। কী করে টাকা জোগাড় হবে, আমরা তা নিয়েই মিটিং করছি। আমি জ্যোতিঠাকুরকে বলছিলাম, উনি যদি থিয়েটার গড়ে দিতে পারেন, আমি ওঁর কেনা হয়ে থাকব।

কত টাকা চাই বলো? গুরমুখের এবার বীরত্ব জেগে ওঠে, টাকা দিয়ে পৃথিবীতে যা-কিছু কেনা যায়, সবই তিনি কিনতে পারেন। উল্লসিত মুখে বলেন, বিনোদিনী, যত টাকা তোমাদের থিয়েটার তৈরি করতে লাগবে, আমি পুরো টাকাই ফেলে দেব।

জ্যোতির হৃদয়ে যেন শেল বেঁধে, অথচ তিনি অসহায়, গুরমুখের মতো করে বলার ক্ষমতা তাঁর নেই।

দেবে তুমি? বিনোদিনীর গলায় এবার মধু ঝরে পড়ে, কিন্তু গুরমুখবাবু তুমি তো জানও না কত টাকা? আমাদের কিন্তু অনেক অনেক টাকা লাগবে।

তোমার জন্য যা লাগে তাই ঢালব সুন্দরী, গুরমুখ দম্ভভরে বলেন, আমি থিয়েটার ফিয়েটার জানি না, আমি তোমার শখের জন্য টাকা দেব।

এবার গিরিশ আসরে নামেন। গুরমুখ তুমি এমনি এমনি এত টাকা দেবে? থিয়েটারের শেয়ার চাও না? অবশ্য তুমি না চাইলেও আমরা দেব। একাজ

যদি করতে পার, বাংলার থিয়েটারের ইতিহাসে তোমার নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে।

হাঃ, দু'দিনের জীবন, কীসের শেয়ার! কে চায় অমরত্ব! গুরমুখ হা হা করে হেসে ওঠেন। আমি শুধু বিনোদিনীকে চাই।

জ্যোতি বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, আপনি এভাবে কথা বলছেন কেন? এ কি মেছোবাজারের দরদাম চলছে? আপনি টাকা দিয়ে থিয়েটারকে বাঁচাচ্ছেন না বিনোদিনীকে কিনতে চাইছেন?

এতক্ষণে আমার মনের কথাটা বলে দিয়েছেন ঠাকুরবাবু, গুরমুখ লাফিয়ে ওঠেন, আমার কাছে রথ দেখা আর কলা বেচা দুই-ই এক। এ হল রূপের হাটের বিকিকিনি।

ছিঃ বিনোদিনী, এ-সব তোমরা সহ্য করছ কী করে? লোকটাকে এখনও গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছ না কেন? জ্যোতি ধিক্কার দিয়ে ওঠেন।

গিরিশ তাঁকে বাধা দেন, আঃ জ্যোতিবাবু, ও যদি সত্যিই টাকা দেয় আর তাতে নতুন থিয়েটার তৈরি হয়, আমরা যে-কোনও শর্তে রাজি হব। আমাদের কথাবার্তা বলতে দাও, আগে উত্তেজনা ছড়িয়ো না।

কিন্তু এই লোকটা তো বিনোদিনীকে অপমান করছে, জ্যোতি তবুও ফুঁসে ওঠেন।

অপমান কীসের, গুরমুখ অবাক হয়ে বলেন, আমি তো বিনোদিনীর জন্যেই সবকিছু করব, আমি ওর নামেই থিয়েটারের নাম দেব। কী বিনোদ, আমাকে একটু ভালবাসবে তো?

বিনোদিনীর অনেক জ্বালাযন্ত্রণার ওপর এই কথায় যেন মলম পড়ে, তিনি মধুর হেসে গুরমুখের দিকে এগিয়ে বলেন, সত্যি বলছ, আমার নামে থিয়েটার হবে? এ-কথা তো আগে কেউ আমাকে বলেনি!

জ্যোতিকে শান্ত করতে তাঁর হাতে হাত রাখেন, দেখুন জ্যোতিঠাকুর, উনি এত ভাল একটা প্রস্তাব দিচ্ছেন, আপনি আর রাগ করবেন না, আমার এত সহজে অপমান গায়ে লাগে না।

গিরিশ অবশ্য এই প্রস্তাবে খুশি হতে পারলেন না, তাঁর সাধের থিয়েটার হবে কিনা শেষে বিনোদিনীর নামে! লোকে যে ছ্যা ছ্যা করবে। বারাঙ্গনাকে দিয়ে নাটকে পার্ট করানো যায়, তাই বলে তার নামে থিয়েটার!

তিনি কায়দা করে বললেন, থিয়েটারের নাম নিয়ে পরে ভাবা যাবে,

আগে হোক তো। গুরমুখবাবু যদি এই থিয়েটারে টাকা দেন, বিনোদিনীর জন্যই দেবেন, কিন্তু যে-কোনও বিনোদিনীর চেয়ে থিয়েটার যে অনেক বড়, এটা কোনও দিন ভুলিস না বিনোদ।

না, না, গিরিশবাবু, আমি বিনোদিনীর নামেই থিয়েটার করব, ওর নামে শেয়ার লিখে দেবেন, গুরমুখ বলে ওঠেন, আমি নিজে শেয়ার চাই না, শুধু বিনোদিনীকে নিজের করে পেতে চাই।

অমৃতলাল বলেন, আপনার প্রস্তাব তো ভালই, কিন্তু জীবিত নট-নটীদের নামে তো থিয়েটার হয় না, তা ছাড়া বিনোদের নামে নাম দিলে লোকে আসবে না, সমাজের মাথারা বয়কট করবেন। কাজ কী অত ঝামেলায়, আমরা তো জানলাম আপনি বিনোদিনীকে দিলেন।

গুরমুখ বিনোদিনীর মতামত চান, কী গো সুন্দরী, আমি তো পঞ্চাশ হাজার টাকা এখনি তোমাকে ঢেলে দিতে পারি, তুমি ঠিক করো টাকা নিজে নেবে না এদের কথা শুনে সবটা থিয়েটারে ঢালবে?

না, না, গুরমুখবাবু, বিনোদিনী বললেন, আমার টাকার লোভ নেই। আপনি থিয়েটারের জন্যই টাকা দিন, গিরিশবাবু আমার নামে থিয়েটারের অংশীদারিত্ব লিখে দিলেই আমি খুশি হব।

বাবা, এ মেয়ে যে চমকে দিল, গুরমুখ হেসে ওঠেন, টাকাপয়সা চায় না, শুধু থিয়েটার করতে চায়, তার জন্য এত স্যাক্রিফাইস? কী জ্যোতিঠাকুর, এমন নটী আর দেখেছেন?

ক্ষুব্ধ বিরক্ত হতাশ জ্যোতি বিনোদিনীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁকে পিছু ডেকেও ফেরাতে পারেন না বিনোদিনী।

•

টাকা দিয়ে বিনোদিনীকে কিনে নিলেন গুরমুখ। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে নেন গিরিশ। কিন্তু বিনোদিনী তখনও খুঁতখুঁত করছেন। গুরমুখের শর্তটা মানতে পারছেন না। মাঝে মাঝে সঙ্গ দেওয়া এককথা, কিন্তু একেবারে রক্ষিতা হয়ে থাকতে তাঁর মন চায় না। একদিকে তাঁর সামনে রঙ্গালয়ের তারাভরা আকাশ, আর তিনি সেই আকাশের পরি; অন্যদিকে কালিমাখা জীবনযাপনের জন্য রঙ্গকর্মীদের জোরাজুরি। রূপোপজীবিনীর অতীতকে পেছনে ফেলে যত তিনি উত্তরণ চান, তত যেন সবাই মিলে তাঁকে সেই পাঁকে ডোবাতে চাইছে।

ক্যালকাটা স্টার কোম্পানির দলবল মিলে তাঁকে কাতর অনুরোধ করে। শেষে গিরিশ তাঁকে ডেকে বললেন, আর কোনও উপায় নেই রে বিনোদ, তুই থিয়েটার ভালবাসিস, থিয়েটারের জন্যে আজ তোর নিজেকে বলি দিতে হবে।

গিরিশের সকাতর অনুরোধ মানে বিনোদিনীর কাছে আদেশ। তা ছাড়া, থিয়েটার যখন তাঁর নামেই হচ্ছে, বিনোদিনী গুরমুখের বাসনায় নিজে বলিপ্রদত্ত হলেন। বিডন স্ট্রিটে জমি কেনা হল, আর কাছাকাছি বাড়ি ভাড়া করে রিহার্সাল শুরু হয়ে গেল। নাম নিয়ে দরকষাকষি চলছিলই, শেষ পর্যন্ত বিনোদিনীর আশা ছিল বিনোদিনী থিয়েটার না হোক, বি-থিয়েটার নাম হবে, গুরমুখ তাঁকে আদর করে সেই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন।

কিন্তু গিরিশ, অমৃতলালেরা কিছুতেই তাতে রাজি হলেন না। বিনোদিনীর কাছে খবর পৌঁছল নাম রেজিস্ট্রি হয়েছে 'স্টার থিয়েটার'। যে জন্য তিনি নিজেকে বিকিয়ে দিলেন সেই থিয়েটারে তাঁর নামের চিহ্নটুকু রাখা হল না, বিনোদিনী এত বড় প্রবঞ্চনায় ভেঙে পড়লেন। রিহার্সালেও তাঁর প্রতি সকলের ব্যবহার যেন পালটে গেছে, কেউ তাঁকে আগের মতো খাতির করছে না। অপরাধবোধ ঢাকার জন্য গিরিশও যেন তাঁকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। বিনোদিনীর চোখ ফেটে জল আসে। তিনি রিহার্সালে আসা বন্ধ করে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে রইলেন।

গুরমুখ হতাশ হয়ে পড়েন, এত টাকা ঢেলে কি এক শোকার্ত রমণীর সেবা করবেন? কোথায় গেল বিনোদিনীর হাসিমুখ, চমক ধমক! গিরিশের কাছে গিয়ে খুব রাগারাগি করলেন একদিন।

গিরিশও বুঝতে পারছিলেন, বিনোদিনীর সঙ্গে খুবই অন্যায় ব্যবহার করা হয়েছে। থিয়েটারের শেয়ার দেওয়ার ব্যাপারটাও কাটিয়ে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু এখনই বিনোদকে বাদ দিলে চলবে না, কারণ গুরমুখ রেগে যাচ্ছে আর দর্শকেরা আজও তার জন্য পাগল।

গিরিশ বিনোদিনীকে একটু সাধাসাধি করে ফিরিয়ে আনলেন। বিনোদের অবস্থা তো একবার সাধিলেই খাইব গোছের। রিহার্সালে না গিয়ে তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। সব বঞ্চনা তিনি মানিয়ে নিলেন। বাড়ি ফিরে নিজের খাতায় লিখে রাখলেন, 'থিয়েটার ভালবাসিতাম তাই কার্য করিতাম, কিন্তু ছলনার আঘাত ভুলিতে পারি নাই।'

১৮৮৩ সালের ২১ জুলাই স্টার থিয়েটারের উদ্‌বোধন হল গিরিশের লেখা 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক দিয়ে, সতীর ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় যেন আগের সব রোলকে ছাপিয়ে গেল। জনতার চাপে সেদিন থিয়েটারের গেট বন্ধ করা যায়নি, কত লোককে যে ফিরে যেতে হল তার ঠিক নেই।

গুরমুখের সঙ্গে ভালবাসার খেলায় মেতেছেন বিনোদিনী। সে-ই এখন তাঁর সুখদুঃখের সঙ্গী। এর মধ্যে একদিন বিনোদিনীর দখল নিতে উদয় হল তাঁর পুরনো প্রেমিক।

সে বললে, ওই গুরমুখ হারামজাদার কাছে তুমি কেন গেলে? যদি টাকার জন্য হয় তো ও তোমাকে যা দিচ্ছে আমি তার চেয়ে আরও দশহাজার টাকা বেশি দেব।

শুনে বিনোদিনী জ্বলে উঠলেন, যখন আমাকে ছেড়ে গেলে তখন মনে ছিল না? রাখো তোমার টাকা। আমি অনেক টাকা রোজগার করেছি কিন্তু টাকা কোনও দিন আমাকে কিনতে পারে না। ওরকম দশ-বিশ হাজার আমার কত আসবে।

বিনোদিনীর কথায় রেগে উঠে সেই পুরনো প্রেমিকটি তলোয়ার খুলে তেড়ে এল তাঁর দিকে। ঘরে লণ্ডভণ্ড বেঁধে গেল। তার প্রতি বিনোদিনীর যেটুকু প্রেম অবশিষ্ট ছিল, এই ঘটনায় তা প্রায় উবে গেল। তার হাত থেকে রক্ষা করতে বিনোদিনীকে নিয়ে কিছুদিন কলকাতার বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ালেন গুরমুখ। শহরে শুরু হল তাঁদের নিয়ে কেচ্ছার ফুলঝুরি।

কলকাতা ফেরার পর একদিন গুরমুখ বললেন, বিনোদ, বাড়ির লোকেদের চাপে আমার তো জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। এবার বোধহয় আর উপায় নেই, তোমাকে ছেড়ে বাড়ি ফিরতে আমার মন চায় না, কী যে করি?

বিনোদিনীর চোখ ছলছল করে। ভেজা গলায় অতলজলের মতো চোখদুটি তুলে তিনি বললেন, তোমার আবদারে আমি সব ছাড়লাম। প্রেমিক ছাড়লাম, জ্যোতিঠাকুরের মতো অমন মানীজনকে ফেরালাম, আর এখন তুমি আমাকে ভাসিয়ে চলে যাবে?

উনিশের গুরমুখের মুখে বাসনা ও বেদনার টানাপোড়েন যেন মেঘ ও রৌদ্রের মতো ছায়া ফেলে। মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের অত্যন্ত ধনী সন্তান, কিছুদিন যথেচ্ছাচার করার পরেই আত্মীয়রা পেছন থেকে রাশ টেনে ধরেছে।

তাতেও তাকে বিনোদিনীর কক্ষচ্যুত করা যাচ্ছিল না, কিন্তু শেষমেষ মায়ের আত্মহত্যার হুমকিতে নড়ে গেছেন গুরমুখ।

যেতে চাই না কিন্তু মায়ের জন্য ফিরে যেতে হবেই বিনোদ। গুরমুখ তাঁর কোলে মাথা গুঁজে বলেন, কিন্তু ভাসিয়ে যাব না, যাওয়ার আগে তোমার ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব।

তুমি যদি চলেই গেলে, কোন ব্যবস্থা নিয়ে আমি সুখে থাকব? তা ছাড়া, বিনোদিনী উদ্‌বিগ্ন হন, তোমার সঙ্গে থাকার আগে একরকম ছিল, এখন যে দলের লোকেদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা পালটে গেছে। আমার জন্য তুমি দল গড়ে দিলে আর সেটার মালিক হল পাঁচভূতে। আমি এখন ফেলনা।

তা হতে দেব না বিনোদ, গুরমুখ দৃঢ়স্বরে বলেন, তুমি আমাকে অনেক আনন্দ দিয়েছ আর স্টারের পেছনে তোমার ভূমিকা কতটা তাও আমি জানি। এবার আমার সব শেয়ার তোমার নামে ট্রান্সফার করে দেব। তুমি হবে স্টারের অংশীদার।

কিন্তু তা হল না। গিরিশরা হতে দিলেন না। একজন বারাঙ্গনার অধীনে কাজ করতে কেউই রাজি হলেন না। বিনোদিনীকে মানাতে না পেরে গিরিশ তার মায়ের কাছে গেলেন মধ্যস্থতার জন্য। বিনোদিনী গোঁ না ছাড়লে সমূহ বিপদ। থিয়েটার লাটে উঠবে।

জলের দরে এগারো হাজার টাকায় স্টার কিনে নিলেন গিরিশের সহযোগী চার অংশীদার অমৃতলাল বসু, দাশুচরণ নিয়োগী, হরিপ্রসাদ বসু ও অমৃতলাল মিত্র। আবার বঞ্চিত হলেন বিনোদিনী।

পুরনো প্রেমিক চলে গেছে, গুরমুখ সরে গেল, গিরিশ ছলনা করলেন, নাটকের সহশিল্পীরাও দূরে সরে গেছে। রাশিরাশি ভক্ত দর্শকেরা আছে, কিন্তু রঙ্গপটের আলো নিভে গেলে তারাও মিলিয়ে যায়। নিজের মানুষ বলে কেউ নেই।

এই অবস্থায় মাত্র একজনের কাঁধেই মাথা রেখে কাঁদবার জায়গা খুঁজে পেলেন বিনোদিনী, তিনি জ্যোতিঠাকুর।

১৭

মৃণালিনী

রবির বিলাতযাত্রার দ্বিতীয় চেষ্টাও যখন ব্যর্থ হল, দেবেন ঠাকুর ঠিক করলেন তাঁর বিয়ে দেবেন। কাদম্বরী একটু সামলে উঠেছেন দেখে রবি তাঁর ভাগনে সত্যকে নিয়ে এবার বিলেতের জাহাজেও উঠেছিলেন। কিন্তু যত জাহাজ দূরে যায়, ততই বাড়ির টান বাড়তে থাকে সত্যর মনে। যদিও দু'-তিন বছর বিয়ে হয়েছে, তবু বউয়ের মুখ মনে পড়ে তার বুক হু হু করে। মাদ্রাজ পর্যন্ত গিয়ে সত্য বেঁকে বসল, আর যাবে না। তার নাকি পেটব্যথা, রক্ত আমাশা। এখান থেকেই সে কলকাতা ফিরবে। এই জাহাজে রবির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে আশুতোষ চৌধুরীর। রবি ফিরতে চান না, কিন্তু যখন আশু ও রবি মিলে প্রাণপণ চেষ্টাতেও সত্যকে আটকে রাখা গেল না, তখন তার সঙ্গে রবিও লটবহর গুটিয়ে জাহাজ থেকে নেমে পড়লেন।

নেমে পড়লেই তো হল না, এবার জবাবদিহির পালা। রবি ভয়ে ভয়ে বাবামশায়কে টেলিগ্রাম করলেন মাদ্রাজ থেকেই। দেবেন অপরাধী দু'জনকে তক্ষুনি নির্দেশ দিলেন সোজা মুসৌরিতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। সুতরাং মাদ্রাজ থেকে সুরাটে সত্যেনের কাছে একদিন কাটিয়ে মুসৌরি পৌঁছলেন রবি।

দেবেন এখন বেশ কিছুদিন ধরেই পাহাড়ে থাকছেন। দার্জিলিং থেকে নেমে কলকাতা হয়ে নৌকো করে এসেছিলেন হরিদ্বার। তারপর দেরাদুন হয়ে মুসৌরিতে আশ্রয় নিয়েছেন বেশ কিছুদিন। মাঝে মাঝে সার্জেন ম্যাকলারেনের কাছে অর্শ, পায়ের ঘা ইত্যাদি চিকিৎসার জন্য দেরাদুনে নেমে আসেন, আবার ফিরে যান মুসৌরিতে। ছেলে আর জামাইরা এসে ঘুরে যান মাঝে মাঝেই। জ্যোতি এসে একমাস কাটিয়ে গেছেন। বর্ণকুমারীর স্বামী

সতীশ স্কটল্যান্ড থেকে ডিগ্রি নিয়ে ফিরে দেখা করতে এলেন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে। জামাতার সাফল্যে খুশি হয়ে মহর্ষি মেয়ে-জামাইকে বারো হাজার টাকার চেক উপহার দিয়েছেন, নিজস্ব বাড়ি করার জন্য। টাকা দিয়েছেন স্বর্ণকুমারীকেও।

রবি ও সত্যকে বিশেষ বকুনি দিলেন না দেবেন্দ্রনাথ, সত্য যেতে পারবে কি না তা নিয়ে তিনি আগে থেকেই সন্দিহান ছিলেন। রবিকে বললেন, ব্যারিস্টার হওয়া যখন তোমার কপালে নেই, এবার বিয়ে করে সংসারী হও।

রবি মাথা নিচু করে নিরুত্তর বসে থাকলেন। তাঁর মোটেই একটি নিরক্ষর বালিকাকে বিয়ে করার ইচ্ছে নেই। কিছুদিন বাবার কাছে কাটিয়ে ঘরে ফিরে এলেন তিনি।

শুরু হয়ে গেল রবির পাত্রী খোঁজার তোড়জোড়। জ্ঞানদার ইচ্ছে রবির উপযুক্ত বউ খুঁজে আনবেন তিনিই, তারপর তাকে ঘষেমেজে বিবির সঙ্গে কনভেন্ট স্কুলে পাঠাবেন। কাদম্বরীর আবার কনভেন্ট-চর্চায় আস্থা নেই, তিনি চান রবির বউকে কাব্যসাহিত্যের পাঠ দিতে। এবার আর দাসী পাঠিয়ে বউ খোঁজা হবে না, বউঠানেরা নিজেরাই রবির পাত্রী খুঁজতে যাবেন ঠিক করলেন। ঠাকুরবাড়ির ইতিহাসে এ এক নতুন ঘটনা।

এক ধনী মাদ্রাজি জমিদারের মেয়ের সঙ্গে রবির বিয়ের প্রস্তাব এল, মেয়েটি সাতলক্ষ টাকার উত্তরাধিকারিণী। দল বেঁধে জ্যোতি, জ্ঞানদা, কাদম্বরীরা রবিকে নিয়ে চললেন পাত্রী দেখতে। জমিদারগৃহে প্রথমেই দুটি অল্পবয়সি মেয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে এলেন। তার মধ্যে রূপসি, তুখোড় মেয়েটিকে সবার মনে ধরল। গান নিয়েও অনেক আলাপ করলেন মেয়েটি। চুপচাপ, সাধাসিধে অন্যজন সবার অলক্ষ্যে দামি কাপড়ে জড়ানো পুঁটুলির মতো বসে রইলেন। এরপর ঘরে এলেন গৃহকর্তা জমিদারমশাই। মদ্রজা রূপসিটিকে দেখিয়ে বললেন, আলাপ করিয়ে দিই, হিয়ার ইজ মাই ওয়াইফ। আর জড়ভরত মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন, হিয়ার ইজ মাই ডটার। অতিথিরা কোনওরকমে এ ওর সঙ্গে চোখাচোখি করে ভদ্রতা বজায় রাখলেন আর বাড়ি ফিরে হাসিতে ফেটে পড়লেন।

আহা, রবির খুব মনে ধরেছিল জমিদারগিন্নিকে, হেসে গড়িয়ে পড়েন কাদম্বরী। জ্ঞানদাও হাসিতে যোগ দিয়ে বললেন, এবার দেখছি আর ঝুঁকি না নিয়ে রবির জন্য মৃণালিনী খুঁজতে যশোরেই যেতে হবে।

জ্যোতিও হাসতে হাসতে বলেন, হ্যাঁ, যশোরের কোনও এক মেয়ে নিশ্চয় রবির জন্য তপস্যা করছে, রবি তাকে উদ্ধার করবে বলে।

জ্যোতি, রবি, জ্ঞানদা, কাদম্বরী সবাই দল বেঁধে জ্যৈষ্ঠমাসের ভ্যাদভ্যাদে গরমে যশোর রওনা দিলেন, সঙ্গে চলল রূপা, বিবি, সুরেন আর দাসদাসী বামুনঠাকুর। আস্তানা নেওয়া হল জ্ঞানদার ভাইদের বাড়িতে। প্রায় প্রতিদিনই চেঙ্গুটিয়া, দক্ষিণডিহি ইত্যাদি আশেপাশের নানা জায়গায় পালকিতে, নৌকোয় কনে দেখার পর্ব চলল। কিন্তু যশোরে এবার যেন পাত্রী কম পড়েছে, কাউকে আর বউঠানদের মনে ধরে না।

জ্যৈষ্ঠের ভ্যাপসানির সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল কিছুদিনের মধ্যেই। এদিককার গ্রামের রাস্তাঘাট কাদামাখা, পিছল। মেয়েরা সাধারণত পালকিতেই যাতায়াত করছেন, কাছাকাছির মধ্যে হলে রবি-জ্যোতিরা পাড়ার অন্য পুরুষদের সঙ্গে পায়ে হাঁটেন। ঠাকুরবাড়ির লোকেদের এমন রাস্তায় চলাফেরা করার অভ্যেস নেই বলেই প্রতিপদে পড়ে যাবার আশঙ্কা।

সেই আশঙ্কাই একদিন সত্যি হল, দক্ষিণদিহি গাঁয়ের এক পাত্রী দেখার অভিযানে পেছল রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে কাদায় আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন স্বয়ং পাত্র। লখনউ চিকনের বাহারি আচকান ও ঢাকাই চাদরে সুসজ্জিত রবির সারা গা কাদায় মাখামাখি। নতুনবউঠানের স্বহস্তে নকশা করা কার্পেটের জুতোজোড়া আর খুঁজেই পাওয়া গেল না। আর কী আশ্চর্য, রবির এহেন দুর্বিপাকে কে একটা মেয়ে যেন আশপাশ থেকে হেসে উঠল। বিব্রত রবির মনে হল, 'কোথা হইতে এক সুমিষ্ট উচ্চকণ্ঠে তরল হাস্যলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া নিকটবর্তী অশথগাছের পাখিগুলিকে সচকিত করিয়া দিল।'

সকলেই রবিকে টেনে তুলতে ব্যস্ত, পেছনের পালকি থেকে বউঠানেরা উঁকিঝুঁকি দিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ হাসির উৎস খোঁজারও চেষ্টা করছে। বেচারা রবিরও চোখে পড়ল, একরাশ নতুন ইটের পাঁজার ওপর বসে একটি মেয়ে হাসির চোটে এখনই শতধা হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। একজন ছুটে গিয়ে অপরাধী বালিকাকে ধরে নিয়ে এল।

দেখা গেল লোকটি ঠাকুরবাড়ির কাছারির কর্মচারী বেণী রায় মশাই, আর মেয়েটি তাঁরই বালিকা কন্যা ভবতারিণী। বেণী ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন। গাঁয়ের রাস্তায় হঠাৎ মনিবদের দেখে তিনি যেমন আপ্লুত, কন্যার অশিষ্ট আচরণে তেমনই সংকুচিত। জ্যোতি আর রবিকে তিনি নিজের বাড়ি নিয়ে

যাওয়ার জন্য পেড়াপেড়ি শুরু করলেন। বিশেষত, রবিবাবুর পোশাক বদলানো দরকার। ছোটবাবুর উপযুক্ত জামাকাপড় না দিতে পারলেও পরিষ্কার ধুতিচাদর তো বেণী রায় দিতে পারবেন!

জ্যোতি ভেবে দেখলেন, কথাটা ঠিক। রবি এরকম কাদা মেখে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, এ অবস্থায় তো পাত্রীর বাড়ি যাওয়াও যাবে না। অগত্যা সদলবলে বেণী রায়ের বাড়িতে হাজির হলেন তাঁরা। সেখানে গিয়ে বেণীর মেয়ের কীর্তি সবিস্তারে জানতে পেরে হেসে কুটিপাটি হতে থাকলেন জ্ঞানদা ও কাদম্বরী। তাঁদের সামনে অবশ্য বেশ সাজিয়ে গুজিয়েই নিয়ে আসা হল ভবতারিণীকে।

মেয়েটি মন্দ নয়, কুটুমবাড়িতে ফিরে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসে কাদম্বরী বলেন, সুন্দরী না হলেও বেশ সরল আর চটপটে মনে হচ্ছে। এর সঙ্গে রবিকে মানাবে ভাল।

জ্যোতি মজা করে বলে ওঠেন, এ-সব আশ্চর্য রহস্য কী করে বোঝ তুমি বউ? এ মেয়ের চেয়ে রূপসি কি রবির জুটবে না মনে কর?

জ্ঞানদাও খুঁতখুঁত করেন একটু, আর ক'টা মেয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিলেই হবে। ভবতারিণী তো গানও জানে না, লেখাপড়াও না!

কাদম্বরী একমত হন না, ও-সব শিখিয়ে নিলেই হবে, ঠাকুরবাড়ির বউরা আবার কবে কী শিখে এসেছে, জোড়াসাঁকোর পাঠশালাতেই আমাদের সব শিক্ষা।

জ্যোতি জানতে চান, এত মেয়ে দেখে শেষে একেই কী দেখে তোমার এত ভাল লাগল বলো তো? রবিকে বেকায়দায় ফেলেছে বলে?

কাদম্বরী বলেন, কেন দেখছ না, এ মেয়েটি অন্যদের মতো গেঁয়ো নয়, লজ্জায় একেবারে জড়ভরত হয়ে বসে থাকে না, সহজভাবে কথা বলতে পারে। একে বেশ শিখিয়ে পড়িয়ে মনোমতো করে গড়ে নেওয়া যাবে।

আসলে রবির সুন্দরী বউ আসুক কাদম্বরী তা চায় না, জ্ঞানদা হাসতে হাসতে ঢিল ছুড়লেন, বউ বেশি সুন্দরী হলে রবি তার নতুনবউঠানকে ভুলে যায় যদি!

জ্ঞানদার বাক্যবাণে কাদম্বরীর মনে লাগে। কী কুটিল মেজোবউ! তিনিও জবাব দিতে ছাড়েন না, তা কেন বলছ মেজদি, রবির বউয়ের সঙ্গে আমার কোনও প্রতিযোগিতা নেই। সে হবে আমার অতি আদরের। আমি যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছি, তা যেন তাকে সইতে না হয়!

এবার জ্ঞানদার গায়ে হুল ফোটে যেন, শোনো নতুনবউ আমি যা যা করেছি, আমি যা সয়েছি, তা তুমি·সাতজন্মেও পারবে না।

রবি এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, এবার আর পারেন না। বলে ওঠেন, দোহাই তোমাদের বউঠান, আবার শুরু কোরো না। এরকম করলে তো আমি বিয়েই করব না। বরং ভাবছি, এই মেয়ে দেখা কাণ্ড নিয়ে একটা গল্প লিখে ফেলব।

কাদম্বরী হাসতে হাসতে বলেন, শোনো রবি, তোমার সেই গল্পে পাত্রের কাদায় পড়ে যাওয়ার কথাটা লিখতে ভুলো না যেন!

আর তাই দেখে পাত্রীর খিলখিল করে হেসে ওঠার কথাটাও বাদ দিসনে যেন। জ্যোতি যোগ করেন।

তারপরেই কাদম্বরীর পিঠে হাত রেখে বলেন, শোনো বউ, তোমার এ মেয়েটাকে পছন্দ হয়েছে, ভাল কথা। আর দু'-একটা মেয়ে দেখলে যদি মেজোবউঠানের শান্তি হয় তাতেই বা আপত্তি কীসের? তারপর না হয় ভাবা যাবে। রবির মতামতটাও তো শুনতে হবে আমাদের।

ঘন মেঘের মতো পরিবেশটাকে একটু হালকা করার জন্য রবি বলেন, না বউঠান, আমার আর বিয়ে করার জন্য তর সইছে না, গান না জানুক, লেখাপড়া শিখুক না শিখুক, কাল সকালে উঠে যে মেয়েকে দেখবে তার গলাতেই ঝুলিয়ে দাও আমাকে। আর পণ্ডিতেরা তো স্ত্রীলোককে লেখাপড়া শেখাতে বারণ করেন, ঘরের বউ একবার নাটক-নভেল পড়া ধরলে তার সংসারধর্ম নাকি লাটে ওঠে!

কাদম্বরী হাত বাড়িয়ে চুল ধরে নেড়ে দিয়ে বলেন, দাঁড়াও, তোমার পণ্ডিত ভজনার ফল দেখাচ্ছি।

রবির হাতে একটি পত্রিকা, তিনি হাসতে হাসতে সরে গিয়ে বলেন, দেখো জ্যোতিদাদা, সেই তোমার লাজুক বালিকাবউটি লেখাপড়া শিখে কেমন মারমুখি হয়ে উঠেছে! ঠিকই লিখেছেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শোনো, পড়ে শোনাই, 'ছেলেরা ইংরাজী শিখিয়া সাহেব হইয়াছেন, মেয়েরা ইংরাজী না শিখিয়াই বিবি হইতে বসিল।— গৃহ এবং গৃহোপকরণ অপরিচ্ছন্ন থাকে, খাওয়া দাওয়া খারাপ হয়, শরীর মাটি হইয়া যায়...'—

ইস, তাই বইকী! কাদম্বরী ফুঁসে ওঠেন, লেখাপড়া না শিখলে পরিচ্ছন্নতা ব্যাপারটাই বোঝা যায় না, এটা তোমাদের ভূদেববাবুকে সামনে পেলে বুঝিয়ে দিতাম।

জ্ঞানদাও হাসতে হাসতে যোগ দেন, ভূদেববাবুদের জন্যই এ দেশের মেয়েদের উন্নতি আটকে আছে। ওঁদের একবার বিলেতে ঘুরে আসার দাওয়াই দেওয়া দরকার, তা হলে দেখতে পেতেন শিক্ষিত মেয়েরা ঘরকন্না করবে না— এ ধারণা কত ভুল। বরং ওদের কাছেই আমরা গুছিয়ে সংসার করার পাঠ নিতে পারি। রবি একটু কড়া করে এ-সব লেখার জবাব দিতে পার না!

জ্যোতিরিন্দ্র হাসতে থাকেন, রবিকে বলছ মেজোবউঠান, রবি সেই যে বিলেতের মেয়েদের ভূরি ভূরি প্রশংসা করে ভারতীতে লিখেছিল, তাই পড়েই তো বাবামশাই ভয় পেয়ে গেলেন, রবি না আবার মেম বিয়ে করে বসে! সেজন্যই রবিকে মাঝপথে পড়া থামিয়ে দেশে ফেরার হুকুম দিলেন। আবার ওকে লিখতে বলছ!

রবি হাসতে হাসতে বললেন, আমাকে লিখতে হবে কেন, এখন তো তোমাদের মধ্য থেকেই সরস্বতী বীণাবাদিনীরা বেশ প্রতিবাদ করে লিখছেন, আমাদের 'ভারতী'তে লাহোরিণীর লেখাই বা কম কীসে?

সেই লেখার জন্য শ্বশুরবাড়িতে ওকে অনেক নিন্দেমন্দও শুনতে হয়, কাদম্বরী বলেন। অথচ ও তো সত্যি কথাই লিখেছে। মেয়েদের পোশাক আশাক কী রকম হবে তা কেন পুরুষেরা ঠিক করে দেবেন?

জ্ঞানদা কাদম্বরীর দিকে তাকিয়ে বলেন, আচ্ছা, নতুনবউ, তুমি ভাবো তো, যে রবি বিলিতিবালাদের দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিল, তার এখন এই গ্রামবাংলার ভবতারিণীকে কি পছন্দ হবে? রবি আবার ভবতারিণীর পোশাক ডিজাইন করতে চাইবে না তো?

তা হলে আর তুমিই বা কেন গ্রামবাংলায় ছুটে এলে মেজোবউঠান? রবি কাদম্বরীকে বাঁচাতে চান, আমার বিয়ের জন্য সরাসরি বিলেতের গোরিমেম খুঁজলেই পারতে!

তা হলে তোমার ভবতারিণীকে খুব পছন্দ হয়েছে বলো? জ্ঞানদা গোমড়া মুখে বললেন, তোমাদের দেওর-বউঠানের যখন এত পছন্দ, তা হলে আমিই বা মেয়ে খুঁজে মরি কেন? যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর!

কিংবা বলা যায়, যার বিয়ে তার হুঁশ নেই, পাড়াপড়শির ঘুম নেই। জ্যোতি ফোড়ন কাটেন, মেজোবউঠান, তুমি বরং ভবতারিণীকে বেশ করে সর-ময়দা মাখানোর ব্যবস্থা কোরো, যেমন মা তোমাদের মাখাতেন!

মুখ দেখে রবি বুঝতে পারেন মেজোবউঠান চটেছেন। দুই জায়ের মন

কষাকষিতে তিনি যে কাদম্বরীর পক্ষ নিয়ে ফেলেছেন! তাড়াতাড়ি জ্ঞানদার পায়ের কাছে বসে পড়ে মানভঞ্জনের জন্য তিনি বলেন, হে দেবী, তুমি ক্রুদ্ধ হলে সামান্য এই মানবসন্তান আর বিয়েই করবে না। এই দুষ্টু বালিকাকে বিয়ে করতে আমার বয়েই গেছে। বিয়েতে কাজ নেই, তার চেয়ে চলো যশোরের ভ্যাপসা গ্রামপথ ছেড়ে আমরা সেই মেঘাচ্ছন্ন ব্রাইটন ভিলায় ফিরে যাই।

যশোরের পথে আচমকাই একদিন রবি ও জ্যোতির দেখা হয়ে গেল হ্যারিসাহেবের সঙ্গে। চুল উসকোখুসকো, উদাস উদাস ভাব। তাঁর সঙ্গে আরও উসকোখুসকো একটি কিশোর। জানা গেল সে ছেলেটি স্বদেশি করে। হ্যারি এই স্বদেশি দলটার সঙ্গে খুব জড়িয়ে পড়েছেন। তাঁরা গ্রামের মানুষের সাহায্য সমর্থনও জোগাড় করতে চান।

হ্যারিকে নিয়ে রবি জ্যোতিরা কুটুমবাড়িতে পৌঁছতেই রূপা কোথা থেকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল, হ্যারিকে দেখে তার আনন্দ আর ধরে না। হ্যারি যেভাবে এদেশের স্বরাজের জন্য স্বদেশিদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, তাতে গর্বে বুক ভরে ওঠে রূপার। কিন্তু এত লোকের মাঝে কোনও কথাই বলা সম্ভব নয়, আর পাড়াগাঁয়ে পুরুষের সঙ্গে কথা বলায় আরও কড়াকড়ি। দু'-একটি কথা বলেই কাদম্বরীর রক্তচক্ষুর ভয়ে ভেতরে চলে যেতে হল তাকে।

চা-জলখাবার দেওয়ার অছিলায় রূপা আরও একবার বৈঠকখানাঘরে এল। হ্যারি একটি চিরকুট গুঁজে দিলেন তার হাতে। দুরুদুরু বুকে রূপা চিরকুট নিয়ে সোজা পুকুরপাড়ে চলে যায়, খুলে দেখে কাল দুপুরে পাড়ার পোড়োমন্দিরের পেছনে দেখা করতে বলেছেন হ্যারি। রূপার রক্তে বিপ্লবের ছোঁয়া লাগে।

আরও যে ক'দিন ঠাকুর পরিবার যশোরের কুটুমবাড়িতে রইলেন, রূপা আর হ্যারির গোপন অভিসার ততদিনই চলতে লাগল। প্রেমের ঘোড়া যত ছুটল ততই বেগবান হয়ে উঠল ওদের বিপ্লবের স্বপ্ন। হ্যারির ঝুলি থেকে বেরনো লালশালুতে মোড়ানো গীতার ওপর হাত রেখে, অজানা ভবিষ্যতের তোয়াক্কা না করে, পোড়োমন্দিরের ভাঙা সিঁড়িতে বসে ওরা আজীবন পাশে থাকার শপথ নিল।

ওদিকে, সারা যশোর চষে ফেলেও ভবতারিণীর চেয়ে পছন্দসই কোনও মেয়ে খুঁজে পেলেন না জ্ঞানদা। অগত্যা বেণী রায়ের মেয়ের সঙ্গেই রবির

বিয়ে দেওয়া হবে, মোটামুটি এই সিদ্ধান্ত নিয়ে যশোর ছাড়লেন ঠাকুর পরিবার। রূপাও চোখের জলে হ্যারির কাছে বিদায় নিল।

রবি অবশ্য জোড়াসাঁকোয় ফিরে বিয়ে নিয়ে ফের দোনোমনো করছিলেন। জ্যোতির কাছে খবর পেয়ে দেবেন ঠাকুর জরুরি তলব করলেন রবিকে মুসৌরিতে। এবার ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাসে রবির সঙ্গী হল বিবি আর সুরেন। প্রিয় দুই বালক বালিকার সঙ্গে অনর্গল গান, কথা, দুষ্টুমি, খুনসুটিতে রবির যাত্রাপথটি বেশ ছেলেমানুষি রোমাঞ্চে ভরে উঠল। এ-যাত্রায় তাঁদের সঙ্গে কোনও দাসীচাকর ছিল না। তাই খাওয়াদাওয়ার পর কখনও ট্রেনের টয়লেটে গিয়ে এঁটো বাসন ধুতে হচ্ছে বিবিকে আর কখনও সুরেন গিয়ে খাবার কিনে আনার চেষ্টা করছে। জীবনের এ-সব অনিবার্য শিক্ষার মধ্যে দিয়েই তারা স্বাধীনতা উপভোগ করছে।

এবারে মহর্ষি বিয়ে না করার জন্য রবিকে ধমক দিলেন। এভাবে বসে থাকলে চলবে না, সংসারী হয়ে পারিবারিক কাজকর্মে মনোযোগ দিতে হবে, জমিদারির কাজ শিখতে হবে। এরপর আর রবির কোনও আপত্তি টেকেনি, ঠাকুরবাড়ির সরকারি খাতায় 'রবিবাবুর বিয়ের হিসাব' লেখা শুরু হয়ে গেল। যশোরে দূত পাঠিয়ে পাকা কথার সঙ্গে আশীর্বাদী পাঠানো হল হিরের গয়না ও পুতুল।

শহর কলকাতা তখন আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথের দু'মাসের কারাবরণ ও মুক্তির তামাশা নিয়ে উত্তাল। মুক্তির পর তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হল নিমতলার ফ্রি চার্চ কলেজে। দেশপ্রেমের জোয়ারে ছাত্রদল ও তরুণেরা সুরেন্দ্রনাথকে মাথায় তুলে নিল। জনসভায় রবি সুরেন্দ্রনাথের জন্য কয়েকটি নতুন গান গাইলেন।

কিন্তু রবির কোনও লেখায় ঘটনার উল্লেখমাত্র না দেখে অনেকেই ভুরু তুললেন। বিশেষত পরিবারের মধ্যে থেকেই স্বর্ণকুমারী প্রশ্ন করলেন, রবি তোর কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করে লেখা উচিত ছিল!

রবি বিরক্ত হন, ন'দিদি, তোমার আর আমার ভাবনা যে সব সময়ে এক হবে এটা ধরে নিচ্ছ কেন? ওঁর জন্য গান লিখে গাইলাম তো, আবার প্রতিবাদ করে লিখতে হবে তার কী মানে আছে? কোনওকিছুতেই এত বাড়াবাড়ি আমার পছন্দ নয়।

কট্টর জাতীয়বাদী জানকীনাথ এ ব্যাপারে অতি উৎসাহী। জানতে চান, কেন রবি, বাড়াবাড়ি কীসে দেখলে?

রবি হাসেন, এই যে তোমাদের বাচ্চা মেয়ে সরলা আর তার বন্ধুদের এমন দেশপ্রেম জেগেছে যে এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে রোজ কালো ফিতে হাতে বেঁধে স্কুলে যাচ্ছে, এটা বাড়াবাড়ি না? ওরা পলিটিকসের কী বোঝে? আমি তো শুনেছি, বেথুনের উঁচু ক্লাসের ওর দুই মন্ত্রদাত্রী কামিনী রায় ও অবলা বসু যা শেখান ওরা অন্ধের মতো তাই অনুসরণ করে। এতে অহেতুক উত্তেজনা ছড়ায় কিন্তু প্রকৃত দেশপ্রেম জাগে না।

স্বর্ণ রুষ্ট হয়ে বলেন, যাই বল রবি, আমি তোর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। সরলা এর মধ্যে এত কাণ্ড করেছে জানতাম না ঠিকই, কিন্তু শুনে আমার রীতিমতো গর্ব হচ্ছে।

কিন্তু এ-সব বাড়াবাড়িতে আমার মন সায় দেয় না। ছাত্রসমাজের কাছে জাতীয়তা যেন গভীর উপলব্ধি না হয়ে নিছক হুজুগ হয়ে উঠছে। আর এই উপলক্ষে বাংলা সংবাদপত্রগুলি যেভাবে রুচিহীন ইংরেজ-নিন্দায় মেতে উঠেছে তাও তো অসহ্য। ভদ্রলোকের তিরস্কারই বা ভদ্রভাষায় হবে না কেন? রবি প্রশ্ন তোলেন।

স্বর্ণ ও জানকী নিজেদের কাজের বাইরে সারাদিন মেতে থাকেন জাতীয়তা আর থিওসফির চর্চায়। দুটো বিষয়ের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ নেই, কিন্তু দুটিতেই স্বামী-স্ত্রীর সমান উৎসাহ। একদিকে জানকীর কংগ্রেসি রাজনীতি আর অন্যদিকে থিওসফিকাল সোসাইটির পরলোকচর্চা।

মহিলা থিওসফিকাল সোসাইটির সভাপতি হয়েছেন স্বর্ণ। তাঁর কাশিয়াবাগানের বাড়িতেই জড়ো হন সবাই, যেসব মহিলাদের স্বামী বা বাড়ির পুরুষরা থিওসফিস্ট তাঁরাই সদস্যা। কলকাতার অভিজাত পরিবারগুলির অনেক মহিলার সঙ্গে এভাবে বন্ধুত্ব হয়েছে স্বর্ণকুমারীর। থিওসফিকাল সোসাইটির দুই প্রতিষ্ঠাতা মাদাম ব্লাটাভস্কি ও কর্নেল অলকট প্রায়ই আসেন। তাঁরা মেয়েদের দীক্ষা দেন, মহিলারা তাঁদের স্থান দেন ভগবানের পরেই।

একদিন রবি গিয়ে দেখলেন সবাই হলঘরে বসে আছেন। অলকট সাহেব কী একটা কথা বলতে বলতে শোঁ করে হলঘরের পাশের শোবার ঘরে চলে গেলেন, দু'-এক মিনিট পরে ফিরে এসে বললেন যে, মহাত্মা কুথোমির আবির্ভাব হয়েছিল ওই ঘরে, তিনি তাঁর বার্তা শোনার জন্য ডাক পাঠিয়েছিলেন অলকটকে, শুনিয়ে চলে গেছেন।

উপস্থিত মহিলারা বিস্ময়ে আনন্দে শিউরে উঠলেন, স্বর্ণ যেন দিব্যবিভায় আলোকিত হয়ে উঠলেন। মহাত্মা কুথোমির অলৌকিক আবির্ভাবে পবিত্র হয়ে গিয়েছে তাঁর ঘরবাড়ি। তাঁর বড় মেয়ে হিরণ্ময়ী তো দীক্ষিত হয়েছেই, পরিবেশে এমন অপার্থিব আবেশ তৈরি হয়েছে যে বাচ্চা সরলাও আবদার করতে লাগল দীক্ষা নেওয়ার জন্য। রবি নিজেও একটু-আধটু পরলোকচর্চা করেন, প্ল্যানচেটে তাঁর তীব্র আগ্রহ। কিন্তু থিওসফিকাল সোসাইটির এই আবহ তাঁর কাছে ভাঁওতাবাজি মনে হল। ন'দিদি কী করে এ-সবের মধ্যে ডুবে গেলেন কে জানে! ক্রমশই তাঁর সঙ্গে রবির মনের অনেক দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। তিনি কাশিয়াবাগান থেকে নিঃশব্দে পালিয়ে এলেন।

আরেকপ্রস্থ হইচই শুরু হল কারোয়ারে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে। কাশিয়াবাগানে আর জোড়াসাঁকোর বৈঠকখানায় দরজি বসেছে নানারকম পোশাক সেলাই করতে। কাদম্বরী স্বর্ণকুমারীরা নতুন নতুন ডিজাইনের জ্যাকেট করতে দিয়েছেন। ঠাকুরবাড়ির একটা বড় দল মিলে কারোয়ার বেড়াতে যাওয়া ঠিক হয়েছে। সদর স্ট্রিটের দল অর্থাৎ জ্যোতি, রবি ও কাদম্বরী, কাশিয়াবাগান থেকে জানকী ও স্বর্ণকুমারী, জোড়াসাঁকোর সৌদামিনী ও প্রতিভা সবাই যাবেন। কর্নাটকের পাহাড় ঘেরা এই অপরূপ সমুদ্রশহর এখন সত্যেনের কর্মস্থল।

রবির মনে আসন্ন বিয়ের চাপ। পারবেন কি মানিয়ে নিতে? সমুদ্রতীরে হাঁটতে হাঁটতে কাদম্বরীর কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করে ফেলেন তিনি, কোথাকার কোন এক বালিকা এসে জীবনটাকে বদলে দেবে! সেই ভীরু গ্রামবালিকার সঙ্গে কী কথা বলব নতুনবউঠান?

সমুদ্রের ঢেউ এসে প্রবল কোলাহলে আছড়ে পড়ে রবির পায়ের কাছে, যেন তারা রবিকে আশ্বাস দিতে চায়।

প্রথম সমুদ্র-দর্শনে এসে কাদম্বরীর মন খুশি খুশি। তিনি রবির গালে টোকা দিয়ে বলেন, আহা, বউয়ের সঙ্গে কী কথা বলবে তা আবার শিখিয়ে দিতে হবে নাকি? ও তো সরলা ইন্দিরাদের বয়সি, ওদের সঙ্গে এত কথা বল আর বউয়ের সঙ্গে পারবে না?

না বউঠান, তুমি বুঝতে পারছ না, রবির গলায় উদ্‌বেগ, কথা বলার আগে তো তাকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে নিতে হবে! আমার এত সময়

কোথায়? বিবি, সরলা তো আমাদের মেয়ে, আমাদের বাড়ির আবহাওয়ায় বড় হয়েছে। তাদের সঙ্গে সেই বালিকার তুলনা?

সে তো হবেই। কাদম্বরী বলেন, শোবার ঘরের সেই শিক্ষানবিশিটাই তো সবচেয়ে রোম্যান্টিক। আমি তো প্রথম প্রথম সারাদিন অপেক্ষা করে থাকতাম সেই পাঠশালার জন্য, কখন তোমার নতুনদাদা এসে আমাকে 'মেঘদূত' পড়াবেন, কখন গান শেখাবেন পিয়ানো বাজিয়ে!

বহুদিন আগে হঠাৎ দেখে ফেলা জ্যোতিদাদা ও নতুনবউঠানের একটি ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের স্মৃতি মনে পড়ে রবির বুকে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। আকুল হয়ে কাদম্বরীর দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, তখন আমাকে তোমরা কোনও গুরুত্ব দিতে না, আমার খুব ঈর্ষা হত জানো! আমার বউ এলে তুমি দূরে চলে যাবে না তো, নতুনবউঠান?

হাঁটতে হাঁটতে ওঁরা অনেক দূর চলে এসেছেন, যেখানে গিরিবঙ্কুর উপকূলরেখার মধ্য দিয়ে সমুদ্রের সঙ্গে এসে মিশেছে শীর্ণতোয়া কালানদী। একটু পেছনেই শোনা যাচ্ছে বিবি ও প্রতিভার সোনাঝরা গলার গান, স্বর্ণ-সৌদামিনী-জ্ঞানদার কলকাকলি। তীরে বসে পড়ে বালি নিয়ে খেলতে থাকেন কাদম্বরী। রবিও বসে পড়েন পাশে, বালুচরে আঁকিবুকি করতে করতে কী যেন লিখছেন। কাদম্বরী মুখ বাড়িয়ে দেখেন বালির অক্ষরে লেখা, 'হেকেটি ঠাকরুন'।

বিষণ্ণ মুখ তুলে তিনি বলেন, এবার তুমি হেকেটিকে ভুলে যাবে রবি, এখন যে অন্য কোনও ঠাকরুন আসছেন!

কী বলছ বউঠান, রবি আঁতকে ওঠেন, তোমার জন্য আমি বিলেত যাওয়া বাতিল করেছি, তোমার জন্য মেজোবউঠানের শত ডাকাডাকিতেও তাঁর বাড়ি থাকতে যাই না, তোমার দু'নয়নে উৎসর্গ করেছি আমার রাশি রাশি কবিতা। কাদম্বরীর হাতদুটি বালি থেকে তুলে নিয়ে নিজের হাতে চেপে ধরেন রবি।

হইচই করে ছুটে এসে ওঁদের জড়িয়ে ধরে বিবি ও প্রতিভা। পেছনের বড়দের দলটিও পৌঁছে যায়। বালির ওপর গোল হয়ে বসে শুরু হয় অন্য এক আড্ডা।

কাদম্বরীর দিকে রবির বাড়তি মনোযোগ জ্ঞানদা লক্ষ করেন। কী এত কথা ওদের? কাদম্বরী যেন দিনদিন গ্রাস করে ফেলছে রবিকে। কাঁচা মাথা চিবিয়ে

খাচ্ছেন হেকেটি ঠাকরুন। বলেই ফেলেন তিনি, তোমরা অমন আলাদা হয়ে যাও কেন রবি? আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বুঝি একেবারেই ভাল লাগে না?

অমন অন্যায় অভিযোগ কেন মেজোবউঠান, রবি বলেন, আমার আর নতুন বউঠানের হাঁটার জোর একটু বেশি, তাই বুঝি রাগ করেছ?

শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা কোরো না রবি, জ্ঞানদা ছাড়বার পাত্রী নন, আসলে কাদম্বরী আমার সঙ্গে মিশতে দিতে চায় না, ওর কান্নাকাটির ভয়েই আমার বাড়িতে তুমি থাকতে পার না। ব্রাইটনে থাকতে তুমি আমাদের সঙ্গে কত গল্প করতে!

সৌদামিনী সকলের দিদি, তিনিই এখন জোড়াসাঁকো বাড়ির গৃহকর্ত্রী, সবাইকে নিয়ে চলতে চান। জ্ঞানদাকে থামিয়ে আস্তে করে বললেন, আঃ মেজোবউ।

কাদম্বরী কিন্তু চুপ করে থাকতে পারলেন না, দেখছ তো বড়ঠাকুরঝি, মেজদি কেমন করে বলছেন! এজন্যেই তো আলাদা আলাদা হাঁটছিলাম। আমার ঘরে শান্তি নেই, সমুদ্রের ধারে এসেও কি দু'দণ্ড শান্তি পাব না?

স্বর্ণকুমারী সকলের মধ্যে থেকেও উদাসিনী। সমুদ্রের দিক থেকে মুখ না ফিরিয়েই তিনি বলেন, এত উদার, বিশাল জলরাশির সামনে দাঁড়িয়েও তোমরা এমন তুচ্ছ বিষয়ে কথা বলছ কেন!

কোনও কিছু ভাল লাগে না কাদম্বরীর। পেছন ফিরে সমুদ্রের ধার দিয়ে জোরে হাঁটতে থাকেন। বিবি প্রতিভারা লঘু পায়ে তাঁর পেছনে দৌড়য়। বাধা হয়েই রবি জ্ঞানদা সৌদামিনী স্বর্ণকুমারীরাও তাঁর পিছু পিছু বাংলোর দিকে ফিরতে শুরু করেন। সারাটা রাস্তায় সমুদ্র গর্জন করে এই অশান্তির প্রতিবাদ জানায়।

জজসাহেব সত্যেনের এই বাংলোটি খাঁটি বার্মাটিকে তৈরি বিশাল প্রাসাদের মতো। সমুদ্র প্রতি মুহূর্তে পায়ের কাছে ছলাৎ ছলাৎ সেলাম জানিয়ে যায়। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় শুধু জলধ্বনির মাঝে নিঝুম বসে থাকেন জ্যোতিরিন্দ্র। মায়াবী সমুদ্রের ধরা না দেওয়া ভঙ্গি দেখে তাঁর তীব্রভাবে বিনোদিনীর মুখ মনে পড়ছে। মুখ, চোখ, স্তন, কোমর সব স্মৃতিপটে ভেসে উঠে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তার সেই অনিন্দ্যসুন্দর অঙ্গে শয়তান গুরমুখের থাবা পড়েছে। তার মনেও কি সে জায়গা পেয়েছিল? এই অপরূপ সমুদ্রতীর, এই

তারাখচিত রাত্রি কিছুই যেন মনে ছাপ ফেলে না জ্যোতির, তাঁর এখুনি ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে বিনোদিনীর কাছে। মাইল মাইল দূরত্ব পেরিয়ে, সমুদ্রের নোনা বাতাস ভেদ করে বিনোদের শরীরের ঘ্রাণ নাকে এসে পাগল করে তোলে জ্যোতিকে।

জ্ঞানদারা ফিরে এসেও দেখলেন জ্যোতি মুখ নিচু করে নিঝুম বসে আছেন। রবি ও জ্ঞানদা তাঁর দু'পাশে এসে বসেন।

ঈষৎ উদ্‌বিগ্ন জ্ঞানদা জ্যোতিকে আদর করে কাঁধে হাত রেখে জানতে চান, কী হয়েছে নতুনঠাকুরপো, মন খারাপ? আমাদের সঙ্গে এলে না কেন?

জ্যোতি চুপচাপ মেজোবউঠানের কাঁধের ওপর মাথা রাখেন। সমুদ্রের ঢেউ যেরকম বাংলোর সিঁড়িতে এসে টোকা মারে, জ্যোতির কপালের ওপর সেরকম মায়াবী টোকায় শুশ্রূষা করতে চায় জ্ঞানদার আঙুলগুলি।

নীরবতা ভেঙে রবি হঠাৎ মেজোবউঠানের দিকে আঙুল তুলে গেয়ে ওঠেন, 'হেদে গো নন্দরানী/আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও'—

রবি দু'-তিনবার গাওয়ার পরেই গান-পাগল ভাইঝিরা তাঁর সঙ্গে গলা মেলাতে শুরু করে। নতুন গান তুলে নেওয়ার আশ্চর্য গুণ আছে ওদের। রবির কিন্নরকণ্ঠের সঙ্গে বিবি আর প্রতিভার রিনরিনে সুরেলা গলা মিশে উদ্বেগভরা সন্ধেটা আবার মনোরম হয়ে ওঠে।

কিছুদিনের মধ্যেই জোড়াসাঁকো থেকে খবর এল রবির বিয়ের সব ব্যবস্থা পাকা। কার্তিক মাসের শেষের দিকে কারোয়ার থেকেই জাহাজে বোম্বাই এসে রেলপথে কলকাতায় ফিরে এলেন রবি, জ্যোতি ও কাদম্বরী। কী এক বিচিত্র কারণে জ্ঞানদা রবির বিয়েতে যেতে চাইলেন না। সৌদামিনীও কারোয়ারে থেকে গেলেন।

বিয়ে করতেই হবে অথচ বিয়ে নিয়ে রবির দুশ্চিন্তা কমে না। তার মধ্যেই বন্ধু প্রিয়নাথ সেন ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে নিজের বিয়ের নেমন্তন্নের চিঠি পাঠিয়ে জানালেন, 'আগামী রবিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে শুভলগ্নে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ হইবেক। আপনি তদুপলক্ষে বৈকালে উক্ত দিবসে ৬নং যোড়াসাঁকোস্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি সন্দর্শন করিয়া আমাকে এবং আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন। ইতি। অনুগত। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

রবির গায়েহলুদ হয়ে গেল সাদামাটাভাবে। তারপরেই ও-বাড়িতে আইবুড়োভাত খেতে যেতে হল মেজোকাকিমার কাছে। মেজোকাকিমা যোগমায়া নিজেও যশোরের মেয়ে, তার ওপর ভবতারিণী তাঁর দূর সম্পর্কের বোন। তিনি তাই এই সম্বন্ধে খুব খুশি।

পাঁচ নম্বর বাড়ির তিন ভাইপো অবন গগন সমরেরাও রবিকা আসছেন বলে উত্তেজিত হয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। সবুজরঙের নকশা করা জমকালো দৌড়দার শাল গায়ে দিয়ে রবি যখন খেতে এলেন, ভাইপো অবনের মনে হল যেন দিল্লির বাদশা এসেছেন। ঘরে থরে থরে অন্নব্যঞ্জন সাজানো, সুচিত্রিত পিঁড়ি পেতে রবিকে বসানো হল। তাঁকে ঘিরে যত দিদি, বউঠান, কাকিমার দল প্রশ্নের বাণ ছোটাচ্ছেন, কী রে বউ পছন্দ হল?

কী রে রবি, বউ কেমন হবে?

রবি লজ্জায় মাথা নিচু করে খেয়ে যাচ্ছেন, উত্তর দিচ্ছেন না। মনে মনে তিনিও ভাবছেন, সত্যি তো, বউ কেমন হবে?

রবির বিয়ে হল খুব সাধারণভাবে। রবি এ ঘর থেকে একটু হেঁটে ও ঘরে গেলেন বিয়ে করতে, নিজেরই বাড়ির পশ্চিমের বারান্দা ঘুরে অন্দরে এলেন। ঠাকুরবাড়ির নিয়মমতো কনেপক্ষকে কলকাতায় এসে বিয়ে দিতে হল, বিয়ে হল জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই।

কোনও ধুমধাম নেই। শুধু দু'-একজন বন্ধুবান্ধব। বাড়ির লোকেরা আর শ্বশুরবাড়ির কয়েকজন। রবির বিয়ের সাজ বলতে পারিবারিক একটি বেনারসি শাল, যার যখন বিয়ে হয় তিনি গায়ে দেন বরসজ্জার উপকরণ হিসেবে। রবি এসে দাঁড়ালেন পিঁড়ির ওপরে, কালোডুরে বেনারসি পরা এক আত্মীয়া বরণ করে নিলেন তাঁকে।

কনেকে অন্দরে এনে সাতপাক ঘোরানো হলে বরকনে চললেন বাইরের দালানের সম্প্রদানস্থলে। সম্প্রদানে বাড়ির মেয়ে-বউরা যায় না, শুধু ছোটরাই সাক্ষী রইল।

বাসরে বসেই রবি নিজের স্নায়বিক উত্তেজনা ঢাকার জন্য ঠাট্টাতামাশা শুরু করলেন। মেয়েরা অনেক যত্ন করে ভাঁড়কুলো খেলার আয়োজন করেছে, বরকনেকে ঘিরে খেলতে বসেছে আর খেলার শুরুতেই রবি সব ভাঁড় উপুড় করে খেলা পণ্ড করে দিলেন। কিছুতেই যেন তাঁর মন বসছে না।

মেয়েবউরা সব হইচই করে ওঠেন। ছোটকাকিমা ত্রিপুরাসুন্দরী বলে

উঠলেন, ও কী করিস রবি? এই বুঝি তোর ভাঁড়খেলা? ভাঁড়গুলো সব উলটেপালটে দিচ্ছিস কেন?

রবি চারদিকে তাকিয়ে নতুনবউঠানকে কোথাও দেখতে পান না। ছটফট করে বলে ওঠেন, কী করব ছোটকাকিমা, দেখছ না, সব যে উলটো পালটা হয়ে যাচ্ছে! আমি তাই নিজেই ভাঁড়গুলো উলটে দিচ্ছি।

কোথায় গেলেন নতুনবউঠান? রবির বিয়ে আর তিনিই নেই? বিয়ের পিঁড়ি ছেড়ে তাঁকে খুঁজে আনতে চান রবি, কিন্তু পরক্ষণেই বালিকাবধূর ঘোমটা-ঢাকা মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবেন এর তো কোনও দোষ নেই! মেয়েরা সবাই তাঁকে গান গাইতে সাধাসাধি করছে। ছোটকাকিমাও। হঠাৎই রবি নববধূর দিকে তাকিয়ে যেন দুষ্টুমি করে ন'দিদির লেখা একটি গান গেয়ে ওঠেন,—

'আ মরি লাবণ্যময়ী/ কে ও স্থির সৌদামিনী/
পূর্ণিমা-জোছনা দিয়ে/ মার্জিত বদনখানি!
নেহারিয়া রূপ হায়,/ আঁখি না ফিরিতে চায়,/
অপ্সরা কি বিদ্যেধরী/ কে রূপসী নাহি জানি।'

বেচারি রোগা শ্যামলা গাঁয়ের বধূটি লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে আরও বড় করে ঘোমটা টানেন। কার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল, কোথায় এসে পড়লেন, কিছুই তিনি জানেন না। রবি আরও দু'-একটি গান গাইলেন, কিন্তু আসর যেন কিছুতেই জমল না। কোথায় গেলেন জ্যোতিদাদা, কোথায় নতুনবউঠান? মেজদাদা মেজোবউঠানই বা কেন এলেন না, রবি বুঝতে পারেন না। যে বাড়ির খিলানে খিলানে সৃষ্টির উল্লাস ভেসে বেড়ায়, রবির বিয়ের দিনে কেন যেন সেই সুর বাজল না।

বরং একটি দুঃসংবাদ এসে বাড়ির পরিবেশ আরও ম্রিয়মাণ করে তুলল। শিলাইদহে জমিদারির কাজ দেখতে গিয়েছিলেন বড় জামাই সারদাপ্রসাদ, হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সৌদামিনী তখন কারোয়ারে, জ্যোতি তার পাঠালেন গুরুতর অসুস্থতার খবর দিয়ে। দু'দিন পরেই তড়িঘড়ি সৌদামিনীকে নিয়ে শোকস্তব্ধ জোড়াসাঁকোয় পৌঁছলেন সত্যেন ও জ্ঞানদা।

শোকের মধ্য দিয়ে অচেনা শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে বালিকাবধূর পরিচয় ঘটল। রবির নামের সঙ্গে মিলিয়ে এ-বাড়িতে তাঁর নতুন নাম রাখা হল মৃণালিনী।

১৮

তারকার আত্মহত্যা

রবির বিয়ের পরপরই ঠাকুরবাড়িতে অনেক ওলটপালট ঘটে গেল।

স্বামীর মৃত্যুতে সৌদামিনী সংসারে উদাসীন হয়ে পড়লেন। সেই সংবাদ পেয়ে মহর্ষি কিছুদিনের জন্য পাহাড় থেকে নেমে এলেন জোড়াসাঁকোয়।

নবদম্পতিকে চারটি মোহর দিয়ে আশীর্বাদ করলেন তিনি আর জমিদারি দেখার ভার দিলেন রবিকে। প্রতি সপ্তাহে অবশ্য রবিকে রিপোর্ট পাঠাতে হবে বাবামশায়ের কাছে। দিনকয়েক ইতস্তত গঙ্গায় নৌকোভ্রমণ করে দেবেন ঠাকুর শেষে চুঁচুড়ার একটি বাগান-বাড়িতে আশ্রয় নিলেন।

মহর্ষি রবিকে চিঠি লিখে নির্দেশ দিয়েছেন, 'ইংরাজি শিক্ষার জন্য ছোটবৌকে লারেটো হৌসে পাঠাইয়া দিবে। ক্লাসে অন্যান্য ছাত্রীদের সহিত একত্র না পড়িয়া তাহার স্বতন্ত্র শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত উত্তম হইয়াছে। তাহার স্কুলে যাইবার কাপড় ও স্কুলের মাসিক বেতন ১৫ টাকা সরকারী হইতে খরচ পড়িবে।'

ইতিমধ্যেই অবশ্য মৃণালিনীকে জোড়াসাঁকো থেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে তার পড়াশোনার ব্যবস্থা চালু করে ফেলেছেন জ্ঞানদা। লরেটো হাউসে মৃণালিনীকে আলাদা করে ক্লাস করানোর জন্য বেতন লাগছে সাত টাকা। রবির উপযুক্ত করে তোলার তাগিদে তাঁকে গান শেখানোর ক্লাসেও ভরতি করা হল।

তবে রবি এ-সবে একটু উদাসীন। নিজস্ব জীবনছন্দের মধ্যে হঠাৎ এসে পড়া এই বালিকাবধূকে নিয়ে কী করবেন তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না। এতদিন কখনও সদর স্ট্রিটে নতুনবউঠানের কাছে আবার কখনও মেজোবউঠানের কাছে বির্জিতলাওয়ে যে উদ্দীপক জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন, তার বদলে জোড়াসাঁকোর নিস্তরঙ্গ দিনগুলো যেন কাটতে চায় না।

এখন জোড়াসাঁকোয় না আছে জ্যোতিদাদার প্রাণের আগুন, না আছে মেজোবউঠানের সুমার্জিত শিল্পসাহিত্যচর্চা, না নতুনবউঠানের মায়াবী উদ্ভাস। তেতলাঘরের নির্জনতায় তাঁর প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে। মৃণালিনী কখনও এখানে থাকেন কখনও বা মেজোবউঠানের কাছে।

তার ওপর বন্ধুরাও যেন বর্জন করেছেন হানিমুনে ব্যাঘাত ঘটাবার ভয়ে। রবি বাধ্য হয়ে প্রিয়নাথকে চিঠিতে লিখলেন,— 'Honeymoon কি কোনোকালে একেবারে শেষ হবার কোনো সম্ভাবনা আছে— তবে কি না, Moon-এর হ্রাসবৃদ্ধি পূর্ণিমা অমাবস্যা আছে বটে। অতএব আপনি Honeymoon-এর কোনো খাতির না রেখে হঠাৎ এসে উপস্থিত হবেন।'

বউকে ছেড়ে সদর স্ট্রিট বা বির্জিতলাওয়ে আগের মতো পাড়ি জমাতেও পারছিলেন না রবি, এখন মেজোবউঠান মৃণালিনীকে নিয়ে গিয়ে যেন রবিকেও বাঁচিয়ে দিয়েছেন। রবি প্রায় সন্ধেবেলায় বির্জিতলাওর আসরে যোগ দিতে পারছেন। থেকেও যাচ্ছেন মাঝে মাঝেই। জ্ঞানদা মৃণালিনীর শিক্ষার জন্য এ-সব করছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর হৃদয়ের গোপন একটি ইচ্ছেও এতে চরিতার্থ হচ্ছে, রবিকে কাদম্বরীর রাহুগ্রাস থেকে সরিয়ে আনতে পেরেছেন তিনি।

মৃণালিনীর পিঠছাপানো চুলে পরিপাটি করে খোঁপা বেঁধে দিতে দিতে জ্ঞানদা নিজের ফেলে আসা নববধূ-জীবনের গল্প বলেন, 'একবার আমাদের গুরুঠাকুর এসেছিলেন। তাঁকে বাবামশায় জিজ্ঞেস করেছিলেন— কিরকম কন্যাদানে বেশি পুণ্য হয়। তিনি বললেন— সাতবছর বয়সে বিয়ে দিলে, অর্থাৎ গৌরীদানে। ঠিক সেই বয়সেই আমার বিয়ে হয়। কলকাতার ঠাকুরবাড়ি থেকে তখন যশোরে মেয়ে খুঁজতে পাঠাত, কারণ যশোরের মেয়েরা নাকি সুন্দরী হত। যেসব দাসীরা মনিবের পছন্দ ঠিক বুঝতে পারে, তাদের খেলনা দিয়ে তাঁরা মেয়ে দেখতে পাঠাতেন। আমাদের ওখানেও এইরকম দাসী গিয়েছিল।' দাসী পছন্দ করে গেলে যখন আমার বিয়ের দিন সব ঠিক হয়ে গেল, তখন বাবামশাই আমাকে আনার জন্য সরকার, দাসী, চাকর পালকি সব পাঠালেন।

বালিকা আস্তে করে বলে, আমাকেও তোমাদের বাড়ি থেইক্যা অনেক সুন্দর সুন্দর খেলনা আর শাড়ি গয়না পাঠিয়েছিল। গাঁয়ের লোকেরা কোনওদিন অমন দেখে নাই।

অ্যাই মেয়ে, এখানে ওরকম যশুরে বুলি বলবি না। শোন, আমার বিয়ে তো তোদের মতো জোড়াসাঁকোর দালানে হয়নি, তখন শাশুড়ি বেঁচে ছিলেন। জ্ঞানদা স্মৃতিচারণ করতে থাকেন, 'বিয়ের পর বাসীবিয়েতে আমাকে মেয়েপুরুষ মিলে ঘেরাটোপ দেওয়া পালকিতে নিতে এসেছিল। শ্বশুরবাড়ির অন্দরমহলে যখন পালকি নামাল তখন বোধহয় আমার শাশুড়ী আমাকে কোলে করে' তুলে নিয়ে গেলেন। তাঁর ভারী মোটা শরীর ছিল, কিন্তু আমি খুব রোগা ও ছোট ছিলুম বলে' কোলে করতে পেরেছিলেন। আমাকে নিয়ে পুতুলের মতো এক কোণে বসিয়ে রাখলেন। মাথায় এক গলা ঘোমটা, আর পায়ে গুজরী-পঞ্চম ইত্যাদি কত কি গয়না বিঁধছে। আমার পাশে একজন গুরুসম্পর্কীয়া বসে যৌতুকের টাকা কুড়োতে লাগলেন। আমি তো সমস্তক্ষণ কাঁদছিলুম।'

জ্ঞানদা বলতে বলতে যেন অতীতে ডুবে গেছেন, 'আমার শ্বশুর যখন যৌতুক করতে এলেন তখন একটু জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলুম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন— কেন কাঁদছে? লোকে বললে— বাপের বাড়ি যাবার জন্যে। তাতে তিনি বললেন— বল পাঠিয়ে দেব। সকলে বলতে লাগলেন— দেখেছ কী সেয়ানা বউ! ঠিক তাকমাফিক চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছে, যখন শ্বশুর যৌতুক করতে এসেছে। কিছুদিন পর্যন্ত লোকে আমাকে রোজই দেখতে আসত ও নানারকম ফরমাশ করত— উপর বাগে চাও তো মা ইত্যাদি। মেয়েরা কাপড় পর্যন্ত খুলে দেখত। আমি খুব লাজুক ছিলাম।' ঠিক তোমার মতো। সমবয়সিদের সঙ্গেও ভালভাবে কথা বলতে পারতাম না।

কে বলবে এহন তোমাকে দেইখ্যা! মৃণালিনী সাহস করে বলে ফেলেন, তোমারে দেইখ্যা মনে হয় যেন সাক্ষাৎ দশভুজা জগদ্ধাত্রী।

ও বাবা, মেয়ের মুখে দেখি বোল ফুটেছে! জ্ঞানদা আনন্দে হেসে ওঠেন। কিন্তু ওই যশুরে বুলি ছাড়তে হবে।

সন্ধেয় গানবাজনার আসর বসছে রোজই। জ্যোতির সঙ্গে অক্ষয় এসে হাজির হন প্রায়ই। পিয়ানোর রিডে দিশি-বিদেশি সুরের ওঠানামায় উত্তাল হয়ে ওঠে বির্জিতলাওর বাড়ি।

সে-সব উত্তেজনার অবসানের পর রাত হলে বালিকাবধূর পাশে শুয়ে রবির মনে পড়ে একাকিনী নতুনবউঠানের মুখ। কী করছেন তিনি? জ্যোতিদাদা কি বাড়ি ফিরেছেন? না ফেরার সম্ভাবনা খুব বেশি, তিনি এখন

আবার বিনোদিনীর কাছে যাতায়াত করছেন। তা হলে একা সেই বিরহিণী কীভাবে রাত কাটাচ্ছেন। রবি উদ্বেগে বিছানা ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করেন। বালিকা মৃণালিনী জানতে চায়, আপনার কী হয়েছে? ঘুম আসছে না? মাথা টিপে দেব?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে রবির বড় মায়া হয়। বারো বছরের সরল বালিকা বোঝে না, তার পক্ষে চব্বিশ বছরের রবির জটিল মনোজগতে ঢোকা কত কঠিন।!

কাদম্বরী সত্যিই একা হয়ে পড়েছেন। রবি আসার সময় পায় না। জ্যোতি প্রায় রাতেই বাড়ি ফেরেন না। কোথায় থাকেন জানতে চাইলে বড় অশান্তি করেন, মনে মনে কাদম্বরীর গভীর সন্দেহ জ্যোতি নিশ্চয় বিনোদিনীর কাছে রাত কাটাচ্ছেন।

শুয়ে বসে তাঁর দিন কাটে না, রাত কাটে না। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে রাস্তা দেখেন। রাস্তার ফিরিওলা, ঠেলাওলা দেখেন। সেলাই নিয়ে বসলেও মন লাগে না, মনের রং হারিয়ে গেছে যে! রূপাকে আনিয়ে নিয়েছেন সদর স্ট্রিটে, তার সঙ্গে বসে কখনও তাস খেলেন, কখনও চলে কাব্যপাঠ। আর প্রতিটি ছোটখাটো শব্দে চমকে উঠে দরজার দিকে তাকান, যেন মনে মনে কারও আগমনের প্রতীক্ষায় আছেন।

ওদিকে অলস দুপুরে বিনোদিনীর কোলে মাথা রেখে জ্যোতি গল্প করেন। জানো বিনোদ, নিলাম থেকে সস্তায় একটা জাহাজের খোল পেয়ে কিনে ফেলেছি। এবার জাহাজ সাজিয়ে গুজিয়ে তোমাকে নিয়ে অনেক দূরে পাড়ি দেব একদিন।

ওমা, বিনোদিনী জ্যোতির চুলে বিল্লি কেটে দিতে দিতে থেমে যান অবাক হয়ে, বলেন, জাহাজের খোল আবার কেনা যায় নাকি, ও দিয়ে তোমার কী হবে?

আরে বুঝতে পারছ না, জ্যোতি উৎসাহে উঠে বসেন, আস্ত জাহাজ কেনার চেয়ে খোল কিনে তাতে ইঞ্জিন জুড়ে কামরা লাগিয়ে নিলে কম খরচে চমৎকার জাহাজ হয়ে যাবে। আমি এবার জাহাজের ব্যাবসা করব, ইংরেজদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। দেখো বিনোদ, আমার স্বদেশি জাহাজ লোকের নিশ্চয় পছন্দ হবে।

তুমি অতবড় জমিদারবাড়ির ছেলে, তুমি এ-সব জাহাজের ব্যাবসা ট্যাবসা করবে কেন? বিনোদিনীর বিস্ময় কাটে না।

জ্যোতি কিন্তু উৎসাহে টগবগ করছেন, জমিদার তো কী হয়েছে? আমার ঠাকুরদা দ্বারকানাথ তো 'টেগোর কোম্পানি' খুলে 'ইন্ডিয়া' জাহাজের মালিক হয়ে একসময় বিরাট ব্যাবসা করেছেন, তিনি ছিলেন প্রথম বাঙালি উদ্যোগপতি। বাঙালিরা কলম চালায় কিন্তু জাহাজ চালাতে পারবে না কেন? দেখে নিয়ো বিনোদ, আমার জাহাজ কোম্পানি অনেক বড় হবে, অনেক টাকা আসবে। আর সেই টাকা আমি থিয়েটারের জন্য খরচ করব।

বিনোদিনীকে গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করে তিনি বললেন, আমি তোমার নামে থিয়েটার করে দেব বিনোদিনী সরোজিনী! তোমার কোনও সাধ অপূর্ণ রাখব না।

বিনোদিনীর ক্ষতে যেন প্রলেপ পড়ে, মনে খুব আনন্দ হয়। কৃতজ্ঞতায় ভালবাসায় জ্যোতির ইন্দ্রনিন্দিত শরীরে নিজেকে মিশিয়ে দেন বিনোদিনী। তৃষ্ণার্ত জ্যোতির দেহের প্রতিটি অঙ্গে বৃষ্টিফোঁটা হয়ে ঝরে পড়তে থাকেন। পরমসুখের সেই মুহূর্তে বিনোদিনীর স্বর্গীয় বিল্বফলের মতো নিটোল স্তনে মুখ গুঁজে দেন জ্যোতি।

কিছুক্ষণ পরে স্তন থেকে নিজের অনিচ্ছুক মুখটিকে অল্প টেনে তুলে জ্যোতি বললেন, তুমি নিষিদ্ধ ফলের মতোই উত্তেজক।

কেন, তোমার ঘরে যে অনিন্দ্যসুন্দরী স্ত্রী আছেন শুনতে পাই ঠাকুর? তির্যক স্বরে বিনোদিনী জানতে চান, তার কাছে দেহসুখ পাওনি?

জ্যোতির মুখে ছায়া পড়ে। কাদম্বরীর কাছে তিনি অপরাধী। বিনোদিনীর তীব্র আকর্ষণে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, তাঁকে ঠকিয়ে চলেছেন। বিনোদিনী সেই নরম জায়গাটাতেই ঘা দিয়েছে।

কী গো সুপুরুষ, উত্তর দিলে না, বিনোদিনী নিজের বহুনন্দিত রতিক্ষমতার স্তুতি শোনার লোভে গলা জড়িয়ে ধরে আবার খোঁচান জ্যোতিকে।

জ্যোতি ধীরে ধীরে বিষাদমাখা গলায় বললেন, তিনি গৃহলক্ষ্মী। তার সঙ্গে রতিখেলায় তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালানোর আনন্দ, কিন্তু তুমি আমার উত্তেজক মদিরা। আমার সৃষ্টির উন্মাদনা। এই দুইয়ে তুলনা চলে না।

তার মানে? বিনোদিনী ছদ্ম রোষে বলেন, বলতে চাও, তিনি পবিত্র আর আমি সাতঘাটে ঘোরা অপবিত্র? তা হলে আর আমার কাছে আসা কেন?

বিনোদিনী ছিটকে সরে বসেন। জ্যোতি তাঁর কাছে গিয়ে দু'হাতের ঘেরে বেঁধে বলেন, অয়ি মানিনী, মানময়ী, তুমি সরে গেলে আমার লেখা বন্ধ হয়ে যাবে, গান থেমে যাবে। তুমি কি তাই চাও?

পৃথিবীর আদিম মানব মানবীর মতো উদ্দাম রতিখেলায় ডুবে গেলেন নাট্যকার ও মঞ্চসম্রাজ্ঞী।

কাদম্বরী তখন এ ঘর-ও ঘর ছটফট করছেন নিঃসঙ্গ যৌবনের ভারে। তাঁর এই অতুল রূপরাশি আর কোনও পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টির প্রশংসা কুড়োয় না। পোষা হরিণশিশুর মতো পায়ে পায়ে ঘোরে না কোনও রবি, কাব্যপাঠ করতে করতে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকেন না কোনও বিহারীলাল, কোনও অক্ষয় চৌধুরী তাঁর চোখে চোখ রেখে গান গেয়ে ওঠেন না, তাঁর আসঙ্গকামনায় থরথর করে ওঠেন না কোনও প্রেমাতুর স্বামী। কোনও শিশু তাঁর স্তন্যসুধার জন্য মুখ বাড়ায় না। কী করবেন তিনি এই ভরাযৌবন নিয়ে?

দেউড়িতে ঢং ঢং করে বেলা তিনটের ঘণ্টা পড়ে। এই ঘণ্টা বাজানোর প্রথাটিও ঠাকুরবাড়ির। এখন জোড়াসাঁকোয় লম্বা বারান্দা জুড়ে মেয়ে-বউরা বসবেন দাসীদের কাছে খোঁপা বাঁধতে। কাদম্বরীর খোঁপাদাসী সদর স্ট্রিটে এসেই তাঁর খোঁপা বেঁধে দেয় যত্ন করে। কোনওদিন মোচা খোঁপা তো কোনওদিন পৈঁচে ফাঁস। হাতির দাঁতের বেলকুঁড়ি বসিয়ে কাদম্বরীর কবরী বেঁধেছে সে।

সাজগোজ হলে কাদম্বরী রূপাকে বলেন, চল বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই। কত কী দেখার আছে পৃথিবীতে!

রূপা তো একপায়ে খাড়া, বলে চলো যাই। কিন্তু কোথায় যাবে? আমরা তো রাস্তাঘাট কিছুই চিনি না।

আচ্ছা, আমরা যদি মালিনীর সঙ্গে বইয়ের ঝোলা নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরি? কাদম্বরী বলেন, বেশ মজা হবে না?

তোমাকে দেখে কেউ বইওলি বলবে না, না হয় আটপৌরে শাড়ি পরলে, কিন্তু তোমার রূপ আর বনেদিয়ানা লুকোবে কী করে?

তা হলে চল গিরিশ ঘোষমশাইয়ের কাছে যাই, কাদম্বরী আর-একটি ভাবনায় উদ্দীপিত, বলব, আমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে বিনোদিনীর চেয়ে ভাল অভিনেত্রী গড়ে নিন। আমি সেই মালিনীর গল্পের নায়িকার মতো মঞ্চে উঠে

সবাইকে চমকে দেব।

আর নতুনদাদা প্রচণ্ড রেগে মঞ্চে উঠে তোমাকে মারতে যাবেন! রূপা হেসে কুটোপাটি হয়।

আর পুলিশ এসে ওঁকে বের করে দেবে— কাদম্বরীও হেসে গড়িয়ে যান। পরক্ষণেই সচকিত হয়ে বলেন, কিন্তু তারপর তিনি কোথায় যাবেন, সেই তো বিনোদিনী হতচ্ছাড়ির বুকে মুখ লুকোবেন! তা হলে এ প্ল্যান চলবে না। অন্য কিছু ভাবতে হবে, দাঁড়া।

রূপা উত্তেজিত হয়ে বলে, স্বদেশি দলে যোগ দেবে? যশোরের স্বদেশিদের কাছে চলে যাই চলো, দেশের কাজও হবে আর—

আর হ্যারিসাহেবের সঙ্গে দেখাও হবে, কাদম্বরী ছদ্মরাগে রূপার চুলের ঝুঁটি নেড়ে দিয়ে বলেন, কী তাই তো? তোর যদি স্বদেশির নাম করে অভিসারে যাওয়ার এত শখ তো আমাকে টানছিস কেন?

আমি ওকে ছাড়া বাঁচব না নতুনবউঠান, রূপা চোখ ছলছল করে বলে ওঠে হঠাৎ। কিন্তু বাড়ির কেউ কি মেনে নেবে এই সম্পর্ক? তুমি আমাকে বাঁচাও।

কাদম্বরী সচকিত হন, রূপা, সেই তুই একটা গন্ডগোল বাঁধালি! আমি কাকে কী বলব, সে একটা চাল নেই চুলো নেই বাউন্ডুলে সাহেব, তার ওপর এখন আবার স্বদেশি করছে, পুলিশের খাতায় নাম উঠে গেছে হয়তো! তাকে বিয়ে করতে হলে তোকে বাড়ি থেকে পালাতেই হবে, কিন্তু খাবি কী, থাকবি কোথায়?

রূপা খিলখিল করে হেসে বলে, সেই যে কথায় আছে না,— 'ভোজনং যত্রযত্র শয়নং হট্টমন্দিরে'।

সে যে কী অপরূপ দৃশ্য হবে রূপা, কাদম্বরীও হেসে লুটিয়ে পড়েন, তুই আর তোর হ্যারিসাহেব হট্টমন্দিরে শুয়ে আছিস আর চারদিকে ভিড় করে লোকে এনকোর এনকোর বলে চিৎকার করছে, আহা!

যাঃ তুমি যে কী কথা বলছ নতুনবউঠান, রূপা লজ্জা পেয়ে ছুটে পালায়।

দরজার কাছে কারও পায়ের শব্দে চমকে উঠে কাদম্বরী দেখলেন রবি এসেছে। তাঁর চোখ অভিমানে ছলছল করে ওঠে। চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কাদম্বরী বললেন, বেঁচে আছি কিনা দেখতে এসেছ রবি?

রবি কাছে এসে নতুনবউঠানের থুতনি ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নেন, কাজলনয়ন থেকে গড়িয়ে পড়া অশ্রুটুকু পরমযত্নে মুছে দেন আঙুল দিয়ে। তারপর বলেন, রাগ কোরো না, প্রতিদিন তোমার জন্য আমার দুশ্চিন্তা হয়, প্রতিরাত তোমার কথা ভেবে ভেবে আমার ঘুম আসে না। কিন্তু আসতে পারিনি কিছুতেই।

তা পারবে কী করে? রবির হাত ঠেলে দিয়ে সরে যান কাদম্বরী। এখন তোমার নতুন বউয়ের সঙ্গে পুতুলখেলার সময়, এখন কি আর বুড়িবউঠানের সঙ্গ ভাল লাগে!

রবির মনে তীব্র আবেগের ধাক্কা লাগে, প্রতি পল-অনুপল যাকে মনে পড়ে, যার ছায়া থেকে সরার জন্য নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় পল-অনুপল, সেই মন প্রতিমা এ-কথা বলছেন!

রবি আর্তনাদ করে ওঠেন, যদি বুক চিরে তোমাকে দেখাতে পারতাম, নতুনবউঠান আমার ক্ষতবিক্ষত মন।

মিথ্যে বোলো না রবি, কাদম্বরী তাও অভিমান করেন, তুমিও তোমার নতুনদাদার মতো আমাকে মিথ্যে স্তোক দিচ্ছ। আমাকে কেউ আর ভালবাসে না। তাঁর গায়ের কচি কলাপাতা রঙের জর্জেট শাড়িটি অবহেলায় মাটিতে লুটোয়।

বিদ্যুৎলতার ঈষৎ উন্মোচনে মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে রবির, রেশমি জ্যাকেটের উদ্ধত নির্লজ্জতায় চোখ পুড়ে যায়। তিনি কাদম্বরীর কোমর জড়িয়ে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ে বলেন, আমি ভালবাসি, আমি ভালবাসি! এরকম করে আর কাউকে কোনওদিন ভালবাসিনি নতুনবউঠান। যদি সাধ্য থাকত, তা হলে তোমার এই যন্ত্রণা দূর করতাম।

কাদম্বরীও শকুন্তলার মতো জড়িয়ে ধরেন প্রিয়তম হরিণশিশুটিকে, দু'জনে দু'জনকে তীব্র আবেগে জাপটে ধরে অনুচ্চারিত এক বেদনায় কাঁদতে থাকেন, কাঁদতেই থাকেন।

জ্যোতি বাড়িতে সময় দিতে পারছেন না। কাদম্বরীকে নিয়ে আবার জোড়াসাঁকোয় ফিরে গেলেন। সেখানে অন্তত কিছু লোকজন আছে, তাদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদে হাসি গল্পে দিন কেটে যাবে কাদম্বরীর, জ্যোতি কিছুটা নিশ্চিন্তমনে বিনোদিনীর কাছে কাটাতে পারবেন।

জাহাজ নিয়েও খুব ব্যস্ততা জ্যোতির। প্রচুর ঋণ নিয়ে জাহাজ সাজিয়েছেন। কামরা সৌন্দর্য্যায়নের ভার দিয়েছেন জ্ঞানদাকে। কাদম্বরীকেও এ-ভার দিতে পারতেন জ্যোতি কিন্তু আজকাল অপরাধবোধে তাঁর সামনে দাঁড়াতেই ভয় পান। তা ছাড়া কাদম্বরীর রুচি চমৎকার হলেও জাহাজের কামরা সম্বন্ধে তাঁর কোনও ধারণাই নেই। জ্ঞানদা ফরাসি ইংরেজ অনেক জাহাজে চড়েছেন, তাঁর অভিজ্ঞতার কারণেই জাহাজের সাজগোজ হয়েছে খুবই মনোহারী।

বিলিতি জাহাজ কোম্পানি ফ্লোটিলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খুলনা-বরিশাল জলপথে ফেরি চালাবেন তিনি। দিশি লোকেরা দিশি জাহাজে চড়তেই নিশ্চয় পছন্দ করবে, জ্যোতির জাহাজ উদ্‌বোধনের দিন ঠিক হয়েছে ১৯ এপ্রিল। ১৮৮৪ সালের এই দিনটি বাঙালির জাহাজ ব্যাবসার ইতিহাসে সোনার জলে লেখা থাকবে। জ্যোতি বুঝতে পারেননি, ওটাই হয়ে উঠবে তাঁর জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার দিন।

১৯ এপ্রিলের জন্য মহা তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে সেদিন উপস্থিত থাকার জন্য। হয়তো বড়লাট আসবেন, জ্যোতির বিশেষ ইংরেজ-প্রীতি না থাকলেও হোমরাচোমরা সাহেবরা না এলে জাহাজের তেমন প্রচার হবে না। বাঙালির জাহাজ ব্যাবসার টানে প্রেস আসবে, কিন্তু গোরাসাহেবদের রিঅ্যাকশন দেখতে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

উদ্‌বোধন উপলক্ষে জ্ঞানদা তাঁর নিজের ও বিবি-সুরেনের জন্য বিশেষ পোশাক তৈরি করতে দিয়েছেন। বাড়িতে দরজি বসেছে। কিন্তু জ্যোতির পোশাক নিয়েই তাঁর বেশি চিন্তাভাবনা। বিলিতি দোকানের স্যুট কিনবেন, না রাজকীয় চোগা-চাপকান-পাগড়িতে সাজাবেন তাঁকে। অবশ্য জ্যোতি যা পরেন তাঁকে চমৎকার মানায়। বড়বাজারের পাঞ্জাবি শালওয়ালা এসেছে নানারকম জরি-কিংখাবের ছিটকাপড় নিয়ে। তার থেকেই জ্যোতি আর রবির জন্য কাপড় বেছে চাপকান করতে দিলেন শেষে।

এ-সব হুলুস্থূল তোড়জোড় থেকে অনেক দূরে বর্ষার মেঘের মতো একঢাল খোলা চুল ছড়িয়ে একা একা বসে আছেন কাদম্বরী। জ্যোতির ওপর তাঁর তীব্র অভিমান, জাহাজের উদ্‌বোধনের কোনও কর্মকাণ্ডে স্বামী তাঁকে জড়াননি, সব ছেড়ে দিয়েছেন মেজোবউঠানের হাতে, যে মেজোবউ-এর কাদম্বরী চক্ষুশূল। বাড়ি আসেন না, কোথায় কোথায় রাত কাটান, সব

সহ্য করছি, ভালবাসা কি এতটাই ক্ষয়ে গেল যে কাজের সঙ্গিনী হওয়ার মর্যাদাটুকুও কেড়ে নিতে হবে!

জ্যোতি তাঁকে বলেছেন, একেবারে উদ্‌বোধনের দিন জাহাজে নিয়ে গিয়ে চমকে দেবেন। সে চমক কে চায়, তিনি তো চেয়েছিলেন সেই কাজে সহযোগী হতে। কেন, কেন এই অবহেলা? সেদিনের মধুরজনী কি আর ফিরে আসবে না?

তবু কাদম্বরী প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বিশু তাঁতিনিকে ডেকে নতুন একটি কমলারঙা স্বর্ণচরী শাড়ি বেছেছেন উদ্‌বোধনে পরার জন্য, গয়না বেছে বেছে আয়নার সামনে পরে দেখছেন। সেদিন শুধু জ্যোতিই তাঁকে চমক দেবেন তা হয় না, কাদম্বরীও চমকে দেবেন জ্যোতিকে।

জীবনের সেরা সাজ সাজবেন তিনি, জ্ঞানদাকে হারিয়ে দেবেন রূপের উজ্জ্বলতায়। যখন জাহাজের ডেকে গিয়ে দাঁড়াবেন, লোকের চোখ তাঁকেই ঘুরেফিরে দেখবে। জ্ঞানদা তাঁর চেয়ে অনেক সৌভাগ্যবতী হতে পারেন, কিন্তু রূপে ও সংবেদনায় তাঁর ধারেকাছে আসতে পারবেন না, জানেন কাদম্বরী। ঠাকুরবাড়ির অন্দরে সে-কথা চালু আছে। সেই রাগেই হয়তো মেজোবউ জ্যোতিকে তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

জ্যোতির খুব ইচ্ছে ছিল বিনোদিনীকে নিয়ে আসবেন অনুষ্ঠানে, কিন্তু বিনোদিনী রাজি না। বিনোদিনীর উপস্থিতি ছাড়া জ্যোতি তাঁর জাহাজের উদ্‌বোধন করতে চান না। কী উপায় করা যায় ভাবতে ভাবতেই তড়িঘড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন জ্যোতি।

কাদম্বরী ঘরে বসে ধোপানিকে কাপড় দিচ্ছিলেন। অভ্যেসমতো জ্যোতির জোব্বার পকেটে হাত দিয়ে কাগজপত্র বার করতে গিয়ে তাঁর হাতে উঠে এল সুগন্ধী একটি খাম, কোনায় মেয়েলি ছাঁদের অক্ষরে লেখা 'সরোজিনী' আর মাঝখানে অতি যত্নে জ্যোতির নাম। কাদম্বরীর বুক ধড়ফড় করে। ধোপানিকে বিদায় করে দিয়ে চিঠিটা খোলেন তিনি,—

প্রিয়তমেষু,

তোমার কাছ থেকে যে আনন্দ ও মর্য্যাদা পাইয়াছি, তাহা আমার বহুস্বপ্নের ফসল। কিন্তু যে কথা মুখে বলতে পারি নাই তাহা জানাইবার জন্যেই এই পত্র। দুপুরের দুষ্টামির পরে তুমি যখন আমার বালিশে মাথা

রাখিয়া পরম আরামে ঘুমাইতেছ, তখন তোমার পাশে বসিয়াই তোমাকে লিখিতেছি। গোপন কথাটি হইল, আমার শরীরের মধ্যে তোমার একটি ক্ষুদ্র বীজ বাড়িয়া উঠিতেছে, কয়েকদিন বমিবমি লাগিতেছিল, এমাসে ঋতুদর্শন হয় নাই। প্রথমবার পোয়াতি হইবার সময়ে যেমন হইত ঠিক সেইরকম। তুমি শুনিয়া খুশি হইবে কি না জানি না বলিয়াই মুখে বলিতে পারি নাই। সন্তানের পিতৃপরিচয় আমি কাহাকেও জানাইব না, শুধু আমি জানিলাম আর তুমি। সংসার জানিবে ও আমার সন্তান, আমার একার। কোনও মূল্যেই আমি তোমাকে হারাইতে চাহি না। আমার শতশত চুম্বন গ্রহণ করিয়ো।

ইতি

তোমার একান্ত সরোজিনী।

বজ্রাহতের মতো বসে পড়েন কাদম্বরী। শব্দগুলি তাঁর মাথায় বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে— 'দুপুরের দুষ্টামি', 'ক্ষুদ্র বীজ', 'সন্তানের পিতৃপরিচয়', চিঠি হাতে নিয়ে অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে যান তিনি। অনেক পরে রূপা এসে তাঁর জ্ঞান ফেরায়।

থমথমে প্রতিমার মতো চিঠি হাতে নিয়ে দু'দিন বসে রইলেন কাদম্বরী। জ্যোতি সত্যিই তাঁকে ঠকিয়ে বিনোদিনীর কাছে যান! জ্যোতির সন্তান এসেছে বিনোদিনীর গর্ভে, তার মানে তাঁর পৌরুষ নিষ্ফলা নয়! অর্থাৎ কাদম্বরীই বন্ধ্যা। সবাই যে তাঁকে বাঁজা বলে উপহাস করে সেটাই তবে সত্যি! হতাশায়, গ্লানিতে প্রতিমুহূর্তে তাঁর মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু তার আগে জ্যোতির সঙ্গে একবার শেষ দেখা হবে না? উদ্‌বোধনের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন তিনি, তারপর ভাবা যাবে কী করণীয়।

শাড়ি-জামা নাড়াচাড়া করেন, চিঠি পড়েন আর অপেক্ষা করতে থাকেন ১৯-এর বিকেলের জন্য। রূপা বাড়ির মেয়েদের ডাকাডাকি করেন কাদম্বরীর সঙ্গে কথা বলতে, সৌদামিনী শরৎকুমারীরা এক-দু'বার এসে ঘুরে যান, কিন্তু কাদম্বরীর মৌনতা কেউ ভাঙতে পারেন না।

জাহাজ উদ্‌বোধনের একদিন আগেই দেখাশোনার জন্য ছেলেমেয়েদের নিয়ে জাহাজে আস্তানা পেতেছেন জ্ঞানদা। জ্যোতি তো তিনদিন ধরে সেখানে আছেনই। এত অতিথির খানাপিনার ব্যবস্থা করা কী চাট্টিখানি কথা! জ্ঞানদা অতিথিদের জন্য বিলিতি মোগলাই সবরকম রান্নার আয়োজন করিয়েছেন।

খাবার টেবিল সাজানো, কামরার অন্দরসজ্জা সবদিকেই তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। গানবাজনার আয়োজন অবশ্য রবি আর অক্ষয়ের দায়িত্ব। তাঁরাও অনবরত আসা-যাওয়া করছেন জাহাজে।

একদিকে প্রবল কর্মযজ্ঞ আর অন্যদিকে অনন্ত প্রতীক্ষা। কাদম্বরী ভাবছেন কীভাবে জ্যোতির মুখোমুখি হবেন! কিছু বলবেন. নাকি বলবেন না! ছলনার অভিযোগে জ্যোতিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালে তিনিও যদি কাদম্বরীকে বাঁজা অসম্পূর্ণা বলেন! এ-সব চেপে রেখে হাসিমুখে তাঁর সামনে কি দাঁড়াতে পারবেন কাদম্বরী?

জাহাজে তখন শেষমুহূর্তের চাপ। পিয়ানোয় বসে রিড নাড়াচাড়া করতে করতে রবি একবার জানতে চান, জ্যোতিদাদা, নতুনবউঠানকে আনতে যাবে না?

যাব যাব, বলে পিয়ানোয় বসে পড়েন জ্যোতি, একটু পরে যাব, ভাটার টান কমুক। তা তোর বউকে আনছিস না কেন রবি?

সে তো আমি জানি না, তার কথা মেজোবউঠান জানেন, রবি আনমনে উত্তর দিলেন। কাজের লোকেদের ডাকাডাকিতে আবার অন্যদিকে চলে যান জ্যোতি।

কাদম্বরী উদ্বেগে ঘরে-বাইরে করছেন। বিশু তাঁতিনির কাছ থেকে আফিম চেয়ে রেখেছেন, ইচ্ছে-মুক্তি এখন তাঁর হাতের মুঠোয়। একটি সুন্দর হাতির দাঁতের কৌটোয় তুলে রেখেছেন আফিমটা। কিন্তু তার আগে শেষ দেখতে চান তিনি। ১৯ এপ্রিল বিকেলের আগেই কমলা রঙের স্বর্ণচরীতে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছেন হেকেটি ঠাকরুন, এবার সবার মাথা ঘোরানোর পালা। শেষ বাজিটা তাঁকে জিততেই হবে, ডাকিনী যোগিনীদের হাত থেকে জ্যোতিকে ফিরিয়ে আনতে হবে নিজের হৃদয়ে। বাঁজা তো কী হয়েছে, নারীত্বের আকর্ষণ তো শেষ হয়ে যায়নি!

কিন্তু জ্যোতি কিছুতেই সময় পাচ্ছেন না জাহাজ ছেড়ে বেরতে। চিরকালের মতোই শেষে রবিকে বললেন কাদম্বরীকে নিয়ে আসতে।

রবি জানেন কাদম্বরী অগ্নিগর্ভ হয়ে আছেন, তিনি সাহস পান না, বলেন, না জ্যোতিদাদা, আজ তোমাকেই যেতে হবে। আজ আমি তাঁকে সামলাতে পারব না।

কিন্তু জ্যোতি বেরতে গেলেই জ্ঞানদা পিছু ডাকেন, অথবা জাহাজের

কাপ্তেন, অথবা কোনও অতিথি আগেভাগেই পৌঁছে গেছেন বলে থেমে যেতে হয়।

কাদম্বরী অপেক্ষা করেন। বিকেল পেরিয়ে সন্ধে হয়, সন্ধে পেরিয়ে রাত। ছাদ থেকে কে যেন বলে ওঠে, কই লো নতুনবউ, তোর বর নিতে এল না?

এক এক করে সব গয়না খুলে ফেললেন কাদম্বরী। শাড়ি খুলে মেঝেতে ফেলে দিলেন। সাটিনের পেটিকোট আর রেশমি জ্যাকেট পরে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। কারা যেন জানলা দিয়ে দেখে যাচ্ছে। কী সব বলছে। ঘোরের মধ্যে কাদম্বরী শুনতে পেলেন, জাহাজের নাম রেখেছে 'সরোজিনী'। ওঃ কী অপমান!

অনেক রাতে উঠে হাতির দাঁতের কৌটো খুলে সবটা আফিম মুখের মধ্যে ঢেলে দিলেন কাদম্বরী। তারপর জল খেয়ে মাতালের মতো টলতে টলতে শুয়ে পড়লেন মেঝেতে।

সকালে তাঁকে মৃতপ্রায় অবস্থায় আবিষ্কার করার পরে শুরু হল যমে মানুষে টানাটানি। যন্ত্রণায় ছটফট করছেন কাদম্বরী, তাঁর পঁচিশ বছরের স্বর্গীয় সৌন্দর্যরাশি যেন ক্রমশ বিষাক্ত আইভিলতার চেহারা নিচ্ছে।

রবি টানা দু'দিন তাঁর শয্যার পাশে বসে রইলেন অপরাধী হৃদয়ে। জ্যোতির অবস্থা উদ্‌ভ্রান্তের মতো। সত্যি সত্যি কাদম্বরী যে এমন কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলবে, এটা তাঁর ভাবা উচিত ছিল! সেরেস্তার কাজ বন্ধ। দুই বিখ্যাত ডাক্তার নীলমাধব হালদার ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করেও কিছু করা গেল না।

২১ এপ্রিল ভোরে কাদম্বরী মারা গেলেন।

তাঁর শেষযাত্রায় সঙ্গ নিলেন রবি, সোমেন্দ্র, দ্বিপেন্দ্র ও অরুণেন্দ্র। সারাটা পথ রবি একটিও কথা বললেন না। ফিরে এসেও না। চব্বিশ বছরের জীবনে মৃত্যুকে এত কাছ থেকে আগে কখনও দেখেননি তিনি। তাঁর সবচেয়ে আপন মানুষটিই অভিমান করে চলে গেলেন, কত কী সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল, কত কথা অকথিত রইল। আর-একটু মনোযোগ দিলে এই বিপত্তি ঘটত না, জ্যোতিদাদা দূরে সরে গিয়েছিলেন বলেও রবির উচিত ছিল আরও কাছে এগিয়ে আসা। এই আপশোস কখনও যাবে না।

মহর্ষির নির্দেশে পুড়িয়ে ফেলা হল কাদম্বরীর শেষ চিরকুট, বিনোদিনীর চিঠিপত্র, এমনকী মৃতার হাতের লেখাও। খবরের কাগজে মোটারকম ঘুষ

দিয়ে খবর বন্ধ করা হল। এইভাবেই ঠাকুরবাড়ির সুন্দরীতমা, বিষণ্ণতমা নারীটির মৃত্যু ঢাকা পড়ে গেল অনন্ত রহস্যের মোড়কে।

কিন্তু রবির হৃদয় থেকে তাঁকে উপড়ে ফেলতে পারলেন না কেউই। কাদম্বরীর প্রথমবারের আত্মহননের চেষ্টার পরে 'তারকার আত্মহত্যা'য় রবি লিখেছিলেন, 'যদি কেহ শুধাইত/আমি জানি কী যে সে কহিত/ যতদিন বেঁচে ছিল/ আমি জানি কী তারে দহিত।' এখন আবার ঘোরের মধ্যে একটার পর একটা কবিতায় নতুনবউঠানের সঙ্গে কথোপকথন শুরু করলেন তিনি।

১৯

বিজয়িনী

বিষাদের ভার নিয়ে রূপা আর মালিনী এসেছে জ্ঞানদার কাছে। কিন্তু মেজোবউঠানকে দেখে তাদের আশ্চর্য লাগে, এত ঠান্ডা, দেখে মনেই হচ্ছে না বাড়িতে এত বড় অঘটন ঘটে গেছে। ওদের দেখে কেঁদে ওঠার বদলে তিনি শান্তভাবে মালিনীর ঝুলি থেকে বই বাছতে থাকেন, তাঁর পাশে বই দেখছিলেন বালিকা মৃণালিনী।

মৃণালিনীর পরনে কিন্তু শাড়ি নয়, নয়ানশুখ কাপড়ের একটি নীল গাউন পরানো হয়েছে তাঁকে। গাঁয়ের মেয়েকে চটজলদি ফ্যাশনেবল করে তুলতে চান জ্ঞানদা। কিশোরী জানতে চান, মালিনীদিদি, তোমার কাছে অ্যারিথমেটিক সেকেন্ড বুক আছে গো? আমার তো ফার্স্ট বুক শেষ হয়ে গেছে। আর 'ইউজফুল নলেজ' বইটা আছে?

জ্ঞানদা হেসে বললেন, ওদের কাছে কি লোরেটো হৌসের পড়ার বই থাকে রে বোকা মেয়ে, ও আমি তোকে কলেজ স্ট্রিট থেকে আনিয়ে দেব।

রূপা ছিল কাদম্বরীর সবসময়ের সঙ্গী, জ্ঞানদার এই ঠান্ডাভাব তার আর সহ্য হয় না। কাদম্বরীর সঙ্গে তাঁর ঠান্ডা লড়াইয়ের কথা সে তো ভালই জানে। তবু বিষাদমাখা গলায় সে বলে, মেজোবউঠান, আমি আর বাড়িতে টিকতে পারছি না, তেতলার ঘরের দিকে তাকালেই বুক হু হু করে উঠছে।

জ্ঞানদা বই দেখতে থাকেন নীরবে। রূপা আর মালিনীর জন্য রেকাবিতে জলখাবার নিয়ে আসে একটি কাজের মেয়ে। মৃণালিনী তাড়াতাড়ি অতিথিদের দিকে রেকাবি এগিয়ে দেন।

মালিনী মৌন জ্ঞানদাকে দেখতে দেখতে বলে, নতুনবউঠান কেন এমন করলেন, সেই রহস্যটাই বুঝতে পারলাম না।

রূপা যোগ করে, নিশ্চয় কাছের লোকের কাছে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন। অত সাধ করে সাজগোজ করলেন উদ্‌বোধনে যাবেন বলে---

রূপাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই জ্ঞানদা বলে ওঠেন, না হয় ওকে নিতে আসতে পারেনি নতুনঠাকুরপো, এটুকুতেই আফিম খেয়ে মরতে হবে!

সবাই তো তোমার মতো শক্ত নয়, মেজোবউঠান, রূপা বলে, আর তুমি ভরা সংসার নিয়ে বসবাস কর, রবিদাদা জ্যোতিদাদাকেও তার কাছ থেকে টেনে নিয়েছ, তার দুঃখ তুমি কী বুঝবে?

টেনে নিয়েছি মানে কী রূপা? জ্ঞানদা বিরক্ত হন। কথা যা বলবে, ভেবেচিন্তে বলবে, আমি এরকম মন্তব্য পছন্দ করি না।

হঠাৎ আবহাওয়া কেমন পালটে যাচ্ছে বুঝতে পারেন না মৃণালিনী, তাঁর মুখ থমথমে হয়ে যায় সকলের দিকে তাকিয়ে।

রূপা নাছোড়, জ্যোতিদাদা রাতে এখানে তোমার কাছে থেকে যেতেন বলে তাঁর যন্ত্রণা আমি দিনের পর দিন পাশে থেকে দেখেছি মেজোবউঠান।

মালিনী এবার না বলে পারে না, স্বামী দূরে সরে যাওয়ায় নতুনবউঠান যে দিন দিন নিঃসঙ্গতায় ক্ষয়ে যাচ্ছিলেন, মেজোবউঠান, তুমি এত বুঝদার আর এটা বোঝনি? তুমিই তো ইচ্ছে করলে জ্যোতিদাদাকে ঠেলে পাঠাতে পারতে তাঁর কাছে!

জ্ঞানদা একটু কোণঠাসা বোধ করেন, তোমরা ঘটনাটার ভুল ব্যাখ্যা করছ মালিনী। কাদম্বরীর স্বভাবেই আত্মহননের বীজ লুকিয়ে ছিল। আর আমার কথা যদি বল, আমি ওকে কোনওদিনই বুঝতে পারিনি। আত্মহত্যা মানে তো হেরে যাওয়া, আমি ভাবতেই পারি না মানুষ কী করে মরে যেতে চায়। নতুনঠাকুরপোকে এর জন্য দায়ী করা ঠিক নয়।

যাকগে মেজোবউঠান, ওকথা থাক, মালিনী বলে, তুমি কি অক্ষয় চৌধুরীর নতুন কবিতা 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' পড়েছ? আমি পাঠ করছি শোনো-

'রাখিতে তাহার মন, প্রতিক্ষণে সযতন
হাসে হাসি কাঁদে কাঁদি— মন রেখে যাই
মরমে মরমে ঢাকি তাহারি সম্মান রাখি,
নিজের নিজস্ব ভুলে তারেই ধেয়াই,
কিন্তু সে তো আমা পানে ফিরেও না চায়।'

শুনতে শুনতে জ্ঞানদার মুখ থমথমে হয়ে যায়, কবিতাটি তো কাদম্বরীকে নিয়েই লেখা, অধীর হয়ে তিনি বলেন, অক্ষয়বাবুর এ ভারী অন্যায়, কিছুই না জেনে জ্যোতির প্রতি অভিযোগের তির ছুড়ে পাঠকের বাহবা কুড়োতে চাইছেন।

উনি বাইরে থেকে যে সত্যিটা দেখতে পেলেন, তুমি ঘরের মানুষ হয়েও দেখলে না মেজোবউঠান, রূপা কথা শোনানোর সুযোগ ছাড়ে না।

জ্ঞানদার ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে, আমি যখন ঠাকুরবাড়ির বউ হয়ে এসেছিলাম, তখন পরপুরুষের সামনে বেরোনো যেত না। সেদিনের কথা মনে পড়লে হাসি পায়, তোমাদের মেজদাদার খুব ইচ্ছে হয়েছিল বন্ধু মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে আমার আলাপ করাবেন। 'কিন্তু আমার তো বাইরে যাওয়ার জো নেই, অন্য পুরুষেরও বাড়ীর ভিতরে আসবার নিয়ম নেই। তাই নিয়ে ওরা দুজনে পরামর্শ করে একদিন বেশী রাত্রে সমানতালে পা ফেলে বাড়ীর ভিতরে এলেন। তারপর উনি মনোমোহনকে মশারির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে শুয়ে পড়লেন। আমরা দুজনেই মশারির মধ্যে জড়সড় হয়ে বসে রইলুম; আমি ঘোমটা দিয়ে বিছানার একপাশে আর তিনি ভোম্বলদাসের মত আর একপাশে। লজ্জায় কারো মুখে কথা নেই। আবার কিছুক্ষণ পরে তেমনি সমানতালে পা ফেলে উনি তাঁকে বাইরে পার করে দিয়ে এলেন।' জ্ঞানদার কথায় সবাই হাসতে থাকে।

সুদৃশ্য কাটগ্লাসে ফলের রসে একঢোক চুমুক দিয়ে জ্ঞানদা বলতে থাকেন, সে দুঃসাহস আমি জুগিয়েছি বলেই কাদম্বরীর নন্দনকাননে এত উপাসক জুটেছিল। অক্ষয়বাবু তো কাদম্বরীর কৃপাদৃষ্টির লোভে কত গান কত কবিতা শোনাতেন ছাদের আসরে। আর ঠাকুরপোর বন্ধু হয়েও তাই এখন তাকে দুষছেন। তোমরা জলখাবার খাচ্ছো না কেন? গ্লাস ও রেকাবি এগিয়ে দেন জ্ঞানদা।

একটুকরো সন্দেশ মুখে দিয়ে মালিনী বলল, তুমি অক্ষয়বাবুর সাক্ষ্য উড়িয়ে দিচ্ছ মেজোবউঠান, তুমি যা দেখতে পাওনি বিহারীলাল 'সাধের আসনে' তার কী বিবরণ লিখেছেন শোনো,

'পুরুষ কিম্ভূতমতি চেনে না তোমায়
মন প্রাণ যৌবন— কী দিয়া পাইবে মন।
পশুর মতন এরা নিতুই নতুন চায়।'

'পশুর মতন'! এটা কি বাড়াবাড়ি নয়? জ্ঞানদা বিরক্ত হন, কবিদের কথায় মাঝে মাঝে কোনও লাগাম থাকে না।

ছটফট করে উঠে মৃণালিনী বলে ফেলেন, আচ্ছা, নতুনবউঠান নিশ্চয় নতুনঠাকুরের কাছ থেকে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন, নইলে এমন সুখের সংসার ছেড়ে শখ করে কেউ আফিম খায়?

জ্ঞানদা চুপ করে বসে থাকেন, বিড়বিড় করে বলেন, নতুনের কোনও দোষ নেই, প্রথমেই বলেছিলাম, এ বিয়েটা ভাল হবে না! ওর মতো উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে বেঁধে রাখার ক্ষমতা নতুনবউর ছিল না, তাই নিজেই আত্মঘাতী হল।

রূপা উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে, তুমিই ওকে মেরেছ, তুমি আর জ্যোতিদাদা। তোমার ঈর্ষার বিষে তিলতিল করে মরতে মরতে আফিম খেয়ে নিল নতুনবউঠান। আমি এখন কার কাছে থাকব? সামনে সাজানো ফলমিষ্টির থালায় লাথি মেরে, গ্লাস উলটে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় রূপা, কোনও এক অনির্দেশের উদ্দেশে।

ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায় মৃণালিনীর। মুহূর্তের জন্য জ্ঞানদার স্নিগ্ধবোধ টলে যায়, দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ভাবেন, সত্যিই কি তিনি কাদম্বরীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন? মুখে মেঘ ও রোদের দোলাচল নিয়ে তিনি ভেতরের ঘরের দিকে এগিয়ে যান।

কাদম্বরীর মৃত্যুতে ভারতীরও মৃত্যু হল। সবাই যেন পত্রিকা প্রকাশের উৎসাহ হারিয়ে ফেললেন। ভারতীকে ঘিরে জড়ো হওয়া উজ্জ্বল নক্ষত্রদের একত্র করে একটি তোড়া বেঁধেছিলেন কাদম্বরী, তাঁর অনুপস্থিতিতে সেই বাঁধনটিই ছিঁড়ে গেল। শেষের দিকে জ্ঞানদার বাড়িতে ভারতীর মিটিং বসলেও সবাই যেন মনে মনে জানতেন, সে সাময়িক। ভারতীর আসল ঠিকানা কাদম্বরীর তেতলার ঘর।

নতুনবউঠানকে ছাড়া রবির আর সম্পাদনার কাজ করতে ইচ্ছে করে না। তিনি লেখা আর কবিতাব বইয়ের পাণ্ডুলিপি রচনায় মন দিয়েছেন, পরপর চারটি বই বেরল, তার মধ্যে 'শৈশবসঙ্গীত', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ও 'ভানুসিংহের পদাবলী' তিনটিই উৎসর্গ করলেন নতুনবউঠানকে।

জ্যোতির পক্ষে তো সময় দেওয়া বা মনস্থির করে কাজ করা এখন

অসম্ভব, তিনি দিনের বেলা উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ান, রাত্রে থাকেন মেজোবউঠানের কাছে বা বিনোদিনীর বাড়িতে। একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ভারতীর প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হল।

কিন্তু ভারতীর মৃত্যুসংবাদ স্বর্ণকুমারী মোটেই মেনে নিতে পারছিলেন না। তাঁর বিবেচনায় ব্যক্তিগত শোকের চেয়ে কাজ অনেক বড়। ভাইদের উদাসীনতায় পত্রিকা উঠে যাবে, এ কেমন কথা! তিনি নিজেই দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এলেন। প্রথম মহিলা সম্পাদকের হাতে শুরু হল ভারতীর নতুন অধ্যায়।

অন্তরে যাই থাক, জ্যোতিকে বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না, জাহাজের ব্যাবসা নিয়ে এখনও তেমনি মেতে আছেন, বিনোদিনীকে নিয়েও। বসবাস করছেন মূলত জ্ঞানদার বাড়িতে। কাদম্বরীর মৃত্যুতে তাঁর ভূমিকা নিয়ে গুঞ্জন উঠলেও সংবাদপত্রগুলি ও ঠাকুরবাড়ির ঘনিষ্ঠদের মুখে কুলুপ এঁটে কেচ্ছা কেলেঙ্কারির সম্ভাবনা চাপা দিয়েছেন দেবেন ঠাকুর। অক্ষয় বা বিহালীলালের কবিতা হয়তো বন্ধ করা যায়নি, রবির একের পর এক শোকগাথার মধ্য থেকেও অনুযোগের সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কিন্তু সে-সব শিল্পিত প্রতিবাদ উচ্চকোটি সমাজে মৃদু তরঙ্গ তুলেই মিলিয়ে গেছে। রবির বর্ণনামতোই 'যেমন আছিল আগে তেমনই রয়েছে জ্যোতি'।

কাদম্বরীর মৃত্যুর ঠিক একমাসের মধ্যেই খুলনা-বরিশাল যাত্রীফেরি চালানোর সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল। ঠিক হল যে ২৩ মে-র শুভদিনে কলকাতার গঙ্গার ঘাট থেকে জাহাজ নিয়ে বরিশালের দিকে যাত্রা করবেন জ্যোতি। রবি আর অক্ষয় তাঁর দুই অবশ্যম্ভাবী সঙ্গী। প্রধান উৎসাহদাত্রী জ্ঞানদা। যদিও এর আগে দু'-একটি উদ্যোগ নিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন জ্যোতি, জ্ঞানদার বিশ্বাস এবার তাঁর উজ্জ্বল দেবরটি বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ করবেন।

মনে টানাপোড়েন নিয়েই জ্যোতিদাদাকে সঙ্গ দিতে প্রস্তুত হয়েছেন রবি। জ্যোতির অস্থির প্রকৃতির কারণে ব্যথা পেয়ে চলে গেছেন নতুনবউঠান, কিন্তু সেজন্য দাদার প্রতি রবির ভালবাসা একটুও কমেনি। তীব্র শোককে বুকের গোপন কৌটোয় আটকে রেখে বাইরের সবকাজে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছেন রবি।

অক্ষয়ের অবস্থাও সেরকম, কাদম্বরীর মৃত্যুর জন্য জ্যোতির ওপর রাগ

হয় কিন্তু তাঁকে ত্যাগ করতে পারেন না। আশ্চর্য মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে আছে তাঁদের বন্ধুত্ব।

যিনি চলে গেলেন, তাঁর জন্য কিছুই থেমে থাকল না। ২৩মে-র সকালে বাক্সপ্যাঁটরা গুছিয়ে গঙ্গার ঘাটের দিকে যাত্রা শুরু হল। সজলনয়নে বউঠান-দেবরদের বিদায়ের পটভূমি রচিত হলেও শেষমুহূর্তে তিন যুবকের ওপর ভরসা রাখতে না পেরে জ্ঞানদা সপুত্রকন্যা তাঁদের সঙ্গী হলেন।

সকালে সবাই সদলবলে চিৎপুর রোড ধরে রওনা হলেন কয়লাঘাটের উদ্দেশে। রাস্তার দু'পাশে সারি সারি বেলোয়ারি ঝাড়ের দোকান আর ছ্যাকড়া গাড়ির আস্তাবল। রাতের গ্যাসল্যাম্পগুলো নেভানো হয়নি, তার ওপর সূর্যের আলো পড়ে চোখে ঝিলিক মারছে। একইরকম ধীরগতিতে চলছে ফাঁকা ট্রাম আর মিউনিসিপালটির ময়লাফেলার গাড়ি। শিককাবাব আর রুটি তৈরি হচ্ছে মুসলমানি খাসির দোকানের ঝোলানো মাংসের পাশেই। কেউ রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছে তো কেউ মসজিদের ধারে কোরান পাঠ করছে।

এ-সব পেরিয়ে কয়লাঘাটে পৌঁছে ঘাটের নৌকোগুলোর দিকে তাকিয়ে রবি ভাবলেন এরা যেন অতিকায় দৈত্যদের পায়ের সারি সারি জুতোর মতো দাঁড়িয়ে আছে। অভিজাত নারীপুরুষদের এহেন দলটিকে দেখে মাঝিরা 'আমার নৌকোয়' 'আমার নৌকোয় আসুন' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোনওরকমে একটি নৌকোয় চেপে পৌঁছনো হল জাহাজের কাছে।

নৌকো থেকে জাহাজে ওঠাও একটা অ্যাডভেঞ্চার। মাঝগঙ্গা থেকে হুড়মুড় করে এগিয়ে আসা 'সরোজিনী' জাহাজের গায়ে নিপুণ দক্ষতায় নৌকো লাগিয়ে দিল মাঝি। টলোমলো নৌকোর ওপর জাহাজ থেকে নামানো হল মই। বিবি আর সুরেন তো তরতর করে উঠে পড়ল। তারপর অতিযত্নে এক পা এক পা করে সিঁড়ি ভেঙে জাহাজে পা রাখলেন জ্ঞানদা। পেছন পেছন জ্যোতি, রবি, অক্ষয়।

ছ'জন অভিযাত্রীকে নিয়ে সরোজিনী জাহাজের জলযাত্রার প্রথম পর্ব শুরু হল বেশ রোমাঞ্চকরভাবেই। দুরন্ত গতিতে জাহাজ ছুটতে লাগল। ডেকের ওপরে চেয়ার পেতে বসতেই উথালপাতাল হাওয়ায় সকলের জামাকাপড় এলোমেলো হয়ে গেল। বাতাসে রবির আচকান ফুলে উঠল নৌকোর পালের মতো, উড়নি উড়তে লাগল আকাশে। জ্ঞানদার খোলা চুল মাথার ওপর নাগিনীনৃত্য দেখাতে শুরু করল। বাতাসে পাখনা মেলে দিল তাঁর

নয়নসুখ শাড়ি। বিবির বিলিতি ফ্রকের ঘের ব্যালেরিনার মতো গোল হয়ে ঘুরতে লাগল, জ্যোতির উত্তরীয় অভিযানের পতাকার মতো এগিয়ে চলল সামনের দিকে। নীচে মাটির জলরাশির অসংখ্য ঢেউয়ের মাথায় মাথায় নেচে বেড়াচ্ছে সূর্যের আলো।

জ্ঞানদা আবেশভরে চোখ বুজে বললেন, নতুনঠাকুরপো, তোমার এই ডেকের ওপর আমি সারাজীবন থেকে যেতে পারি। গঙ্গাবক্ষে এই ভ্রমণের কোনও তুলনা হয় না।

দুটি চেয়ার পাশাপাশি গায়ে গা ঠেকিয়ে স্নেহভরে বসে আছে, জ্ঞানদাও একটু হেলে চেয়ারের পেছনদিকে মাথা রাখলেন। জাহাজের দুলুনিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই পরম আরামে তাঁর চোখ বুজে এল। গঙ্গার জলবাতাসে জ্যোতির উত্তেজিত স্নায়ুগুলিও বহুদিন পরে বিশ্রাম পেয়েছে, তিনিও বউঠানের মাথার পাশে মাথা রেখে মৃদু নাসিকা গর্জন শুরু করলেন।

আশেপাশে ছিপছিপে পানসিগুলো দু'-একটি অফিসযাত্রী নিয়ে তরতর করে বয়ে চলেছে কোন এক ঘাটের দিকে। সেদিকে তাকিয়ে আনমনে কী ভাবছিলেন রবি। বিবি ও সুরেন তাঁর হাত ধরে কেবলই টানাটানি করছে।

এমন সময় জাহাজের বৃদ্ধকর্তাবাবু এসে বললেন, একটা দুশ্চিন্তার ব্যাপার ঘটেছে, জাহাজ ছাড়ার পর টের পাওয়া গেছে যে কাপ্তেনটি পালিয়ে গেছে।

ঘুমঘোর ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসলেন জ্যোতি, কী হবে এখন? কাপ্টেন ছাড়া জাহাজ চলবে কী করে?

জ্ঞানদার চটকা ভেঙে গেল, দুটি বাচ্চা এবং তিনটি অর্বাচীন যুবকসঙ্গীকে নিয়ে এবার কি অথই জলে পড়তে চলেছেন! তিনি বলেন, তা হলে তো যাত্রা বন্ধ করে নোঙর ফেলাই ভাল।

জ্যোতি কিছুতেই দমবার পাত্র নন, তিনি অভিমত দিলেন, অন্যান্য কর্মচারীরাই বেশ জাহাজ টেনে নিয়ে যেতে পারবে, ক্যাপ্টেনের চেয়ে তারা কোনও অংশে কম নয়।

বুড়োকর্তাও জ্যোতিকে সমর্থন করে বললেন জাহাজ থামানোর দরকার নেই, ওরাই চালিয়ে নেবে। জাহাজ অবশ্য চলতে চলতেই হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। শিবপুর বটানিকাল গার্ডেনের কাছাকাছি এসে দেখা গেল জাহাজের হৃদয়ে ধুকপুক শব্দ হচ্ছে না, কল চলছে না। কী একটা যন্ত্র খুলে গেছে, মেরামত করতে হবে। দু'-তিনঘন্টার জন্য সেখানেই নোঙর ফেলতে হল জ্যোতিকে।

গঙ্গার শোভা দেখতে দেখতেই রবির মনে পড়ে যায় নতুনবউঠানের সঙ্গে গঙ্গাতীরের সুখের দিনগুলি। কত ছবি। কত দৃশ্য। সেইসব সুখের ছবির সঙ্গে মিলে যেতে থাকে আজকের গঙ্গা, রবি ডায়েরিতে লিখতে থাকেন,—

'বসিয়া বসিয়া গঙ্গাতীরের শোভা দেখিতে লাগিলাম। শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা এমন আর কোথায় আছে। গাছপালা ছায়া কুটীর—নয়নের আনন্দ অবিরল সারি সারি দুই ধারে বরাবর চলিয়াছে, কোথাও বিরাম নাই। কোথাও বা তটভূমি সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন হইয়া গঙ্গার কোলে আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে; কোথাও বা একেবারে নদীর জল পর্যন্ত ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া ঝুঁকিয়া আসিয়াছে, জলের উপর তাহাদের ছায়া অবিশ্রাম দুলিতেছে; কতকগুলি সূর্যকিরণ সেই ছায়ার মাঝে মাঝে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, আর বাকি কতকগুলি—গাছপালার কম্পমান কচি মসৃণ সবুজ পাতার উপরে চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিতেছে। একটা বা নৌকা তাহার কাছাকাছি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে, সে সেই ছায়ার নীচে, অবিশ্রাম জলের কুলকুল শব্দে মৃদু মৃদু দোল খাইয়া বড়ো আরামের ঘুম ঘুমাইতেছে। তাহার আর-এক পাশে বড়ো বড়ো গাছের অতি ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া ভাঙা ভাঙা বাঁকা একটা পদচিহ্নের পথ জল পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। সেই পথ দিয়া গ্রামের মেয়েরা কলসী কাঁখে করিয়া জল লইতে নামিয়াছে, ছেলেরা কাদার উপরে পড়িয়া জল ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া সাঁতার কাটিয়া ভারি মাতামাতি করিতেছে। প্রাচীন ভাঙা ঘাটগুলির কী শোভা! মানুষেরা যে এ ঘাট বাঁধিয়াছে তাহা একরকম ভুলিয়া যাইতে হয়; এও যেন গাছপালার মতো গঙ্গাতীরের নিজস্ব। ইহার বড়ো বড়ো ফাটলের মধ্য দিয়া অশথগাছ উঠিয়াছে, ধাপগুলির ইঁটের ফাঁক দিয়া ঘাস গজাইতেছে— বহু বৎসরের বর্ষার জলধারায় গায়ের উপরে শেয়ালা পড়িয়াছে—এবং তাহার রঙ চারি দিকের শ্যামল গাছপালার রঙের সহিত কেমন সহজে মিশিয়া গেছে। মানুষের কাজ ফুরাইলে প্রকৃতি নিজের হাতে সেটা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তুলি ধরিয়া এখানে ওখানে নিজের রঙ লাগাইয়া দিয়াছেন। অত্যন্ত কঠিন সগর্ব ধব্‌ধবে পারিপাট্য নষ্ট করিয়া, ভাঙাচোরা বিশৃঙ্খলা মাধুর্য স্থাপন করিয়াছেন। গ্রামের যে-সকল ছেলেমেয়েরা নাহিতে বা জল লইতে আসে তাহাদের সকলেরই সঙ্গে ইহার যেন একটা-কিছু সম্পর্ক পাতানো আছে—কেই ইহার নাতনি, কেহ ইহার ভাগ্‌নে, কেহ ইহার মা-মাসি। তাহাদের

দাদামহাশয় ও দিদিমারা যখন এতটুকু ছিল তখন ইহারাই ধাপে বসিয়া খেলা করিয়াছে, বর্ষার দিনে পিছল খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর সেই-যে যাত্রাওয়ালা বিখ্যাত গায়ক অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধ্যাবেলায় ইহার পইঠার উপর বসিয়া বেহালা বাজাইয়া গৌরী রাগিণীতে 'গেল গেল দিন' গাহিত ও গাঁয়ের দুই-চারিজন লোক আশেপাশে জমা হইত, তাহার কথা আজ আর কাহারও মনে নাই। গঙ্গাতীরের ভগ্ন দেবালয়গুলিরও যেন বিশেষ কী মাহাত্ম্য আছে। তাহার মধ্যে আর দেবপ্রতিমা নাই। কিন্তু সে নিজেই জটাজূটবিলম্বিত অতি পুরাতন ঋষির মতো অতিশয় ভক্তিভাজন ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। এক-এক জায়গায় লোকালয়— সেখানে জেলেদের নৌকা সারি সারি বাঁধা রহিয়াছে। কতকগুলি জলে, কতকগুলি ডাঙায় তোলা, কতকগুলি তীরে উপুড় করিয়া মেরামত করা হইতেছে; তাহাদের পাঁজরা দেখা যাইতেছে। কুঁড়েঘরগুলি কিছু ঘন ঘন কাছাকাছি—কোনো-কোনোটা বাঁকাচোরা বেড়া দেওয়া—দুই-চারিটি গোরু চরিতেছে, গ্রামের দুই-একটা শীর্ণ কুকুর নিষ্কর্মার মতো গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; একটা উলঙ্গ ছেলে মুখের মধ্যে আঙুল পুরিয়া বেগুনের খেতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া আমাদের জাহাজের দিকে চাহিয়া আছে। হাঁড়ি ভাসাইয়া লাঠি-বাঁধা ছোটো ছোটো জাল লইয়া জেলের ছেলেরা ধারে ধারে চিংড়িমাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে। সমুখে তীরে বটগাছের জালবদ্ধ শিকড়ের নীচে হইতে নদীস্রোতে মাটি ক্ষয় করিয়া লইয়া গিয়াছে, ও সেই শিকড়গুলির মধ্যে একটি নিভৃত আশ্রয় নির্মিত হইয়াছে। একটি বুড়ি তাহার দুই চারিটি হাঁড়িকুড়ি ও একটি চট লইয়া তাহারই মধ্যে বাস করে। আবার আর-এক দিকে চড়ার উপরে বহুদূর ধরিয়া কাশবন; শরৎকালে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে তখন বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোলে হাসির সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতে থাকে। যে কারণেই হউক, গঙ্গার ধারের ইঁটের পাঁজাগুলিও আমার দেখিতে বেশ ভালো লাগে; তাদের আশেপাশে গাছপালা থাকে না, চারি দিকে পোড়ো জায়গা এবড়ো-খেবড়ো, ইতস্তত কতকগুলো ইঁট খসিয়া পড়িয়াছে, অনেকগুলি ঝামা ছড়ানো, স্থানে স্থানে মাটি কাটা—এই অনুর্বরতা-বন্ধুরতার মধ্যে পাঁজাগুলো কেমন হতভাগ্যের মত দাঁড়াইয়া থাকে। গাছের শ্রেণীর মধ্য হইতে শিবের দ্বাদশ মন্দির দেখা যাইতেছে; সমুখে ঘাট নহবতখানা হইতে নহবত বাজিতেছে। তাহার ঠিক পাশেই খেয়াঘাট। কাঁচা ঘাট, ধাপে ধাপে তালগাছের গুঁড়ি দিয়া বাঁধানো। আর, দক্ষিণে কুমারদের বাড়ি, চাল

হইতে কুমড়া ঝুলিতেছে। একটি প্রৌঢ়া কুটীরের দেওয়ালে গোবর দিতেছে; প্রাঙ্গণ পরিষ্কার, তক্‌তক্‌ করিতেছে; কেবল এক প্রান্তে মাচার উপরে লাউ লতাইয়া উঠিয়াছে, আর-এক দিকে তুলসীতলা। সূর্যাস্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম-পারের শোভা যে দেখে নাই সে বাংলার সৌন্দর্য দেখে নাই বলিলেও হয়। এই পবিত্র শান্তিপূর্ণ অনুপম সৌন্দর্যচ্ছবির বর্ণনা সম্ভবে না। এই স্বর্ণচ্ছায়া ম্লান সন্ধ্যালোকে দীর্ঘ নারিকেলের গাছগুলি, মন্দিরের চূড়া, আকাশের পটে আঁকা নিস্তব্ধ গাছের মাথাগুলি, স্থির জলের উপরে লাবণ্যের মতো সন্ধ্যার আভা—সুমধুর বিরাম, নির্বাপিত কলরব, অগাধ শান্তি—সে-সমস্ত মিলিয়া নন্দনের একখানি মরীচিকার মতো, ছায়াপথের পরপারবর্তী সুদূর শান্তিনিকেতনের একখানি ছবির মতো পশ্চিমদিগন্তের ধারটুকুতে আঁকা দেখা যায়। ক্রমে সন্ধ্যার আলো মিলাইয়া যায়, বনের মধ্যে এ দিকে ও দিকে এক-একটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সহসা দক্ষিণের দিক হইতে একটা বাতাস উঠিতে থাকে, পাতা ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠে, অন্ধকারে বেগবতী নদী বহিয়া যায়, কূলের উপরে অবিশ্রাম তরঙ্গ-আঘাতে ছল্‌ছল্‌ করিয়া শব্দ হইতে থাকে—আর- কিছু ভালো দেখা যায় না, শোনা যায় না, কেবল ঝিঁঝি পোকার শব্দ উঠে, আর জোনাকিগুলি অন্ধকারে জ্বলিতে নিবিতে থাকে। আরও রাত্রি হয়। ক্রমে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ ঘোর অন্ধকার অশথগাছের মাথার উপর দিয়া ধীরে ধীরে আকাশে উঠিতে থাকে। নিম্নে বনের শ্রেণীবদ্ধ অন্ধকার, আর উপরে ম্লান চন্দ্রের আভা। খানিকটা আলো অন্ধকার-ঢালা গঙ্গার মাঝখানে একটা জায়গায় পড়িয়া তরঙ্গে তরঙ্গে ভাঙিয়া ভাঙিয়া যায়। ও পারের অস্পষ্ট বনরেখার উপর আর-খানিকটা আলো পড়ে, সেইটুকু আলোতে ভালো করিয়া কিছুই দেখা যায় না; কেবল ও পারের সুদূরত্বা ও অস্ফুটতাকে মধুর রহস্যময় করিয়া তোলে। এ পারে নিদ্রার রাজ্য আর ও পারে স্বপ্নের দেশ বলিয়া মনে হইতে থাকে।

এই যে-সব গঙ্গার ছবি আমার মনে উঠিতেছে, এ কি সমস্তই এইবারকার স্টীমারযাত্রার ফল? তাহা নহে। এ-সব কতদিনকার কত ছবি, মনের মধ্যে আঁকা রহিয়াছে। ইহারা বড়ো সুখের ছবি, আজ ইহাদের চারি দিকে অশ্রুজলের স্ফটিক দিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছি। এমনতরো শোভা আর এ জন্মে দেখিতে পাইব না।'

ইতিমধ্যেই যাত্রীদের মধ্যাহ্নভোজন সারা হয়েছে। কেদারায় অর্ধশয়ান জ্ঞানদার মনে বিচিত্রভাবের আনাগোনা চলেছে। আজ আবার তাঁর কাছে পুরোপুরি ফিরে এসেছে প্রিয় বাল্যসঙ্গী জ্যোতি। রবির সঙ্গে ছেলেমেয়েরা মেতে উঠেছে ব্রাইটনের দিনগুলোর মতো। আজ আর ওদের কোনও পিছুটান নেই, কাদম্বরী অপেক্ষা করে বসে নেই ঘরে। এটাই তো চেয়েছিলেন তিনি, জ্যোতি ও রবির প্রতিভাকে আর কে লালন করবে তিনি ছাড়া? কাদম্বরী এই সুখ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছিলেন, হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসেছিলেন তাঁর রাজ্যপাটে। 'শ্যাম গাঙ্গুলির মেয়ে' বলে যাকে হেলাফেলা করেছিলেন, সেই এসে জ্ঞানদার পায়ের তলার জমি কেড়ে নিয়েছিল কিছুদিন। এখন সে আর নেই, কাপুরুষের মতো হার স্বীকার করে পালিয়ে গেছে। জ্ঞানদা আজ বিজয়িনী।

কিন্তু এই জয় কি তিনি চেয়েছিলেন? জ্যোতিকে নিজের বির্জিতলাওয়ের বাড়িতে রাতের পর রাত আটকে রেখে সত্যিই কি তিনি খুব নিষ্ঠুরতা করেছেন কাদম্বরীর ওপর? রূপা যা বলে গেল, সেটাই কি সত্যি? কাদম্বরীর মৃত্যুকে কি কোনওভাবে ঠেকাতে পারতেন জ্ঞানদা? জলের ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে আনমনে ভাবতে থাকেন জ্ঞানদা, ভাবতেই থাকেন।

এরমধ্যে মেরামত হয়ে জাহাজ চলতে শুরু করল। গঙ্গা ক্রমশ চওড়া হচ্ছে। কিছুদূর জলপথের আনন্দ উপভোগ করে সাড়েতিনটে নাগাদ ডেকের ওপর জমিয়ে শুরু হল ফলাহার।

রবি বললেন, মেজোবউঠান না এলে এমন খাওয়াদাওয়ার তরিবত থেকে বঞ্চিত হয়ে শুকিয়ে মরতে হত বোধহয়।

অক্ষয় গুনগুন করে কী একটা সুর ভাঁজছিলেন। একটি রসালো আঙুর মুখে দিয়ে তিনি হঠাৎ বললেন, আজ তাঁকে খুব মনে পড়ছে।

রবির বুকে যে তীব্র শোক টইটম্বুর জলাধারের আকারে লুকিয়ে আছে, অক্ষয়ের একটি কথায় তা যেন বন্যার মতো উপচে পড়তে চাইল। লোকসমাজে যখন-তখন চোখের জল বেরিয়ে এলে তো চলবে না, রবি সম্প্রতি সেটা লুকোতে দুটি পন্থা নিয়েছেন। হয় হাসিঠাট্টার মোড়কে সব ঢেকে রাখছেন অথবা গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠছেন, যেমন এখন চট করে মুখ লুকিয়ে গেয়ে উঠলেন, 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু---'

কী আশ্চর্য রবি, অক্ষয় বললেন, তাঁর মৃত্যুর ক'দিন আগেই ব্রাহ্মসমাজে

গাইবার জন্য তুমি গানটি লিখেছিলে, কে জানত আমাদের চোখের জল ঢেকে রাখতে হবে এই গান দিয়ে। তিনিও গলা মেলান রবির সঙ্গে। বিবির রিনরিনে গলা যোগ হয়ে জাহাজের ডেকের ওপরে যেন নেমে এল সুরের ঝরনাধারা।

জ্যোতিও সেই শোকসংগীতের সঙ্গে গলা মেলাতে শুরু করলেন, কিন্তু তাঁর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে নেমে আসতে লাগল বাধ না মানা অশ্রুরাশি।

তিনযুবকের এই অসংকোচ শোকে বড় বিব্রতবোধ করেন জ্ঞানদা। এখানেও যেন কাদম্বরী সশরীরে উপস্থিত। জ্যোতির অশ্রু নিজের আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেন জ্ঞানদা, তার মাথায় হাত দিয়ে চুলে বিলি কেটে দেন শুশ্রূষায়।

জ্যোতি তাঁকে জড়িয়ে হাউহাউ করে কেঁদে ওঠেন, আমার দোষেই কি সে চলে গেল, বলো মেজোবউঠান, তুমি বলো, আমার কি কোনও দোষ ছিল?

পরম মমতায় তাঁকে শান্ত করতে চান জ্ঞানদা, নতুনঠাকুরপো, তোমার কোনও দোষ নেই, তুমি তো তাকে ভালই বাসতে, সে অবুঝ ছিল বলে তোমাকে বুঝতে পারেনি।

কথাটা শেলের মতো রবির হৃদয়ে বাজে। অক্ষয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হয় তাঁর। দু'জনে দু'জনের মনের ভাষা বুঝে নেন, অন্তরে যাই থাকুক, প্রকাশ্যে তাঁরা কিছুই বললেন না।

কিন্তু জ্যোতি এই নীরবতার মানে জানেন, দীর্ঘকালের সঙ্গী অক্ষয় যে মনে মনে তাঁকে অপরাধী ভাবছেন তা বুঝে কষ্ট পান। রবি তো গুমরে মরছে, অথচ প্রাণে ধরে দাদাকে দোষ দিতে পারছে না।

জ্ঞানদার আঁচল থেকে মুখ তুলে তিনি বলেন, মেজোবউঠান, জগতের সবাই যদি তোমার মতো করে ভাবত, তা হলে তো ভাবনার কিছু ছিল না। এই তো দেখছ না রবি আর অক্ষয় কেমন চুপ করে আছে। ওরা আমায় দোষী ভাবে, আমি তো জানি।

জ্ঞানদা ওঁদের মুখের দিকে তাকান। রবিকে যেন চোখের ইঙ্গিতে কিছু বলতে বলেন। রবি টলটলে চোখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে বলেন, শুধু তোমার কেন, দোষ আমারও আছে।

যাত্রীদের মনের দোলাচলমানতার সঙ্গে তাল রেখে জাহাজ বেশ দুলছে।

একটু বেশিই দুলছে, হঠাৎ মনে হল জ্ঞানদার। বড়বড় ঢেউ এসে জাহাজের পাঁজরে ধাক্কা মারছে সবেগে আর জাহাজ ছুটে চলছে উন্মত্ত বেগে।

কর্তাবাবু চালকের দিকে ছুটে গেলেন 'ওরে থাম থাম' বলতে বলতে। নীচ থেকেও রব উঠল 'থামাও, থামাও'।

সবাই সভয়ে দেখলেন জাহাজ একটি লোহার বয়ার দিকে ছুটে চলেছে অথবা বয়াটিই ছুটে আসছে ধাক্কা মারবে বলে। ধাক্কা মারলও। ভয়ংকর শব্দ করে বিকট দুলুনিতে জাহাজ থেমে গেল। কোনওরকমে প্রাণে বেঁচে গেলেন সবাই কিন্তু জাহাজ আর চলল না।

কয়েক ঘণ্টা পরে পরিবেশ শান্ত হলে ডেকে বসে বসে এই ভয়ংকর অভিজ্ঞতায় কৌতুক মিশিয়ে রবি তাঁর ডায়েরিতে লিখতে লাগলেন, 'সত্য ঘটনায় ও উপন্যাসে প্রভেদ আছে। তাহার সাক্ষ্য দেখো— আমাদের জাহাজ বয়ায় ঠেকিল, তবু ডুবিল না, পরম বীরত্ব-সহকারে কাহাকেও উদ্ধার করিতে হইল না, প্রথম পরিচ্ছেদে জলে ডুবিয়া মরিয়া ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে কেহ ডাঙায় বাঁচিয়া উঠিল না। না ডুবিয়া সুখী হইয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু লিখিয়া সুখ হইতেছে না; পাঠকেরা নিশ্চয়ই অত্যন্ত নিরাশ হইবেন, কিন্তু আমি যে ডুবি নাই সে আমার দোষ নয়, নিতান্তই অদৃষ্টের কারখানা।'

সে যাত্রা প্রাণে বাঁচলেও সবার মনেই ভয় ধরে গেল অভিযান নিয়ে। সেখানেই নোঙর ফেলা হল। যাত্রীদের উৎসাহ কমে রাত শেষের গ্যাসবাতির মতো টিমটিম করে জ্বলতে লাগল। রবির ভাষায়—

'যাত্রীদের উৎসাহ দেখিতে দেখিতে হ্রাস হইয়া গেল; সকালবেলায় যেমনতরো মুখের ভাব, কল্পনার এঞ্জিন-গঞ্জন গতি ও আওয়াজের উৎকর্ষ দেখা গিয়াছিল, বিকালে ঠিক তেমনটি দেখা গেল না। আমাদের উৎসাহ নোঙরের সঙ্গে সঙ্গে সাত হাত জলের নীচে নামিয়া পড়িল। একমাত্র আনন্দের বিষয় এই ছিল যে, আমাদিগকেও অতদূর নামিতে হয় নাই। কিন্তু সহসা তাহারই সম্ভাবনা সম্বন্ধে চৈতন্য জন্মিল। এ সম্বন্ধে আমরা যতই তলাইয়া ভাবিতে লাগিলাম ততই আমাদের তলাইবার নিদারুণ সম্ভাবনা মনে মনে উদয় হইতে লাগিল। এই সময় দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। বরিশালে যাইবার পথ অপেক্ষা বরিশালে না-যাইবার পথ অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত

এ বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে দাদা জাহাজের ছাতের উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন। একটা মোটা কাছির কুণ্ডলীর উপর বসিয়া এই ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে হাস্যকৌতুকের আলো জ্বালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু বর্ষাকালের দেশালাই-কাঠির মতো সেগুলা ভালো করিয়া জ্বলিল না। অনেক ঘর্ষণে থাকিয়া থাকিয়া অমনি একটু একটু চমক মারিতে লাগিল। যখন সরোজিনী জাহাজ তাঁহার যাত্রীসমেত গঙ্গাগর্ভের পঙ্কিল বিশ্রামশয্যায় চতুর্বর্গ লাভ করিয়াছেন তখন খবরের কাগজের sad accident-এর কোঠায় একটিমাত্র প্যারাগ্রাফে চারিটিমাত্র লাইনের মধ্যে কেমন সংক্ষেপে নির্বাণমুক্তি লাভ করিব সে বিষয়ে নানা কথা অনুমান করিতে লাগিলাম। এই সংবাদটি এক চামচ গরম চায়ের সহিত অতি ক্ষুদ্র একটি বটিকার মতো কেমন অবাধে পাঠকদের গলা দিয়া নামিয়া যাইবে, তাহা কল্পনা করা গেল। বন্ধুরা বর্তমান লেখকের সম্বন্ধে বলিবেন, 'আহা কত বড়ো মহদাশয় লোকটাই গেছেন গো, এমন আর হইবে না।' এবং লেখকের পূজনীয়া ভ্রাতৃজায়া সম্বন্ধে বলিবেন, 'আহা, দোষে গুণে জড়িত মানুষটা ছিল, যেমন তেমন হোক তবু তো ঘরটা জুড়ে ছিল।' ইত্যাদি ইত্যাদি। জাঁতার মধ্য হইতে যেমন বিমল শুভ্র ময়দা পিষিয়া বাহির হইতে থাকে, তেমনি বউঠাকুরানীর চাপা ঠোঁটজোড়ার মধ্য হইতে হাসিরাশি ভাঙিয়া বাহির হইতে লাগিল।'

আকাশে তারা উঠেছে, মনোরম দখিনা বাতাসে খালাসিদের নামাজ পড়ার আওয়াজ ভেসে আসছে নীচ থেকে। এক পাগলা খালাসি মাথা ঝাঁকিয়ে তারের যন্ত্র বাজিয়ে গান ধরেছে।

রাত নামলে খাওয়াদাওয়া সেরে খোলা ডেকের ওপরেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে পড়লেন সবাই। এ যেন এক দীর্ঘ পিকনিকের মতো জীবনযাপন, এখানে ঘরের মতো আব্রু নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই, চার দেওয়ালের গণ্ডি নেই, সমাজের অনুশাসন নেই। কিন্তু আপনজনের মধ্যে শোক আছে, বাসনা আছে, অনুতাপ, স্নেহ ভালবাসা আছে। সুরেন কিছুক্ষণ সেতার বাজিয়ে শুয়ে পড়েছে। বিবিও ঘুমন্ত।

অন্ধকার ছাদের ওপরে কেউ আধফোটা হাই তুলছে, কারও নাক ডাকছে। কোথায় লুকিয়ে আছে সেই তারকাটি, রবি আকাশের শত শত তারাদের মধ্যে খুঁজতে থাকেন। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, হঠাৎ মাঝরাতে কীসের অদ্ভুত

শব্দে ঘুম ভেঙে যায় তাঁর। আস্তে আস্তে চোখ খুলে বুঝতে চেষ্টা করেন তিনি কোথায়, অন্ধকারে কার যেন গোঙানির অস্ফুট আওয়াজ। উঠে বসে চোখ সইয়ে নিয়ে রবি একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন, ডেকের এক কোনায় মেজোবউঠানের কোলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন জ্যোতিদাদা। বৃক্ষের গায়ে তরুলতার পরিচিত দৃশ্যটি যেন পালটে গেছে আজ রাতে।

নিস্তব্ধ রাত্রে জ্যোতির ডুকরে ওঠা ক্ষীণ গলার স্বর ভেসে এল, বিনোদিনীর ডাকিনীমায়ায় কেন ডুব দিলাম মেজোবউঠান! তাই তো অভিমান করে সে চলে গেল!

মেজোবউঠান তাঁর কান্না মুছিয়ে দিতে দিতে যেন কপালে চুম্বন করলেন। কাদম্বরীর সঙ্গে একটি আবেগঘন মুহূর্তের কথা মনে পড়ল রবির। জ্যোতি ও জ্ঞানদার অজ্ঞাতসারে নিবিড় রাত্রির নির্জন দর্শকটি আবার শুয়ে পড়লেন। আধোঘুমে তাঁর মাথায় বাতাসের মতো স্পর্শ বুলিয়ে যাচ্ছেন নতুনবউঠান। তারপরেই কেন কে জানে তাঁর বন্ধ চোখের সামনে মৃণালিনীর মুখ ভেসে উঠল। রবি নিজেও তো বালিকাবধূকে ফেলে রেখে চলে এসেছেন, সেও নতুনবউঠানের মতো অভিমানিনী হয়ে উঠবে না তো!

জাহাজ আপাতত থেমে রইল। জ্যোতি ও জ্ঞানদা বাচ্চাদের নিয়ে বির্জিতলাওয়ে ফিরে গেলেন। রবি জোড়াসাঁকোয় ফিরতে ফিরতে ভাবছিলেন, এবার মৃণালিনীকে গড়েপিটে নিজের ছাঁচে ঢেলে নিতে হবে। বিয়ে যখন করেই ফেলেছেন, স্ত্রীকে অন্য কোথাও ফেলে রাখা চলবে না। এখন থেকে তাকে সঙ্গে নিয়েই জোড়াসাঁকোয় থাকবেন।

নিজের ঘরে গিয়ে মৃণালিনীকে ডেকে পাঠালেন রবি। ভীরু পায়ে শিঞ্জিনী বাজিয়ে লালপেড়ে ঢাকাইশাড়ি পরা কিশোরীটিকে ঘরে ঢুকতে দেখে রবির মনে হয় এ তো আর ছোট নেই, এ যে রাইকিশোরী! হাত বাড়িয়ে তিনি বলেন, কাছে এসো।

মৃণালিনী আসেন না, মুখ নিচু করে দূরে দাঁড়িয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগা মেঝেয় ঘসতে থাকেন।

মৃণালিনীর হাত ধরে কোলের কাছে টেনে আনেন রবি। জানতে চান, কী গো ছোটবউ, আমার কাছে আসবে না? ঘরে ফিরে এলাম, আর তুমি এমন দূরে দূরে থাকবে? আমি কি চলে যাব?

মৃণালিনী ঘাড় গোঁজ করে আধোস্বরে বললেন, আপনি আমাকে একা ফেলে চলে গিয়েছিলেন কেন?

তোমার রাগ হয়েছে বউ? রবি তাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, আচ্ছা, তোমাকে ফেলে আর কোত্থাও যাব না।

পাশের গলিপথ দিয়ে বাসনওয়ালি হেঁকে যাচ্ছে। 'চুরি চাই খেলনা চাই' বলে হাঁক পাড়ছে দুপুরের ফিরিওলা। অন্যদিন বাড়ির মেয়ে-বউদের সঙ্গে মৃণালিনীও চুড়িওলার কাছে বসে পড়েন কাচের চুড়ি পরতে।

আজ এতদিন পরে স্বামীকে কাছে পেয়েও মৃণালিনী কিছুটা দিশেহারা। তাঁর ভয় যায় না। শ্বশুরবাড়িতে এসেই সরলা কিশোরী বধূটি দাম্পত্য বিচ্ছেদের যে ভয়ংকর রূপ দেখেছেন, তা তাঁকে দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করছে। স্বামীকে কাছে পাওয়ার মরিয়া তাড়নায় তিনি বলে ফেললেন, আপনি নতুনঠাকুরের মতো আমাকে একলা ফেলে ঘুরে বেড়ালে আমিও আফিম খাব।

রবি শিউরে ওঠেন, এ কী কথা বললে ছোটবউ? ছিঃ, আর কখনও এমন কথা মুখে আনবে না। তাঁর মুখটি উঁচু করে ধরে আবার বললেন, মনে থাকবে?

মৃণালিনী চুপ করে আছেন দেখে রবি তাঁর চোখে মুখে ঠোঁটে আঙুল বুলিয়ে দিয়ে গান গেয়ে ওঠেন,

'ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এসো হে
মধুর হাসিয়ে ভালবেসো হে',

কয়েকলাইন গানের পর মৃণালিনীর ঠোঁটের কাছে রবি তাঁর নিজের ঠোঁট এগিয়ে এনে একটি সঘন চুম্বন দিতে চাইলেন।

মৃণালিনী কিছুটা লজ্জায়, কিছুটা অভিমানে সেই বহুপ্রতীক্ষিত চুম্বন প্রত্যাখ্যান করে রবির হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গেলেন।

তার ব্যবহারে রবিরও কিছুটা অভিমান হল, এত আদর করে কাছে ডাকলেও পালিয়ে যায়, এ কেমন মেয়ে? সে কি নিতান্ত অবোধ? এখনও দাম্পত্যের মাধুর্য কিছুই বোঝে না? আন্না তড়খড়ের আহ্বান এড়িয়ে, লুসির ডাকে সাড়া না দিয়ে, স্বপ্নসুন্দরী বিলেতবালাদের উপেক্ষা করে এই অবোধ বালিকার জন্যই কি এতদিন বসে আছেন তিনি? রবির হতাশ লাগে। প্রেমের কবিতা তো অনেক লিখেছেন, কিন্তু একটি প্রগাঢ় প্রেমের জন্য, একজন

'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা' রক্তমাংসের প্রেমিকার জন্য আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে তাঁকে!

একলাঘরে লেখার টেবিলে বসেন রবি। চোখ বন্ধ করলে খাতায় কাদম্বরীর মুখ ভেসে ওঠে। তিনি লেখেন, 'হে জগতের বিস্মৃত, আমার চিরস্মৃত— এসব লেখা আমি তোমার জন্য লিখিতেছি। পাছে তুমি আমার কণ্ঠস্বর ভুলিয়া যাও, অনন্তের পথে চলিতে চলিতে যখন দৈবাৎ তোমাতে আমাতে দেখা হইবে তখন পাছে তুমি আমাকে চিনিতে না পার, তাই প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করিয়া আমার এই কথাগুলি তোমাকে বলিতেছি, তুমি কি শুনিতেছ না!'

সন্ধেবেলায় গলিপথে শব্দ ওঠে 'বেলফুল চাই, বেলফুল।' দাসীরা মালা কিনে এনে বউ-মেয়েদের চুলে পরিয়ে দেয়। আজ সবাই মিলে মৃণালিনীকে সাজানো হচ্ছে। তার লম্বা চুলে বিবিয়ানা খোঁপা বেঁধে যত্ন করে বেলফুলের মালা জড়িয়ে দেয় তারা। রবি বাড়ি ফিরেছে এতদিন পর, মৃণালিনী স্বামীর ঘরে রাত কাটাবে। সৌদামিনী নীপময়ীরা আজ তাই ছোটবউয়ের সাজের তদারকিতে লেগে পড়েছেন।

রাতের আহারপর্ব শেষ হলে রবি বিষণ্নমনে বিছানায় গা এলিয়ে দেন। হঠাৎ আসা দখিনা হাওয়ায় ঘরের বাতি নিভে গেছে। নাকি কাদম্বরী এসে বাতি নিভিয়ে দিলেন? রবি চুপচাপ শুয়ে রইলেন। 'এমন সময়ে হঠাৎ বলয়নিক্কণশব্দে একটি সুকোমল বাহুপাশ তাহাকে সুকঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি পুষ্পপুটতুল্য ওষ্ঠাধর দস্যুর মতো আসিয়া পড়িয়া অবিরল অশ্রুজলসিক্ত আবেগপূর্ণ চুম্বনে তাহাকে বিস্ময় প্রকাশের অবসর দিল না।'

রাইকিশোরী মৃণালিনীর এই সজল, অনুতপ্ত আত্মসমর্পণে রবি সহসা পুলকিত হন। তাঁর শরীর মনে আনন্দের শিহর জাগে। মৃণালিনীকে আশ্লেষে জড়িয়ে ধরতেই কুহকিনীর মতো রবির সামনে এসে দাঁড়ালেন কাদম্বরী। রবি ধীরে ধীরে তাঁকে বললেন— 'হেথা হতে যাও পুরাতন, হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।'

মৃদু হেসে রবির দিকে চাঁপার কলি আঙুলগুলি নাড়িয়ে মরীচিকার মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন কাদম্বরী। জোড়াসাঁকোর খিলানে তাঁর আর কোনও চিহ্ন রইল না।

উদ্ধৃতি-সূত্র

১. জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের চিঠি ৮, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ২২, ৫১, ৫২, ৭৫, ৭৬, ৯৫ পুরাতনী
২. সরমা ও সুশীলার কথোপকথন, নারী ও বামাবোধিনী পত্রিকা, পৃ. ৪০-৪৩
৩. য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র ১, ৭, ১০
৪. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রথম আলো
৫. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, পুরাতনী
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরোজিনী প্রয়াণ

বই-ঋণ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জোড়াসাঁকোর ধারে
অমিত মৈত্র, রঙ্গালয়ে বঙ্গনটী, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৪
অরূপ আচার্য সম্পাদিত, একান্তর, স্বর্ণকুমারী দেবী সংখ্যা, ২০০৮
ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, স্মৃতিসম্পুট
কল্যাণী দত্ত, খাড়া বড়ি থোড়, থীমা, ২০০৫
কাজী আবদুল ওদুদ, কবি রবীন্দ্রনাথ
চিত্রা দেব, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, আনন্দ পাবলিশার্স, ৩য় সংস্করণ, ২০০৬
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, পুরাতনী কথা
দূর্বা দেব, আত্মকথার স্থাপত্য, শিলচর
নীরদচন্দ্র চৌধুরী, বাঙালী জীবনে রমণী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৬৮
প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, ১ম-২য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ৫ম মুদ্রণ, কলকাতা, ২০০৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ— 'মানভঞ্জন', 'সমাপ্তি'
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বীরপুরুষ ঐ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, য়ুরোপ-প্রবাসীর ডায়ারি, ঐ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, ঐ
রাসসুন্দরী দেবী, আমার জীবন
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার ছেলেবেলা ও বোম্বাই প্রবাস
সমীর সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন, শিশু সাহিত্য সংসদ
সরলাদেবী চৌধুরানী, জীবনের ঝরাপাতা
সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জিজ্ঞাসা, কলকাতা ১৯৬৯
সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান অনুষ্টুপ, ২০০৮

সুশীল রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা ১৯৬৩
স্বর্ণকুমারী দেবী উপন্যাস সমগ্র ১, দেজ পাবলিশিং, ২০০৯
স্বর্ণকুমারী দেবী রচনা সংগ্রহ
হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরবাড়ীর কথা, বিশ্বভারতী
